কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু অন্তরঙ্গ
স্মৃতিকথার সমষ্টি এই 'মনের আয়নায়'—যা তাঁর বিখ্যাত
উপন্যাসগুলির মতো অনন্য সৃষ্টি বলেই আমা'

সাহিত্যম্ প্রকাশিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অন্য বই

আমার কালের কথা

অসীম অনন্তকালের পথ অতিবাহন করে চলেছে মানুষের মিছিল। বছরের পর বছরের মাইল-পোস্ট পিছনে প'ড়ে থাকছে। বিরাম বিশ্রামহীন চলা। পঞ্চাশটা মাইল পিছনে ফেলে এসে বারেকের জন্য পিছনে চাইতে ইচ্ছা হ'ল।

পাশে যারা সঙ্গীসাথী জুটেছে, যারা কেউ এসেছে—তিরিশ মাইল, কেউ বা বত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ—যারা ভালবাসে—পথ চালায় যারা বহু সপ্তপদ একসঙ্গে ফেলে হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ মিত্র, অনুজের সমান প্রিয়—তারা লক্ষ্য করলে পথ চলার মধ্যে আমার ভাবান্তর। প্রশ্ন করলে—কি হ'ল দাদা?

বললাম—কালের পঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট ফেলে এলাম পিছনে; আজ মনে পড়ছে সেই কথা। আকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই, রুক্ষ প্রান্তর, ছায়াশীতল সমতল পার হয়ে চলেছে জীবনের রথ, আলোকে-অন্ধকারে, সুখে-দুঃখে বিচিত্র এর রূপ—সেই সব কথা মনে পড়ছে ভাই।

তারা বললে—বলুন সেই কথা। আপনার কথা।

—না। আমার কথা বলতে নেই ভাই।

—না। বলুন।

—না। আমার মা বলেছেন—নিজের পুণ্যের কথা বললে সে পুণ্য ক্ষয় হয়, কীর্তির কথা বললে সে কীর্তির বনিয়াদে ফাট ধরে; নিজের বেদনার কথা বললে নিজের অপমান করা হয়; নিজের সুখের কথা বললে অহঙ্কারের পাপ স্পর্শ করে। নিজের কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে।

তারা হয়তো হাসলে। হাসির কথাই যে। বিংশ-শতাব্দী বিজ্ঞানের

যুগ। এই যুগে যে-একজনের কাছে নিজের কথা বলা যায় ব'লে অনুমান তারা করলে, তার অস্তিত্ব যে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

—হাসিসনে ভাই। তার কথা আমি বলিনি। আমিও যে তোদের সঙ্গী, একসঙ্গে পথ চলেছি। তোদের সামনেও যে সন্ধিক্ষণ বা উদয়লগ্নের নব আভাস দেখা দিয়েছে, আমিও যে চোখের সামনে ঠিক তাই দেখছি। আমি বলছি যে-জনের কথা, সে হলাম আমি নিজে। নিজের কাছে ছাড়া নিজের সুখের কথা, পুণ্যের কথা, কীর্তির কথা—এসব কথা বলতে নেই। যাঁরা অনন্যসাধারণ তাঁরা পারেন বলতে। যেহেতু না, তাঁদের অনুসরণ করেই আমাদের চলা। তাঁরা ঋষি, আদিম কাল থেকে তাঁরা ব'লে আসছেন তাঁদের উপলব্ধির কথা, অভয়ের বাণী—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর বলে যারা একান্তই নগণ্য সাধারণ, তারা। কারণ তাদের স্পর্শবোধ আছে—অনুভবশক্তি নাই, বেদনায় চিৎকার ক'রে কাঁদা, সুখে কলরব ক'রে উল্লাস করা হ'ল তাদের স্বভাবধর্ম। অনন্যসাধারণ আমি নই, অতি বিনয় ক'রে নিজেকে নগণ্য সাধারণও মনে করি না। তাই চিৎকার করে কেঁদে, বা কলরব ক'রে উল্লাস ক'রে দুঃখ-সুখের কথা বলতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ, আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সচেতন, আমার মর্যাদা সম্বন্ধে সজ্ঞান। তাই আমার নিজের কথা বলব শুধু নিজেকে, নিজেই দাঁড়াব নিজের কাছে বিচারপ্রার্থীর মত এবং বিচারকের মত, সান্ত্বনাপ্রার্থীর মত—সান্ত্বনাদাতার মত। তবে—

—তবে?

—তবে হ্যাঁ, বলতে পারি কিছু কথা। বলতে পারি পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা। এই পঞ্চাশটা বছর—পঞ্চাশটা মাইল-পোস্টের কথা বলতে পারি।

—তাতেও কি আপনার কথা বলা হবে না?—হাসলে অনুজদের একজন।

—না।

—না?

—হ্যাঁ ভাই, না।

—কালের কথায় আপনি আসবেন না? আপনার কথা থাকবে না?

—আসব। থাকবে। তবু সে আমার আসা হবে না, আমার বলা কথা হবে না।

উটপাখীতে শুনেছি বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবে, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কথাটা সেই রকম হ'ল না দাদা?

—ভাই, ক্ষীর-সাগরের হংসের দল, উটপাখীর এ দৃষ্টান্ত ঠিক খাটে না। বিচার ক'রে ভেবে দেখ, ক্ষীর-সাগরের রসপরিপূর্ণতার হানি না ঘটিয়ে যেটুকু জল তার সঙ্গে থাকে, সেটুকু ন্যায্য অধিকারেই থাকে। জল বলে তাকে বাদ দিতে গেলে ক্ষীর-সাগর ক্ষোয়াক্ষীরের খটখটে চড়ায় পরিণত হবে ভাই। ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তীক্ষ্ণতঞ্চুতে তাকে বিদীর্ণ ক'রে মুক্তা-প্রবাল অনেক আবিষ্কার করবেন তার ভিতর থেকে, কিন্তু হংসের দলের—তোদের বিপদ হবে, সাঁতার দেওয়া চলবে না। ক্ষীরের মধ্যে যতটুকু অধিকার, সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশী নয়।

—বেশ মেনে নিলাম। এখন আরম্ভ করুন আপনার কথা।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ঠিক মাইল খানেক পিছনে—১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পোস্টের উপর তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। মাঝখানে তার অশোক-চক্র। ওই ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই আমি প্রবেশ করেছি পঞ্চাশের মাইলে। পিছনে উনপঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট পার হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে—১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবনযাত্রার শুরু। আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য উদিত হননি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম ব'লে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ। অল্প

কয়েক মুহূর্তের জন্য একদিন আয়ু আমার হয় বেড়ে বা কমে গেছে।

১৮৯৮ সাল। ভারতবর্ষের দিকে-দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতেশ্বরী তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত—মহারাণীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায়-থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলে ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা, এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সবখানে সব কড়া ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে। প্রাচীন রাঢ়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে। মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙা মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তর-দুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে। শুধু অটুট বললেই বোধ হয় সব বলা হয় না। ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে, শেষে গাঁইতি আনা হ'ল, দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে, তা আজও আমার চোখে ভাসছে। গাঁইতির একটা দিক ভোঁতা হয়েছিল, একটা দিক ভেঙেছিল। এরই নিচের তলা ধ'রে আমি প্রথম পৃথিবীর মৃত্তিকার আলিঙ্গন পেয়েছিলাম।

ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমি নাকি খুব উচ্চ চীৎকারে কেঁদেছিলাম। আমার জীবনের কর্ম ও সাধন ফলের মধ্যে তার চিহ্ন আছে কি-না মাঝে মাঝে আজ ভেবে দেখি আমি। সে কথা থাক্। সেদিন যাঁরা সূতিকাগৃহের দুয়ারে উৎকণ্ঠিতা প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণ হয়ে বলেছিলেন—যাঃ, মেয়ে হ'ল! এত উঁচু গলা এ মেয়ের! আজও আমাদের দেশে বাড়ীর গিন্নীরা বলেন—ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কম কাঁদে। মেয়েরা আসে জীবনে যে কান্না তারা কাঁদবে তারই সুর ধ'রে! কাঁদতেই তাদের জন্ম!

লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান—আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি ব'লে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না-মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি ব'লে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করি।

১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর আরও দুটি বংশ, ওই সরকার-বাবুদেরই দৌহিত্র-বংশ। এদের এক বংশ হ'ল আমার পিতৃবংশ, দ্বিতীয়টি অন্য এক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় বংশই তখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল জমিদারির আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের, তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি। আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম। সমারোহ প্রচুর। এ ছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো-হাজার-টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক, হাতপায়ের আঙুলে গোনা যায় না। তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন—'মাটি বাপের নয়, দাপের, দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তারা বীর্যের দাবি ঘোষণা ক'রে বলতেন—'আমি জমিদার।' এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ। আশ্চর্য সাহস ছিল তাঁদের। সাহসের কথায় একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল। এমনি এক শ-চারেক টাকার আয়ের

জমিদারের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে। বৈষয়িক স্বত্ব নিয়ে ফৌজদারী, পরে দেওয়ানী মামলা চলল। মুন্সেফ-কোর্ট, জজ-কোর্ট, শেষে হাইকোর্ট। একদা এক চাকুরে বন্ধু দেশে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে তিরস্কার ক'রে বললেন—তুই কার সঙ্গে মামলা করছিস ?

—কেন ? বর্ধমানের রাজার সঙ্গে।

—তাঁকে তুই চোখে দেখেছিস যে মামলা করছিস ? তাঁর বাড়ী দেখেছিস ?

মামলাকারী হা-হা ক'রে হেসে বলেছিলেন—বাড়ী দেখেছি, তাঁকে দেখিনি।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? বর্ধমানের মহারাজা তো বর্ধমানের মহারাজা রে, ভগবান যে ভগবান—সে অন্যায় দাবি করলে তাই মানি না। বিশ বছরের বেটা মরে গেল, পরমায়ু দেয়নি ভগবান, তাই তার চিকিৎসায় টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে লড়াই করেছি, রাত জেগেছি : যম একদিকে টেনেছে, আমি একদিকে টেনেছি। হেরেছি। তাতে কি ? এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিনি।

লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে ~~জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।~~

২

প্রধান জমিদার-বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইনর স্কুলের।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন হাই ইংলিশ স্কুলের। মাইনর ইস্কুলটি উঠে গেল।

আমাদের গ্রামের গ্রামদেবতা ফুল্লরা দেবী। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। আসল নাম নাকি অট্টহাস। ব্যবসায়ী ধনী দেবীর প্রাচীন মন্দির ভেঙে নূতন মন্দির ক'রে দিলেন। জমিদার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়ে দিলেন দেবীর মন্দিরের সম্মুখে দীঘির উপর প্রশস্ত ঘাট। জমিদার-বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার সমারোহ।

ব্যবসায়ী-বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ক'রে রামযাত্রায় সমারোহ করলেন।

জগদ্ধাত্রী-পূজায় পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র হরিজন ভোজন হ'ত। মনে আছে, চারটে হিসেবে বড় বড় ছানাবড়া—আজকাল যার একটার দাম অন্ততঃ আট আনা, প্রচুর মাছ, প্রচুর মাংস। খাইয়েদের ব্যবস্থা ধরাবাঁধা নয়, যে যত পারে, সে এক 'নাও নাও' এবং 'আর না, আর না' শব্দ। তারপর বিসর্জনের দিন বারুদের কারখানা, লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা, প্রতিমা নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা; ছেলেবেলায় সে এক পরম কামনার দিন ছিল। 'দুই পুরুষ' নাটকের প্রথমেই কঙ্কনার বাবুদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার ধুমের কথাটা সেই স্মৃতি থেকেই এসেছি। কিন্তু কঙ্কনার বাবুদের সঙ্গে এই জমিদারবাবুদের কোন সম্পর্ক নাই। সেকথা থাক্।

কার্তিকের শুক্লা-নবমীতে জগদ্ধাত্রী আর কয়েক দিন পরেই রাস-পূর্ণিমা। ব্যবসায়ীর বাড়ীতে পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ, ব্যঞ্জনের সংখ্যা এবং স্বাদুতা নিয়ে প্রতিযোগিতা। পাতায় কুলাত না, ব্যঞ্জনের তেলে নাটমন্দিরের বাঁধানো মেঝে পিচ্ছিল হয়ে যেত। সোডা ক্ষার দিয়ে মাজতে হ'ত। মিষ্টান্নও এখানে বেশী এবং আকারেও বড় হ'ত। তবু ব্যবসায়ী ভোজের ব্যবস্থায় এঁটে উঠতেন না। হার মানতে হ'ত শাক্ত ব্যবস্থার কাছে বৈষ্ণব ব্যবস্থার আয়োজনকে। জগদ্ধাত্রী-পূজায় পাঁঠাবলি হ'ত। বৎসর ধ'রে

পোষা বড় বড় পাঁঠার মাংসের কালিয়ার ব্যবস্থার জমিদার-বাড়ী টেক্কা মেরে থাকত। শুধু মাংসের ব্যবস্থাতেই নয়, আয়োজনের সঙ্গে রন্ধন-শিল্পের যে মুন্সিয়ানা এবং যত্নের পরিপাট্য থাকলে সামান্যকে অসামান্য ক'রে তোলা যায়, তা যেমন জমিদার-বাড়ীতে ছিল, ব্যবসায়ীর বাড়ীতে তা তেমনটি ছিল না। জমিদার-কর্তা নিজে নুন মিষ্টির পরিমাণ দেখতেন, চেয়ার নিয়ে রন্ধনশালায় ব'সে পাচকের সঙ্গে সারারাত্রি জাগতেন, শেষ রাত্রে চাকর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নিজেই তামাক সেজে খাওয়াতেন। উনানে কাঠ ঠেলতেন। সকালে মুখ ধুয়ে পূজারম্ভের পরেই বসতেন দই নিয়ে। দইকে তিনি 'আম-দইয়ে' পরিণত করতেন। আম আদা বেটে মিশিয়ে তাকে আম-সন্দেশের মত এমন সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু বস্তুতে পরিণত করতে জানতেন যে, লোকে ওই আম-দই খাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তার পালা গুণত ; কখন আসবে আম-দই ? দীর্ঘদিনের রোগীও আসত, বলত, মুখটা একটু ছাড়িয়ে আসি। সে স্বাদ আজও মনে হলে আমার রসনাও সিক্ত হয়ে ওঠে।

রাধাগোবিন্দের ধাতু ও শিলাবিগ্রহ, তার বিসর্জন নাই। তাঁর ছিল রাস-পূর্ণিমার পরদিন বনভোজনের ব্যবস্থা। চতুর্দোলায় যেতেন যুগল বিগ্রহ, মশালে মশালে গ্রামের আকাশ রাঙা ক'রে চলত মশালধারীরা, আসাসোঁটা নিয়ে চলত বরকন্দাজ, গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে গ্রামের বাইরে তাঁদের বিস্তীর্ণ বাগানে বিগ্রহ নামাতেন। বাজি পুড়ত, লাঠিখেলা হ'ত, সাঁওতালরা নাচত। দুই তরফের সমারোহেই দশ-বিশখানা গ্রামের লোক ভেঙে আসত। দশ-পনরো হাজার লোক। আসলে এটা বিসর্জন উৎসবের প্রতিযোগী উৎসব বলতে ভুলেছি। জগদ্ধাত্রী-পূজায় জমিদার-বাড়ীতে দুদিন যাত্রা হ'ত। এদিকে ব্যবসায়ীর বাড়ীতে রাসে হ'ত মাসখানেক ধ'রে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রা। অনেকবার দুই বাড়ীতেই হয়েছে খেমটা নাচ। না হলেই চলত না। পূজা-পার্বণে হ'ত, অন্নপ্রাশন-উপনয়নে হ'ত,

এমন কি আমাদের গ্রামের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের হলে কলকাতার মোটা দক্ষিণার খেমটা নাচ হয়েছিল।

এই ব্যবসায়ী ধনীর বাড়ীতে আসত বড় বড় যাত্রার দল। সে কালেন নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ সিতিকণ্ঠ তিন ভাই আসতেন, মতি রায়ও আসতেন। অধিকাংশ সময় আসতেন আমাদের জেলার খ্যাতনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দল নিয়ে। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। স্বচ্ছল গৃহস্থ বাড়ীর যুবকের দল তখন প্রকাণ্ড। ব্যবসায়ীটির কল্যাণে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার নবজীবনের সংস্কৃতির অমৃত কেউ ভৃঙ্গারে করে আনতে না পারলেও, ফ্যাশানের হুইস্কির বোতল কেস-বন্দী হয়ে গ্রামে অনায়াসে পৌঁচেছে। তার ফলে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ এসেছেন রাসের বাড়ীতে গাওনা করতে। লোকে লোকারণ্য, গান চলছে। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন যুবকের গান মনঃপূত হয়নি। তাঁরা আগেই কৃষ্ণযাত্রায় অমত জানিয়েছিলেন। বল হরি—হরিবোল অর্থাৎ যাত্রাকে গঙ্গাযাত্রা ব'লে ব্যঙ্গ ক'রে আসর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই তাঁরা অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন—আগুন! আগুন! আগুন!

মাটির ঘরের দেশ, ঘনসন্নিবদ্ধ খড়ের চাল। চীৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসর গেল ভেঙে। আতঙ্কিত গ্রাম্য শ্রোতার দল ছুটল আপন আপন বাড়ীর দিকে।

যুবকের দল আবার হরিবোল দিয়ে উঠল—বল হরি—হরিবোল!

নীলকণ্ঠের সহোদর—শ্রীকণ্ঠ এবং সিতিকণ্ঠ উভয়েই ছিলেন মানী লোক। তাঁরা সমস্ত বুঝলেন। এবং মাথা নীচু ক'রে আসর ভেঙে লাভপুর থেকে বিদায় নিলেন। পরবৎসর উপযাচক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়', এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সে-বার তিনি গান করলেন। সে কী গান! আর সে কী জনতা! সে কী স্তব্ধতা! মানুষ হাসল, বুক ভাসিয়ে কাঁদল।

কিন্তু এত অসুবিধাতেও কেউ 'আঃ' শব্দ করলে না। লাভপুরের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে জয় ক'রে নীলকণ্ঠ সে-বার ফিরে গেলেন। এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দু'চোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।

৩

আমাদের রাঢ় দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, 'লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যান তার আগে তিনি গৃহস্থকে বলেন—'হয় চাল ছাড়, নয় আমাকে ছাড়।' গৃহস্থ চাল ছাড়তে পারে না। লক্ষ্মীই ছেড়ে যান। 'চাল' কথাটা শুনতে খারাপ, চাল কথাটার বাইরের অর্থ হয়তো বাইরের ভড়ং, কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলে জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, জীবনের ভিত্তির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কার করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠা যে-কালে সমাজে সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেউলের মাথায় চূড়ার মত সে-কালে সম্পদরূপী ভিত্ নড়লে চূড়া বা চাল আপনি খ'সে পড়ে প্রতিষ্ঠায় আবার চূড়ার উচ্চতার প্রতিযোগিতায় চূড়া যখন বিন্ধ্যগিরির মত বাড়তে থাকে তখন চূড়ার ভারে ভিত্ও আপনি বসে পড়ে। ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির জড়বস্তু, কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার মন্দির সজীব, তাই কোন নূতন প্রতিষ্ঠাবান যখন অপর সকল প্রতিষ্ঠাবানের প্রতিষ্ঠার মন্দিরকে ছাড়িয়ে নিজের ইমারৎ গড়ে তখন পুরানো প্রতিষ্ঠার মন্দিরগুলি স্বাভাবিকভাবে সজীব বিন্ধ্যগিরির মত থাকে। আমারও ছিলাম স্বল্প আয়ের জমিদার, পাখী-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্যতা না থাকলেও পাখা ছিল। সুতরাং আকাশের উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায় দুর্বল ডানায় ভর দিয়েও মেতে ওঠাই এক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম। এই স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম বলেই এই দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকেও স্পর্শ

করেছিল। এই ব্যবসায়ী বাল্যজীবনে ছিলেন দরিদ্রের সন্তান, তখন আমাদের বাড়ী থেকে তাঁদের বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। পূজার সময় আমার পিতামহদের বিচিত্র গোপন দানের একটি বিচিত্র পদ্ধতি ছিল; তাঁরা অপরিচিত মজুর শ্রেণীর লোকের মাথায় কাপড় মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজিয়ে অভাবী গৃহস্থদের বাড়ী পাঠাতেন। সঙ্গে থাকত জাল চিঠি—গৃহস্থদের দূর-আত্মীয়েরা যেন তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। এবং লিখছেন, 'কিছু তত্ত্ব পাঠাইলাম। তোমাদের সদা-সর্বদা খোঁজ লইতে পারি না বলিয়া লজ্জা পাই। যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবা।' সেই তত্ত্ব এদের বাড়ীও যেত। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকে টেনেছিল স্বাভাবিকভাবেই। আমার পিতামহ ছিলেন উকিল। সিউড়িতে ওকালতি করতেন। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। আমার পিতামহ ছোট। দুই ভাই-ই ছিলেন উকিল। সেকালে প্রতিষ্ঠা এবং উপার্জন করেছিলেন যথেষ্ট। বড় ভাই ছিলেন সে আমলের বিখ্যাত উকিল। মানুষও ছিলেন বিচিত্র। একেবার এক স্বত্বের মামলায় তাঁর মক্কেলের হ'ল পরাজয়। ইংরেজ জজ। জজ বলেছিলেন—ভুয়া মামলা তুমি মুখের জোরে জিতবে ব্যানার্জী? তা হয় না। তিনি অনেক বুঝিয়েছিলেন—সাহেব, এই পয়েণ্ট আপনি বুঝে দেখুন। সাহেব বুঝতে চাননি। অপমানজনক কথা বলেছিলেন। তিনি অপমানিত হয়ে নিজে হাইকোর্টে আপীল ক'রে সেই মামলা ডিক্রী করেছিলেন। যেদিন খবর পেলেন, সেদিন তিনি ঢাকীকে পয়সা দিয়ে গোটা শহরে ঢাক পিটিয়ে খবরটা জানিয়েছিলেন। সেই জজ সাহেব তখন অন্য জেলায়। তাঁকেও চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন পিতার এক সন্তান এবং প্রৌঢ় বয়সের সন্তান। পিতামহ বিবাহ করেছিলেন তিনবার। আমার প্রথম পিতামহী ছিলেন বন্ধ্যা। গল্প শুনেছি, তিনি নাকি অপরূপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জীবনে তাঁর কোন মানুষের সঙ্গে কোনদিন বিরোধ ঘটেনি।

গড়গড়ায় তিনি নাকি তামাক খেতেন। সে গড়গড়াটি আজও আছে। আমার পিতামহ দ্বিতীয় বিবাহ করেন বাহান্ন-তেপান্ন বৎসর বয়সে। বিবাহ করবার সঙ্কল্প প্রথম স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। বিবাহের পর যখন বধূ নিয়ে এলেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রীই হাসিমুখে বরণ ক'রে ঘরে তুলে বলেছিলেন—আমায় আগে বললে যে বিয়েতে কত ধুমধাম করতাম বাবু! পিতামহ লজ্জিত হয়েছিলেন, কোন কথা বলতে পারেননি। কয়েকদিন পর তিনি প্রথমা স্ত্রীকে ডেকে একটি টাকার থলি দিয়ে বলেছিলেন—এইটি তোমাকে দিলাম। এতে এক হাজার টাকা আছে।

তিনি বলেছিলেন—টাকা নিয়ে কি করব ?

—যা খুশি তোমার। গয়না গড়িয়ো।

—গয়না তো আছে।

—আরও গড়িয়ো। কিংবা মেয়ে-মহলে মহাজনী ক'রো। অর্থাৎ স্ত্রীলোক-মহলে টাকা ধার দিয়ো। ইচ্ছে হয় কাউকে দিয়ো। আমি দিচ্ছি, 'না' বলতে নেই।

তিনি আর কোন কথা না ব'লে টাকার থলিটি নিয়েছিলেন। এর দশ-এগারো মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। মারা যাবার পর তাঁর গয়নার বাক্স খুলে সোনা-রূপা ও নগদ সঞ্চয়ের হিসাব করতে গিয়ে সেই থলিটিও পাওয়া যায়। পিতামহ থলিটি বেঁধে দিয়েছিলেন পাটের অর্থাৎ রেশমের গুচ্ছ দিয়ে। দেখা যায় সেই রেশমের গুচ্ছ, তাঁর বেঁধে দেওয়া বাঁধনটি ঠিক তেমনিই আছে। খুলে দেখা যায় এক হাজার টাকার একটি টাকা খরচ হয়নি, অথবা একটি টাকা তাতে যোগ হয়নি।

তাঁর মৃত্যুর বৎসর খানেক পরে আমার বাবার জন্ম। বেশী বয়সের একমাত্র সন্তানের প্রতি আমার পিতামহের স্নেহের দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। দুর্বলতার আরও অবশ্য একটি কারণ ছিল। আমার পিতামহী অতি অল্প বয়সেই মারা যান। আমার বাবার বয়স তখন

চার-পাঁচ। মাতৃহীন একমাত্র সন্তান অত্যন্ত আবদারে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার উপর আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল প্রচণ্ড সবল। সিউড়ীতে জেলা-স্কুল তখন স্থাপিত হয়েছে। সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। পড়াশুনায় বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তবুও তিনি অত্যন্ত অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেন। এর জন্য তিনি পরে বহু অনুতাপ করেছেন। তিনি স্কুলে লেখাপড়া অবশ্য করেন নি, কিন্তু পরে ঘরে যথেষ্ট শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। নিজে তিনি নিয়মিতভাবে সেকালে নিজের ডায়রী রেখে গেছেন। তাঁর ডায়রী থেকেই খানিকট অংশ এখানে তুলে দিলাম, তা থেকেই তাঁর স্কুল ছাড়ার বিবরণ এব পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে তাঁর মর্মপীড়ার আভাস পাওয়া যাবে। তা থেকেই পরিস্ফুট হবে—সেকালের খানিকটা যে-খানিকটার পটভূমিতে আমি বেড়ে উঠেছি—

'আমার বয়স পাঁচ বৎসর হইলে পিতা আমার হাতেখড়ি দিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মাতৃহীন বালক এবং বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া বিদ্যার জন্য বা কোন বিষয়ের জন্য কখনও কোন শাসন করিতেন না। আপন বক্ষে রাখিয়া পালন করিতেন। আমার সাত-আট বৎসর বয়সে প্রথম বাংলা স্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়া দেন; একখানি ঠেলাগাড়ী করিয়া স্কুলে যাইতাম। ক্রমে বীরভূম গভর্নমেণ্ট ইস্কুলে ভর্তি হইলাম। বাল্য-কালে আমার বুদ্ধি এরূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল যে একবার মাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইত। ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান আমার নির্দিষ্ট ছিল। পরে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডবল প্রমোশন পাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। এই সময় আমার বয়স ষোলো এবং এই বৎসরই—১২৮৬ সালে আমার প্রথম পরিণয় হয়।...

'ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে, ডবল প্রমোশন লইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া আমার বিশেষ পড়ার আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রমোশনের ২।১ মাসের মধ্যেই আমার ইস্কুলে অনেক কামাই হয়, পড়াশুনাও করা হয় না। তাহাতে

আমার ক্লাসের পড়া পড়িতে একটু কষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বলিয়া কোনরূপে পড়া চালাইতেছিলাম, কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রথম বা দ্বিতীয় আসন রাখিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য মনে বড় কষ্ট ছিল। এই সময়ে আবার একটি কাণ্ড ঘটিল। সামার ভেকেশনে লাভপুর আসিলাম কিন্তু ইস্কুল খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সিউড়ী যাওয়া হইল না। নবীন ভাইপোর বিবাহ মঙ্গলডিহি গ্রামে, ওই বিবাহের জন্য থাকিয়া গেলাম। ১০।১২ দিন কামাই হইয়া গেল। এই আমার জীবনের সুখ বা উন্নতির পথে কাঁটা পড়িল। এই দশ-বারো দিন কামাই আমার বিদ্যাশিক্ষার মূলে চির-কুঠারাঘাত করিল। কামাইয়ের পর ইস্কুলে গেলে গদাই গরাঞী নামে একজন মাস্টার আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আমাকে নিত্যই তিন বার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'বাবুর বেটা বাবু—তার ওপর কুলীন, ফাল্গুন মাসে একটা বিয়ে, জ্যৈষ্ঠ মাসে একটা বিয়ে, তোমার আর লেখাপড়ার প্রয়োজন কি? যাও, লেখাপড়া ছেড়ে আরও দশটা বিবাহ কর না কেন!' নবীনের বিবাহের কথাটা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিত না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ আমিই করিয়াছি। এই বিদ্রূপ ক্রমে আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া জল পড়িত। অন্য ছেলেরা হাসিত। একদিন দুর্দান্ত ক্রোধ হইল, সে-দিন গদাই মাস্টার এই ঠাট্টাটি করিবামাত্র বই বগলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—"হাঁ, বিবাহের ব্যবসা করাই আজ স্থির করিলাম, তোমার যদি কন্যা থাকে—তবে তাহাকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই বলিয়া এক দৌড় দিয়া ইস্কুল হইতে পলাইয়া আসিলাম। বাবাকে বলিলাম—"আমাকে অন্যত্র ইস্কুলে ভরতি করিয়া দিন।" বাবা একমাত্র সন্তানকে বিদেশে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন—"এখানে আমার নিকট থাকিয়া তোমার যখন লেখাপড়া হইল না, তখন বিদেশে পাঠাইয়া কি হইবে? বাহিরে পাঠাইয়া আমিও থাকিতে পারিব না, তুমিও নষ্ট হইবে। তুমি আমার নিকট থাক, নিজেকে সংশোধন কর।"

বুদ্ধি অর্থ অনুরাগ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের কর্মফল আমাকে কৌশলে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার জীবনকে সুখশূন্য করিয়া দিল। হায়, বিদ্যাহীন-জীবনে ও পশু-জীবনে প্রভেদ কি? জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব যদি স্বীয় বংশোচিত সম্মান প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে না পারে তবে তাহার তুল্য দুঃখ কাহার? আমি সেই দুঃখ অহরহ ভোগ করিতেছি।...'

আমার বাবার ডায়রীর আরও খানিকটা অংশ তুলে দিলেই আমার জীবনের পটভূমি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বাংলা ১৩১০ সালের মাঘ মাসে, ৮ই মাঘ ছিল সরস্বতী-পূজা। এ অংশটুকুও ওই দিনের, এবং অংশটুকু আমাকে নিয়েই। বাড়ীতে সরস্বতী-পূজা আছে। সে-বার বারবেলার জন্য পূজা আরম্ভ হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল। বাবা ডায়রীতে লিখেছেন—

বারবেলার জন্য দুই প্রহরের পর ঘট আনাইয়া ৬সরস্বতী মাতার অর্চনা আরম্ভ হইল। বেলা বেশী হওয়ার জন্য তারাশঙ্করকে বলিলাম--"বাবা, জল খাও, জল খাইয়া অঞ্জলি দিলে দোষ হইবে না।" বালক বলিল—"কই, আমার তো পিপাসা পায় নাই।" বালকের দেবভক্তি—বিদ্যানুরাগ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবা, মাকে প্রণাম করিবার সময় কি বলিলে?" তাহাতে সে বলিল—"আমি বলিলাম—মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি ডাইনে বাঁয়ে ঢোল দিয়া পূজা দিব—বড় হইয়া পূজায় যাত্রা করাইব--ধুম করিব।" শুনিয়া পুলকিত হইলাম। দেখ বাবা তারাশঙ্কর—জীবনে এ কথা যেন কোন দিন ভুলিয়ো না। অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সঙ্কল্প করিলে তাহা বজায় রাখিবে। ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার পাট

তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকিল হইবে। আমার বাবা শেষ জীবনে শখ করিয়া শালের সামলা কিনিয়াছিলেন। ঐ সামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি—ওই সামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।'

আরও খানিকটা তুলে দেব। তা হ'লেই আমার জীবনের পটভূমির একাংশ স্পষ্ট হবে। ইংরেজ রাজত্বে যাঁরা ইংরেজী শিখেছিলেন, তাঁরা ইংরেজী-না-জানা লোককে মূর্খ ভাবতেন। ইংরেজী-না-জানা লোকরাও ভাবনা-অনুভূতি আচার-ব্যবহার, এমন কি ভারতীয় শাস্ত্র ও তত্ত্বে গভীর অধিকার সত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে এই অপবাদ স্বীকার ক'রে নিতেন। না হ'লে আমার বাবা ইস্কুল ছেড়ে ঘরে শাস্ত্রাদি পাঠ ক'রে সাংস্কৃতিক জীবনকে আয়ত্ত করেছিলেন, তাতে তার বিদ্যার জন্য অক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। সেকালের সাপ্তাহিক কাগজ—'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী'র তখন প্রবল প্রসার। প্রকাণ্ড সাইজের কাগজ, এক পৃষ্ঠায় শুয়ে অপর পৃষ্ঠা পড়া যেত! দুখানা কাগজই আসত আমাদের বাড়ী। এ ছাড়া সে আমলে তিনি একখানি মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'হিন্দু পত্রিকা'। তা ছাড়া তাঁর ছোটখাটো একটি পুস্তক-সংগ্রহ ছিল। অধিকাংশই ধর্মগ্রন্থ। সংস্কৃত বাংলা দুই ভাষায় লিখিত শাস্ত্র তিনি পাঠ করতেন। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা তন্ত্র তিনি কিনে সংগ্রহ করতেন এবং নিয়মিত পড়তেন। কাব্যে এবং উপন্যাসেও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। তাঁর আমলের কালিদাসের গ্রন্থাবলী আমার কাছে আছে। তাঁর সংগ্রহ থেকেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আস্বাদন পাই। তাঁর দিনলিপির মধ্যে প্রত্যহ দুই লাইন পুনরুক্ত হয়েছে। 'স্নানান্তে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আহার করিলাম—পরে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ 'হিন্দু পত্রিকা'দি পাঠ করিলাম।' এর পরই কোনো দিন পাই—'মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ করিলাম' অথবা 'যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করিলাম' অথবা 'রাণীভবানী নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ

করিলাম' অথবা 'আজ কালিদাসের কাব্যরসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইলাম।' জীবনে তাঁর একটি দার্শনিক দৃষ্টিও স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট হয়েছিল। আমাদের গ্রামের নূতন ধনী ব্যবসায়ী একটি মজা দীঘি কাটাচ্ছিলেন, সেই দীঘিতে উঠল এক অক্ষত শিলামূর্তি। বাসুদেব দেবতা। এই উপলক্ষ্যে সে দিন দশখানা গ্রামের লোক—কেউ বললে—'এই ঠাকুরই সর্বনাশ করবে, জল-শয়নে ছিলেন—মাছের লোভে ঘুম ভাঙালে, এইবার—' এই সুরের কথাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। যারা অন্য সুরে কথা বলেছিল, তারা বলেছিল—সৌভাগ্য ষোলো কলায় পূর্ণ হ'ল। কিন্তু তার পরই মৃদুস্বরে বলেছিল—কলা পাকল।

আমার বাবার ডায়রীতে পাই 'শত শত বৎসর পূর্বে যে দেবতা সে আমাদের সেবক প্রতিষ্ঠাতার পরাজয়ের দুর্ভাগ্যের নিয়তিকে স্বীকার করিয়া নিজেও অপমানিত হইয়া পুষ্করিণীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—তিনি এতকাল পরে উঠিলেন। যখন উঠিলেন তখন নূতন লীলায় প্রকট হইবেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিতহস্ত ত্রিলোকের পালক বিষ্ণু—বাবুর কীর্তির মধ্যে দিয়া উদিত হইলেন। মনে হইতেছে এ গ্রামে ছোট-বড় লইয়া যে বিবাদ-কলহ চলিতেছে—তাহার চরম মীমাংসা হইয়া গেল। ত্রিলোকপালক-কে আশ্রয় করিয়া রায় দিয়া দিলেন যে তিনিই এখানকার লোকপালক হইবেন।'

আর এক স্থানে একদিন—নূতন ধনীর আলোকোজ্জ্বল এক সমারোহের আসর থেকে নিজের অন্ধকার-স্তব্ধ বাড়ীর দিকে এসে তিনি রাত্রির অন্ধকারের গাঢ়তার দিকে চেয়ে যা ভেবেছিলেন তাই লিখেছেন—

'রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে পাই—কালরাত্রিরূপা মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়েছিলেন। আজিকার অমাবস্যার অন্ধকার—আমাদের চারিদিকে যেন তেমনি রাত্রির ছায়া ফেলিয়াছে।'

মোট কথা—বাস্তব সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার ক'রেই জীবনতত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আয়ত্ত কবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মারা যান অল্প বয়সে। আমার বয়স তখন আট বৎসর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনের উপর গভীব রেখাপাত ক'রে গিয়েছে। তাঁর মূর্তি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। অত্যন্ত বলশালী দেহ ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। স্পষ্টভাষী ছিলেন। আমার প্রতি স্নেহ ছিল মাত্রাতিরিক্ত, সর্বদা কাছে রেখে এই ধরনের কথা ব'লে যেতেন। অধিকাংশ বুঝতাম না, কিন্তু সে-কথা তিনি ভাবতেন না। তার ডায়রীখানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমার নাম আছে। আমাকে সম্বোধন ক'রে কিছু না কিছু লিখে গেছেন। চোদ্দো পনরো বৎসর বয়স থেকে ঐ ডায়রী আমি প'ড়ে আসছি। আজকের দৃষ্টি দিয়ে সে-কালকে বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার বাবার ঐ ডায়রী। এই ডায়রী আরও একটা পবিচয বহন ক'রে রয়েছে। সেটা হ'ল সে-কালের ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইয়োরোপের সভ্যতার প্রভাব পড়ার পরিচয। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের মানুষেরা জীবনের পরিচয বহন ক'রে আসছে স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে। রাজসিক রুচিতে শিলালিপি তাম্রশাসন রেখে গেছেন রাজন্যবর্গ—গৃহচ্ছদে, মন্দিরে, পোড়ামাটির ফলকেব লেখায বা ঘরের কাঠের ষডদলে সন তারিখ নাম আছে, তব এদেশে জীবনান্তে দেহকে ছাই ক'রে সমস্ত কিছু মুছে দিয়ে যাওয়াই রীতি। কবিদের কাব্যে নিজের পরিচয দেওয়া আছে, দীঘির নামেও কীর্তিমানেরা নাম জুড়ে রেখে গেছেন, কিন্তু আত্মজীবনের কথা লেখার রেওয়াজ ছিল না। ভাল-মন্দর বিচার করছি না। সত্য স্বভাবের কথা বলছি। ইংরিজী সভ্যতার প্রভাবেই ডায়রী লেখার রেওয়াজ এসেছিল। ইংরিজী শিক্ষায পারদর্শিতা লাভ না করলেও আমার বাবার উপর তা পড়েছিল। আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে কীর্ণাহার। সেখানকার জমিদার স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার মহাশয ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু, পুণ্যাত্মা

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিক। তিনি আমার পিতামহের বয়সী। তিনি ডায়রী রাখতেন। বোধ হয় আমাদের অঞ্চলে ডায়রী-লেখক হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। শিবচন্দ্রবাবুই আমাদের অঞ্চলে প্রথম হাইস্কুল স্থাপন করেন—জেলার মধ্যে বোধ হয় দ্বিতীয় হাইস্কুল। প্রথম হাইস্কুল সিউড়ী শহরের গর্বনমেণ্ট স্কুল।

বাবার ডায়রীতেও স্পষ্ট এবং সে-কালের শ্রুতি ও স্মৃতিতেও প্রমাণ রয়েছে যে, তখনকার কালের মানুষ ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজী সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভাল-মন্দ যা কিছু অতীত কালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরানো পুঁথির দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেঁটরায় পুরে নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মন্দ ছিল প্রচুর।

বিশেস ক'রে মেয়েদের জীবনে। কৌলীন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও ঘরে ঘরে কন্যারা বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকেন। পিতৃগৃহে তাঁদের অবশ্য দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমার 'দুই পুরুষে' নুটুর মুখে আছে. 'ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীব থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।' এ সেই আমলের কথা। এক এক কুলীন তখনও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বিবাহ ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে এ রেওয়াজ তখন কমেছে। বিবাহ পেশা যাঁদের, তাদের অধিকাংশেরই বাস ছিল পূর্ববঙ্গে—যশোর, খুলনা, বিক্রমপুর। আমরাও কুলীন। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহ তখন নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সন্তান না হ'লে দু-তিন বিবাহরীতি অবশ্য তখনও বর্তমান। তখনকার দিনে সন্তানহীনা স্ত্রী বংশরক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিতেন, তার পিছনে ছিল সমাজের উৎসাহ; এমন স্ত্রী সামাজে অজস্র প্রশংসায় ধন্য হ'তেন। এ সব অবশ্য সম্পত্তিশালী লোকের ঘরেই ঘটত।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদের গ্রামের কুটুম্ব ছিলেন। আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যেতেনও। তিনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লিখে যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, আমাদের

ওখানে সে প্রশংসা উপলব্ধি করার মত লোক ছিল না এমন নয়, ছিল; কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নি বা এমন লোক কখনও আর বিবাহ করবেন না—এই উপলব্ধির প্রশংসাটাই ছিল বড়। তাই তিনি যখন আবার বিবাহ করেন, তখন লোক তাঁকে আর সে প্রশংসা দিত না। তিনিও দ্বিতীয় বিবাহের পর আর বড একটা সম্পর্ক রাখেন নি লাভপুরের সঙ্গে।

এমনি যখন দেশের পটভূমি পরিবর্তনমুখী, তখন আমাদের ঘরের পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে গেল খানিকটা দ্রুততর গতিতে। আমাদের ঘরে এলেন আমার মা। তখন আমাদের সংসারের উপর দিয়ে একটা বিপর্যয় চ'লে গেছে সদ্য-সদ্য। আমার পিসীমা ছিলেন পাঁচজন। তাঁদের তিনজন মারা গেছেন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। এক পিসীমা একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে ঘরে এসেছেন। আমার বড় মা মারা গেলেন। তারপরই এলেন আমার মা। পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙালী ঘরের মেয়ে, বাপ ইংরেজী নবিস সরকারী চাকুরে। শুধু এইটুকু বললেই বলা হ'ল না। তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহবান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে। তখনও পিতার এক পুত্র আমার বাবা মদ্যপানে মাত্রা ছাড়ান, ক্রোধে আত্মহারা হন। আমার পিসীমা একদিনে স্বামীপুত্র হারানোর বেদনায় ক্ষোভে অধীর-চিত্ত, অসহিষ্ণু প্রকৃতি, অনির্বাণ চিতার মত উত্তপ্ত। আমাদের সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আছে সবই, কিন্তু শ্রী নাই, মাধুর্য নাই, এমন কি সেবাও নাই—কেউ অসুস্থ হ'লে সে একা বিছানায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, ঝি-চাকরে এক গ্লাস জল রেখে যায়, কবিরাজ-বাড়ী থেকে ওষুধ আসে কিন্তু অনুপানের অভাবে, ওষুধ মেড়ে তৈরী করার অভাবে নিয়মিত খাওয়া হয় নাই। রোগীর যন্ত্রণা তার পীড়িত মনের ক্ষুব্ধ চীৎকারে গোটা বাড়ীতেই নিজের রোগটা সংক্রামিত ক'রে দেয়, এমনি অবস্থা।

আমার মা এলেন আমাদের বাড়ী। বয়স তখন পনরো। পনরো বছরের মেয়েটি বাড়ীতে পা দেবা মাত্র গোটা বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেল। বাবার সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হ'ল; পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনা-মগ্ন হলেন। কৌলিক এবং দেশের মাটির যে সাধনা ও ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে মানুষ বহন করে, তাঁর মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করল; বর্ষার ভাঙনের খেলায় উন্মত্ত, ভাঙা মাটির রক্তের বন্যাব উচ্ছ্বাসে ভরা ভৈরব নদ যেন শরৎকালের ব্রহ্মপুত্রে রূপান্তরিত হ'ল। পিসীমা সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন। বাড়ীর শ্রী ফিরল। নিজের রুচিমত তিনি ঘরগুলি সাজালেন।

বাড়ীতে আমাদের কাঁঠালকাঠের আলমারি খাট চেয়ার টেবিলের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাতে কোনো রঙ দেওয়া ছিল না। দেশে তখনও রঙের চলন হয় নি। বড় বড় দালান-বাড়ীর দরজায় জানলায় আলকাতরা দেওয়া হ'ত। ব্যবসায়ী ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বাড়ীর দরজায় জানলায় সবুজ রঙ এসেছে এবং কলকাতার দোকানের বার্নিশ-করা ফার্নিচারও কিছু কিছু এসেছে। আমার মা এসে বাবাকে বললেন, এই খাট আলমারিগুলিতে বার্নিশ দিলে বড় ভাল হয়।

—বার্নিশ? সে দেবে কে?

—দেবে ছুতোর মিস্ত্রীতেই. তুমি কিছু শিরীষ কাগজ আর যঞ্চ বার্নিশ সিউড়ী বা কলকাতা থেকে আনিয়ে দাও।

—আমাদের এখানকাব মিস্ত্রীরা ও কাজ পারবে না।

—পারবে। আমাদের পাটনার বাড়ীতে বার্নিশ করানো হয়। মিস্ত্রীদের বার্নিশ করা দেখেছি আমি। আমি ব'লে দেব। তোমাকে ব'লে দেব—তুমি মিস্ত্রীদের বুঝিয়ে দিয়ো।

তাই হ'ল। সাজিমাটি দিয়ে আসবাবগুলি ধোবার সময় অনেকে বললে, গেল—কাঠগুলোর দফা গয়া হ'ল।

কিন্তু বার্নিশ শেষ হ'লে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—কে বলবে সেই

জিনিস ? গয়ার পিণ্ড পেয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়ে নবজন্ম নলকলেবর লাভ করলে জিনিসগুলি। তারপর ঘরে রঙ দেওয়ালেন। বাবার বইগুলিকে পাঠালেন সিউড়িতে দপ্তরী-বাড়ী। বেঁধে এল সেগুলি। পুরানো ছবিগুলির সঙ্গে কিছু নতুন রবিবর্মার ছবি কিনে নতুন ক'রে পেরেক পুঁতে টাঙালেন সেগুলি, ব্রাকেটগুলিও নতুন বন্দোবস্তে টাঙালেন। ঘরের দেওয়ালে আলমারির তাক ছিল—দরজা ছিল না। সে তৈরী করালেন, কাচ বসালেন। বালিশে ঝালর-দেওয়া ওয়াড় তৈরী ক'রে পরালেন। বাক্সের ঘেরাটোপ হ'ল। বাবার বাগানের শখ ছিল, ফুল হ'ত প্রচুর। পূজার জড় তোলা হ'ত, এখন থেকে ফুলের মালা হতে শুরু হ'ল, বিগ্রহের জড় আগে—তারপব মানুষের জড়। রূপার ডিসে লম্বা গেলাস সাজানো হতে লাগল। বাড়ীখানিতে যেন তাঁর প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে পড়ল। পাডায় খবর রটল। মেয়েরা এসে দেখে গেলেন। এমন কি স্বর্গীয় যাদবলাল-বাবু একদা বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলেন—হরিমামা, আমি আপনাব ঘর দেখতে এলাম। শুনলাম বাঁকীপুরের মামী নাকি চমৎকাব ঘর সাজিয়েছেন। আমি দেখব।

তিনি দেখে গেলেন।

তাঁর বাড়ীও নতুন ছাঁদে সাজল। অনেক উজ্জ্বলতর শ্রী এবং শোভা হ'ল, অবশ্য আয়োজনের মহার্ঘতায়, ঝাড়-লণ্ঠনেব শতেক বাতিব আলো সেখানে জ্বলল। কিন্তু কেরোসিনের কালি-পড়া ডিবের বদলে ঘরে মোমবাতির আলোর প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন আমার মা।

আমার মায়ের আগে আমাদের গ্রাম পদার্পণ করেছিলেন মায়েরই মামাতো দিদি। সারা শহরের বিখ্যাত উকিলেব মেয়ে। তিনিই করতে পারতেন এ রেওয়াজের প্রবর্তন ; তাঁরও ছিল অনেক গুণ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর গুণপনা কার্যকরী হয় নি। তাঁব বিবাহ হয়েছিল আমাদের গ্রামের এক অতি দরিদ্র-সন্তানেব সঙ্গে। দরিদ্র-সন্তানটি নিজের শক্তিতে অধ্যবসায়ে এবং যাদবলালবাবুর আনুকূল্যে (যাদবলালবাবুর উপর নির্ভরশীল আত্মীয় ছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয়ে

বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। আবার এই উকিলটি সন্ধান ক'রে ছেলেটিকে বের ক'রে তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন; শুনেছি মৃত্যুর দু-তিন দিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর নিয়োগপত্র এসেছিল অদৃষ্টের পরিহাসের মত। তারই ফলে তিনি তাঁর গুণপনার প্রভাব ছড়াতে পারেন নি; দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিকে নাশ করে, এর চেয়ে সাধারণ সত্য আর নাই। শুধু তাই নয়, তিনি অকালবৈধব্যের বেদনায় বোধ করি তাঁর প্রভাব ছড়াতেও চান নি।

মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে প্রসন্না শক্তির মত কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করে নি, তাকে আকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, 'আকাশলোকে বেড়ে চল, সূর্য-আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন-পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।'

আমার মায়ের দেহবর্ণ ছিল উজ্জ্বল শুভ্র। আর ... তে ছিল একটি দীপ্তি। চোখ দুটি স্বচ্ছ, তারা দুটি নীলাভ। কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্ট, প্রকৃতি অনমনীয় দৃঢ় অথচ শান্ত। আর আছে জীবন-জোড়া একটি প্রসন্ন বিষণ্ণতা। সেটা তার অনাসক্ত প্রকৃতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। আমার মা যদি উপযুক্ত বেদীতে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন তবে তিনি দেশে বরণীয়াদের অন্যতমা হতেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পড়াশুনা তিনি যথেষ্ট করেছেন। পিত্রালয়ে পাটনার স্কুলে নিচের ক্লাসে—বোধ হয় আমার প্রাইমারি ক্লাসে পড়ার সময় বিবাহ হয়; পল্লীগ্রামে রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হয়ে সংসারের শত সহস্র কর্মের মধ্যেও তিনি তাঁর পড়াশুনা ক'রে গেছেন। আমার বাবার বয়স তখন সাতাশ, মায়ের বয়স পনরো, এই দিক দিয়ে অর্থাৎ সংস্কৃতির

চর্চার মধ্য দিয়েই তাঁদের মানসিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। এই কারণেই আমার বাবার মত প্রবল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শান্ত সংযত বেগবান প্রবাহে পরিণতি তিনি দিতে পেরেছিলেন। তিনি শিষ্যার মত স্বামীর কাছে ধর্মশাস্ত্র পড়েছিলেন। সেকালের উপন্যাসগুলি সবই পড়েছিলেন ; পুরাণ রামায়ণ মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ , কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল পড়েছেন। হরিবংশ, ভাগবতের অনুবাদ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ কল্কিপুরাণ,—এ-সবও পড়েছেন। মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা সম্ভব, পলাসীর যুদ্ধ, রৈবতক, বৃত্রসংহার—এগুলিও সে আমলে পড়েছেন তিনি। আজ তাঁর বয়স সত্তর। ছেলে সাহিত্যিক হওয়ায় এ আমলে কিছু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, সরোজ রায়চৌধুরী এবং আমার লেখাও পড়েছেন। সেদিন নারায়ণ গাঙ্গুলীর বই পড়ছিলেন দেখেছি। আজও তাঁর পড়াশুনার অভ্যাস অটুট আছে। এবং সে অভ্যাস বিচিত্র। অম্বলের ব্যাধির জন্য আফিং খান। সন্ধ্যার সময় আফিঙের ঝোকে একবার শুয়ে পড়েন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ওঠেন, সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে বসেন একটি হ্যারিকেন সামনে রেখে একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। রাত্রের এ পাঠই তাঁর সত্যকার পাঠ। এবং এ সময়ে রামকৃষ্ণকথামৃত বা অন্য কোনো শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু পড়েন না। এমনও দেখেছি যে, রাত্রি দুটো, আলো জ্বলছে, মা পড়ছেন। কোনো কোনো দিন দেখেছি, সেই রাত্রে ভাঁড়ার ঘরে আলো জ্বলছে, মা ঘুরছেন ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পেয়েছি, 'বইখানা শেষ হ'ল ; শু'লাম, ঘুম এল না, তাই কি করব ? কাজ সেরে রাখছি।' কোনো দিন দেখেছি বই বন্ধ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন। বলছেন, 'বইখানা এই শেষ হ'ল। ভাবছি।'

তাঁর হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর। বানান নিভু'ল, ব্যাকরণেও ভুল করতেন না। আজকাল লেখার পাট প্রায় তুলে দিয়েছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল প্রায় বারো-চোদ্দো বৎসর আমাদের বাড়ীর

খসড়া জমাখরচের খাতা তিনি নিজে হাতে লিখেছেন ; সে খাতাগুলি আজও আছে। পৃষ্ঠাগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কতবার মামলার দাখিল কাগজে তাঁর সই বা লেখা দেখে বিচারক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এ কোনো মেয়ের হাতে লেখা হতে পারে না। তেমনি তার সাহস। অনুরূপ স্থৈর্য।

আমাদের বাড়ীর পশ্চিম ভাগে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ। ছটি শিবালয়, নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, কালীমণ্ডপ, নারায়ণের মন্দির, তার মধ্যে অনেকটা খোলা জায়গা। শিবালয়গুলির কোণে একটি বুড়ো কামিনীফুলের গাছ, গাছটিতে চ'ড়ে আমরা ছেলেবেলায় সমবেত জনতার মাথার উপর দিয়ে বলিদান দেখতাম। একদা রাত্রে আমার শোবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি—মা দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। প্রশ্ন করতেই নীরবে দেখিয়ে দিলেন কামিনীগাছটাকে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দেখলাম— কামিনীগাছের গুঁড়িটির যেখান থেকে দুটি ডাল বেরিয়ে পৃথক হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্তি। মধ্যে মধ্যে গাছের ডাল দুটিকে নাড়া দিয়ে দোলাচ্ছে। শিউরে উঠলাম। তারপর তিনি নিচে নামলেন। প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাবে? তিনি আঙুল বাড়িয়ে ওই ছায়ামূর্তি দেখিয়ে দিলেন।

—সে কি?

—দেখে আসি।

তিনি বাইরের দরজা খুলে তখন এগিয়েছেন। আমাকে অগত্যা অনুসরণ করতে হ'ল। খানিকটা গিয়ে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন —জ্যোৎস্না। কালো গাছের ফাঁকটায় জ্যোৎস্না পড়েছে।

সত্যিই তাই। কাছে গিয়ে দেখলাম, গাছের ফাঁকটি এই রাত্রে পল্লবের কালো রূপের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক মানুষের আকার নিয়েছে।

একবার আমাদের খিড়কিতে একটি শেওড়াগাছের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখে এগিয়ে গেলেন তার তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য।

সবচেয়ে তার সাহস এবং স্থৈর্য দেখেছি সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সাপের সম্মুখে। আমাদের বাড়ীতে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পিতামহের বাড়ীতে ও আমাদের বাড়ীতে গোখুরা সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রেই দেখে আসছি। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতের প্রারম্ভ পর্যন্ত অন্ততঃ চার-পাঁচটা বড় বড় গোখুরা মারা পড়েই প্রতি বার। এর সঙ্গে কয়েকটা চিতি, মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর দু-একটা চন্দ্রবোড়া। এক এক বৎসর বাড়ীর কাছেপিঠে বাচ্চা হ'লে বিশ-ত্রিশটা গোখুরার আধ হাত থেকে হাতখানেক লম্বা বাচ্চাও মারা পড়ে। একবার তিন-চার দিনে তেতাল্লিশটা বাচ্চা বেরিয়েছিল। সে-বার প্রথম বাচ্চাটা দেখা দিয়েছিল মায়ের পায়ের উপর। রোয়াকে উঠানে পা ঝুলিয়ে মা ব'সে আছেন, গরমের সময়, এখানে ওখানে ব'সে আছেন আরও সকলে। মা কথা বলতে বলতে স্থির হয়ে গেলেন। কথাও বলেন না, নড়েন না, মাটির মূর্তি যেন।'

পিসীমা ডাকেন—বউ!

উত্তর নাই।

—মা!

উত্তর নাই।

কে যেন শঙ্কিত হয়ে তার গায়ে হাত দিতে উদ্যত হতেই তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন—সাপ।

কোথায়?

—আমার পায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। চুপ কর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বলেন—আলো। পা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুতপদে একটা আলো নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, উঠান এবং রোয়াকের কোলের নালা বেয়ে চলেছে গোখুরা সাপের শিশু; আলো এবং মানুষের চাঞ্চল্যে তার মনোহর চক্র প্রসারিত ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াল। মা হাসলেন, কিছু বললেন না।

আশ্চর্য তাঁর এই সাপ সম্পর্কে সজাগবোধ। ঘরে সাপ বের হ'লে তিনি ঘরে ঢুকবা মাত্র বুঝতে পারেন। মাটির উপর সাপের বুকে

হাঁটার একটা শব্দ আছে। সে শব্দ যত মৃদুই হোক, তাঁর কানে ধরা পড়তই। পড়ত এই কারণে বলছি যে, আজকাল মায়ের কানের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাতেও তিনি বুঝতে পারেন বিচিত্র পর্যবেক্ষণশক্তিতে। ভাঁড়ার ঘরেই সাপ বের হয় বেশি। সাপ ঘরে স্থির হয়ে থাকলেও তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বলেন—আলোটা দেখি। ঘরে বোধ হয় সাপ রয়েছে।
আলো না নিয়ে ঘরে ঢোকাটাই তার অভ্যাস। হাজার ব'লেও আলো নেওয়ার অভ্যাস তাঁর হয় নি। আলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি সাপের সন্ধান করেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বের করেন—ওই, ওই। কোনো ক্ষেত্রে চ'লে যায় সাপ আলোর ছটা পেয়ে, কোনো ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ে, মা আলো সামনে রেখে গতিরোধ ক'রে আমাদের বলেন—লাঠি আনো, মারো। ক্ষেত্রবিশেষে বেদে ডাকানো হয়। বেদে ধ'রে নিয়ে যায়।

যে সাপ স্থির হয়ে থেকে গর্জন না ক'রে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চায়, অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব কেমন ক'রে তিনি বুঝলেন, এ প্রশ্ন প্রথম জীবনে সবিস্ময়ে একদিন করেছিলাম—কি ক'রে বুঝলে তুমি ?

হেসে বলেছিলেন—ঘরে ঢুকেই দেখলাম সব স্থির। আরসুলারা উড়ছে না, ইঁদুর দলের নাচের আসর বসে নি, বুঝলাম, ঘরে নিশ্চয় এমন কেউ এসেছেন যার সামনে এ-সব বেয়াদপি চলে না। ভীষণ শাসন তার।

আরও তত্ত্ব আছে, সে তত্ত্বটি সকল সময় ধরা পড়ে না। সাপ ও সাপিনীর মিলনের সময় সাপিনীর গায়ের কাঁটালীচাঁপার গন্ধের মত গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের তথ্যও তিনিই আমাকে বলেছিলেন। বেদেদের কাছে তথ্যের তত্ত্ব অবগত হয়েছিলাম পরে। এর সমর্থনও পেয়েছি সাপের সম্পর্কে যাঁরা বই লিখেছেন তাঁদের বইয়ে।
এই দিক দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সাহসের আর দুটি কথা বলব।

যদি নিজের মায়ের কথা কিছু বেশীই বলা হয়, তবু মার্জনা পাব ভরসা আছে।

আমার আট বছর বয়সের সময় আমার বাবা মারা যান। তারপর আমাদের বাড়ীর অভিভাবক হয়ে আসেন আমার বাবার মাতুল। তাঁরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না—তাঁর ওই ভাগিনেয়টি ছাড়া। আমাদের ভাগ্য—বৎসর চারেক পরে তিনিও মারা গেলেন এবং আমরা সংসারে হলাম একান্তভাবে পুরুষ-অভিভাবকহীন। বাড়ীতে নায়েব একজন এবং আমার ভাইদের পড়াবার জন্য একজন মাস্টার গৌর ঘোষ, তা ছাড়া চাকর ও চাপরাসী। এ ছাড়াও গরু-বাছুরদের পরিচর্যার জন্য দু-তিন জন বাউরী জাতীয় চাকর। বৈঠকখানার উঠানে ধানে বোঝাই মরাই তিন-চারটি। কয়েকদিন পরেই চাপরাসী, নায়েব, চাকর এবং গৌর ঘোষদের মুখপাত্র হিসাবে গৌর ঘোষ সবিনয়ে মাকে বললেন—মা, অপরাধ নেবেন না; একটি কথা বলব। পিসীমাকে বলতে সাহস হয় না, উনি রেগে উঠে হয়তো—

—কি বল?

—বৈঠকখানায় তো টেঁকা কঠিন হ'ল মা।

—কেন? ব'লেই মা বললেন—ও! ভয় পাচ্ছ তোমরা?

—হ্যাঁ মা। কর্তা বোধ হয়—

অর্থাৎ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

এতক্ষণে নায়েব বললেন—সমস্ত রাত্রি, যে ঘরে তিনি মারা গিয়েছেন, সেই ঘরে হট-হট শব্দ হয়, চেয়ারে খাটে যেন কেউ বসেন উঠেন। ভয়ে মা, শরীর হিম হয়ে যায়।

পিসীমা শুনেছিলেন কথাটা। তিনি প্রথমটা রাগই করলেন।

তাঁরা সভয়ে চ'লে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে চুপি চুপি ডাকলেন—মা! পিসীমা!

—কি?

—দয়া ক'রে একবার আসুন, নিজের কানে শুনে যান।

মা উঠলেন, পিসীমাকেও উঠতে হ'ল।

বৈঠকখানার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কান পেতে রইলেন।

হট্-হট্। খট্-খট্। তার পর দুম শব্দ উঠল।

যে ঘরে বাবার মাতুল মারা গিয়েছিলেন, সেই ঘরের মধ্যে। সকলে আঁতকে উঠলেন। মা কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ঘরটার তালা খুললেন। আলো নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। দেখলেন, সত্য সত্য চেয়ার টেবিল স'রে ন'ড়ে গিয়েছে। একটা চেয়ার উল্টে প'ড়ে আছে।

পিসীমা সকাতরে বললেন—বউ, কি হবে?

মা কোনও উত্তর দিলেন না। চারিদিক দেখলেন—তার পর আবিষ্কার করলেন একটি জানালা একটু খোলা রয়েছে। তিনি এগিয়ে গেলেন, জানালাটি বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে খিল এঁটে দিয়ে বললেন. সমস্ত জানালার খিলে একটা ক'রে পেরেক এঁটে দিন দেখি।

দেওয়া হ'ল। তারপর বললেন—এইবার দেখুন।

দুদিন পর আবার তাঁরা বললেন—মা, ওই ক'রে কি অশরীরীর উপদ্রব বন্ধ হয়?

—আবার হচ্ছে?

—ঘরে অবশ্য কিছু হচ্ছে না। সমস্ত রাত্রি চালের উপর চ'লে বেড়াচ্ছেন। মচ মচ শব্দ হচ্ছে। পরের দিন মা একটা পেয়ারা গাছ কাটিয়ে দিলেন। গাছটা ছিল বাড়ীর বাইরে। কিন্তু ডাল এসে পড়েছিল চালের উপর।

এবার সবই বন্ধ হ'ল। তারা বললেন—বুঝতে পারি নি মা; ওই মরাইয়ের ধান নেবার উদ্যোগ পর্ব হচ্ছিল। যাতে ভয় পাই, শব্দ হ'লেও না উঠি।

কিন্তু সেই দিন রাত্রেই বাড়ী থেকে খেয়ে বৈঠকখানায় ফিরেই তারা সদলে চীৎকার ক'রে উঠলেন। গৌর ঘোষ খুব উঁচু দরের ভূতের গল্প-বলিয়ে ছিল—সে বাড়ীর ভেতর পর্যন্ত ছুটে এসে প'ড়ে গেল।

—কি হ'ল?

—প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গাছের উপর কর্তা 'ঝাঁপ' বলে লাফিয়ে পড়লেন।

—বল কি? মা বের হ'লেন।

—বউ, যেয়ো না। বউ! পিসীমা ডাকলেন।

বউ শুনলেন না। গিয়ে যে কাঁঠাল গাছটার উপর কর্তা লাফিয়ে পড়েছিলেন, মাথার উপর আলোটা তুলে সেই গাছটার উপর আলো ফেললেন।

'ঝাঁপ' শব্দ ক'রে এবার লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লেন তিনি। তিনি কর্তা নন। পাউষ বিড়াল একটা। এক ধরনের বন্য বিড়াল। অবিকল 'ঝাঁপ' ব'লে চিৎকার করে। সকলেই তখন বললে—বললাম গৌর, ভাল ক'রে দেখ। তা না, ছুটে চ'লে গেলে বাড়ী।

গৌর বেচারা তখন একপাটি চটির অন্বেষণে ব্যস্ত থেকে লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করছে—এক পাটি আবার কোথায় গেল? কি বিপদ।

বিপদই বটে। ছুটে পালাবার সময় ছটকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে হাত দশেক দূরে মালতী লতার ঝোপের মধ্যে।

মায়ের এই সাহস আমার পক্ষে বিপদের হেতু হয়েছিল এক সময়। প্রথম সিগারেট খেতে শিখি তখন। রাত্রে বৈঠকখানায় অন্ধকারে আরাম ক'রে সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ হাত পড়ল পিঠে। ফিরে দেখি, মা দাঁড়িয়ে। কখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছেন। চমকে উঠলাম। হাত থেকে সিগারেট প'ড়ে গেল। মা বললেন—ছি! তারপর চ'লে গেলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে তিনি যেন আগলে ফিরতেন আমাকে। সর্বাপেক্ষা রাগ হ'ত এবং বিপদ হ'ত আমার উপন্যাস পড়া নিয়ে। তখন যা পাই পড়ি। পড়ি না শুধু পাঠ্য-পুস্তক। কিন্তু প্রতি বই পড়তে গিয়েই ধরা পড়ি তাঁর কাছে। তাঁরও ক্লান্তি নেই, আমারও ক্লান্তি নেই। অথচ এই গল্পের প্রতি আমারও অসাধারণ আসক্তির মূল তিনি। তিনি আমার গল্পের

আসক্তি জন্মিয়েছেন। অসাধারণ তার গল্প বলার শক্তি ছিল। আমি আমার জীবনে চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-বলিয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথম আমার মা। যেমন বলতে পারতেন গল্প, তেমনি অফুরন্ত ছিল তার ভাণ্ডার। অনেক গল্প আজও মনে আছে। আজও কানে বাজছে—

"কোথা গো মা কাজলহারা
মুছাও আমার অশ্রুধারা
প্রাণে মারবে মুক্তাহারা
আসবে রাজা মিনকোহারা
পত্নীহারা কন্যাহারা—
চোখের জলে ভাসবে ধরা।"

"রাজা মিনকোহারা মস্ত রাজা। দুই রানী তার, মুক্তাহারা আর কাজলহারা। মুক্তাহারা বন্ধ্যা, কাজলহারার একটি মাত্র কন্যা—ননীর পুতলী, যেমন লাবণ্য তেমনি রূপ। মিনকোহারা গেলেন দিগ্বিজয়ে। সুযোগ পেলেন মুক্তাহারা তার সতীনের উপর হিংসা চরিতার্থ করবার। কাজলহারা কিন্তু অত্যন্ত সরলা। তিনি দিদি বলেন মুক্তহারাকে। ভক্তি করেন, বিশ্বাস করেন। সুযোগ নিলেন মুক্তাহারা, মিষ্ট কথায় কাজলহারাকে ডেকে বললেন—আয় কাজল, তোর চুল বেঁধে দি। কাজলহারা দিদির সমাদরে উৎফুল্ল হয়ে চুলের গুছি দড়ি নিয়ে ছুটে এসে বসলেন ছোট আদুরে মেয়েটির মত। মুক্তাহারা অবিকল সাপের মত আকার দিয়ে বাঁধলেন বেণী, তারপর একটি মন্ত্রপূত শিকড় তার খোঁপায় গুঁজে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজলহারা হয়ে গেলেন এক অজগর সাপ। হয়ে তিনি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে নগরের প্রান্তে একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। পিছন পিছন তাঁর মেয়েটি এসে—সেই কোটরের ধারে ব'সে ঐ ব'লে কাঁদতে লাগল।" এই গল্প। কিন্তু ওই যে রাজকন্যার কান্না—সে-কান্নায় শ্রোতারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলত, আমি কাঁদতাম। আজও আমার মনে আছে, তার সেই বিলাপের অবিকল শব্দবিন্যাস।

গল্প শেষে মা হেসে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটি হিন্দী প্রবাদ বাক্য বলতেন—বলনেওয়ালা ঝুটা, শুননেওয়ালা সাচ্চা, অর্থাৎ গল্প যে বলে মিথ্যে, কিন্তু যে শোনে সে শোনে সত্য।

আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর ডায়রীতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রী—"বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞাপন দ্বারা বঙ্গবাসীকে পরস্পরের হস্তে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বাঁধিতে বলিয়াছেন। সকল বঙ্গবাসীই তাহা পালন করিবে। ইহা দ্বারাই আমরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব। হায়, আজ ৯৫০ বৎসর পরে ঈশ্বরের কি মহিমা যে ভারতের দরিদ্র সন্তানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে সংকল্প করিয়াছে? হে বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, জগদীশ্বর—হে জগজ্জননী, অসুরদর্পদলনী মা—একবার তোমাদের চির-আশ্রিত শরণাগত ভারতসন্তানগণকে—যাহাদের জন্য তোমরা যুগে যুগে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া পাপের নাশ করিয়াছ—পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ—অসুর-প্রাদুর্ভাব দলন করিয়াছ—তাহাদের শক্তি দাও, তাহাদের হৃদয়ে পুণ্যের আলোক প্রজ্বলিত কর। সত্যধর্ম—হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত কর। দীনবন্ধো, কৃপা কর—কৃপা কর—কৃপা কর।" অন্যত্র পাই তিনি দেশপ্রেমোদ্দীপক 'পদ' রচনা করেছেন।

আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল অবাস্তব। তিনি পাটনার মেয়ে। বাস্তব রাজনীতিবোধ তাঁর শুদ্ধমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। আমার বড় মামার মধ্যে মানিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তী কালে আমার সেজ মামা—তিনি আমার থেকে চার-পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন—তিনি উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদলের দলভুক্ত হয়েছিলেন। অকালে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে

তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। পরে বেনারস কন্‌স্‌পিরেসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে—তাঁর পরবর্তী ছোট ভাইকে তাতে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে।

ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমার বড় মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তার হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন—বাংলার মাটি—বাংলার জল—

এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতা'য় আছে। 'ধাত্রীদেবতা'র মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। আমার আত্মীয়া একটি কলেজে-পড়া মেয়ে 'ধাত্রীদেবতা' প'ড়ে বলেছিল—'আপনি নিজের মাকে একেবারে মহিমময়ী ক'রে বই লিখেছেন।' আমার মা সত্যই মহিমময়ী।

আজ তিনি বৃদ্ধা, জীবনের দীপ্তি হ্রাস পেয়ে আসছে। সে আমলের সে দীপ্তিময়ীকে প্রথম দর্শনে চেনা যায় না, তার বদলে দেখা যায় এক অপরিসীম করুণাময়ী নারীকে, যাঁর বুকে আজ সকল আগুন জল হয়ে অক্ষয় সরোবরের সৃষ্টি করেছে। সামান্য জীবজন্তুর কষ্ট দেখা দূরের কথা—শুনলেও সে সরোবরে উচ্ছ্বাস উঠে। আছে শুধু আত্মার সেই আকুতি। সেই আকুতিতে তিনি প্রতীক্ষা ক'রে আছেন মৃত্যু কবে আসবে সেই দিনের। এ প্রতীক্ষা জীবনের পরাজয়ের তিতিক্ষায় নয়, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতময়ের সাক্ষাতের প্রত্যাশায়।

৪

মা আমার মহিমময়ী। কালের নূতন পদপাতে আলপনায় পদশোভা আঁকবার শক্তি এবং নৈপুণ্য নিয়ে জন্মেছিলেন বা অর্জন করেছিলেন ব'লেই তিনি শুধু মহিমময়ী নন। আরও কিছু আছে। সেটা হ'ল —নূতন পদপাত ক'রে কাল যে নবযুগ-ভঙ্গিতে প্রকট হলেন, তাতেই তাঁর জীবনদর্শন বা ভাবনা গণ্ডীবদ্ধ নয়। যুগভঙ্গিমায় প্রকট

কালের মহাকালরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর অসীম। নূতনকে আসন ও অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করেছেন; যুগধর্মকে যুগের প্রভাবকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু জীবন-ভাবনায় মানুষ যা চিরদিন ভেবে এসেছে, সে ভাবনা তাঁর গভীর; সেই ভাবনাতেই আজ বৃদ্ধ বয়সে তিনি তন্ময়, তাই সমস্ত কিছুর মধ্যে মানব-জীবনের অমোঘ নীতিবোধটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবন-মন্ত্র: এবং তার আটষট্টি বৎসরের জীবন গঙ্গাধারার মত পবিত্র নিরাসক্তির স্রোতোধারায় অহরহই যেন সদ্যস্নাত। পৃথিবীর সম্পদকে, সুখকে তিনি তুচ্ছ বলেন না, লক্ষ্মীকেই তিনি শক্তিরূপা ব'লে থাকেন, পূজাও দেন, প্রণামও করেন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবতা হলেন বৈরাগ্যের দেবতা শিব।

মায়ের প্রসঙ্গে এই কথা বলছি যখন তখন এ-কথাটিও বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে যে, সে কালে এই ভাবনাটি প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছিল। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরা বলেন—এই বোধ বা আধ্যাত্মিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে এ দেশের মানুষের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঐহিক সমস্যার সমাধানে সমগ্র জাতিটাকেই ক্লীব ক'রে তুলেছিল। ইতিহাসে তার নজীর আছে। হিন্দুর পরাজয়ের আর অবধি নাই, যে এসেছে—শক-হূন, চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, পাঠান, মোগল, ইংরেজ —সবার কাছেই তাকে হারতে হয়েছে। শুধু কি মানুষেরই কাছে হেরেছে? সরীসৃপ, পশু—এর কাছেও হার মেনে এদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছে। মনসা পূজা, দক্ষিণরায় পূজা আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। সত্যসত্যই জীবনদর্শন তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আধ্যাত্মিকতা পরিণত হয়েছিল তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সমারোহে- কোটী কোটী অক্ষম মানুষের 'দেহি দেহি' প্রার্থনা কোলাহলে; ভাবনাও মন থেকে নির্বাসিত হয়ে বাইরে এসে নিয়েছিল অর্থহীন আকার ও অন্ধ সংস্কারের চেহারা।

এ সব স্বীকার ক'রেও কিন্তু আমার মন সে কালকে কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মত বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের

পুতুল ব'লে মিউজিয়ামের বস্তু ব'লেও ভাবতে পারে না। ওর মধ্যে কোথায় যেন কি আছে। বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু। তেত্রিশ কোটী দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদী নির্মাল্য, অম্লান বিল্বপত্রের মত কিছু। আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না।

একটু খুলেই বলতে হবে। সে কালেও দেখেছি আবার আজকের কালেও দেখছি। সে কালের বিকৃতিকে স্বীকার আমি আগেই করেছি। আবারও করছি। বার বার স্বীকার করছি এবং যে আবর্জনার স্তূপ প'চে উঠে ওই চির-অম্লান দুর্লভ বস্তুটিকে চেপে রেখেছিল তা স্মরণ ক'রেও শিউরে উঠছি। মনে পড়ছে এই জঞ্জাল আমার মাথার চুলে বাসা গেড়েছিল ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায় আমার মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল ছিল। অন্নপ্রাশনের সময় চূড়াকরণের জন্য কয়েকটি দাগ কেটে ক্ষুর বুলানোর পর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত চুলে আর কাঁচি ঠেকে নি। লম্বা পিঠ পর্যন্ত চুল অনেকে শখ ক'রে আজকাল রাখেন, শখের দায়ে অনেক কিছুই সহ্য হয়; কিন্তু আমার চুল শখের ছিল না। মাথার লম্বা চুলে আঠা বাঁধত, চুল শুকতে হ'ত, মধ্যে মধ্যে উকুন হ'ত, সত্যসত্যই সে আমার মাথায় ছিল জঞ্জালের বোঝা। একদা চুলের এই জঞ্জাল-স্বরূপ এমন উৎকটভাবে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করলে যে, সে-কথা আর বলবার নয়। একদিন রাত্রে বিনুনি বাঁধা আমার মাথায় আমার তিন বছরের বোন বিষ্ঠা লেপন ক'রে দিলে। গভীর রাত্রে সে এক প্রায়শ্চিত্ত। বিনুনির ছাঁদের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকেছে ময়লা। সেই বিনুনি খুলে সেই রাত্রে স্নান করতে হ'ল। সেই রাত্রে মনে হ'ল আমার, কেন আমি চুল রাখব? কাটবই আমি চুল।

কিন্তু নিরুপায় অসহায় আমি। এ চুল দেবতার কাছে মানতের চুল। একা আমার নয়, অনেকের মাথায় মানতের চুল থাকত। কারও পাঁচ বৎসর, কারও দশ বৎসর, কারও উপনয়ন পর্যন্ত (ব্রাহ্মণদের), চুল বাড়ত, কারও কারও আবার চুলের সঙ্গে জটাও থাকত মানত্,

জটা তৈরী হ'ত সযত্ন পরিচর্যায়। ঠিক আমারই বয়সী আমার বাল্যসঙ্গী বদি বা বৈদ্যনাথের চুল এবং জটা ছিল তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত। তার উপনয়ন পর্যন্ত মানত্ ছিল, উপনয়ন হয়েছিল তেরো বৎসর বয়সে। বেচারী মাথায় রীতিমত খোঁপা বেঁধে ইস্কুলে যেত। ওই সময়ে শুনতাম—যখন সে ছোট ছিল, তখন বয়স্কেরা কৌতুক ক'রে বলতেন—কই, তেঁতুল পড়া দেখাও তো! ব'লেই বলতেন—জট নড়ে তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে তেঁতুল পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে বদির মাথা ঘন ঘন নড়তে শুরু করত, জটা দুটিও আন্দোলিত হ'ত তেঁতুলের সোঁটার মত। বড় হয়ে লজ্জা পেত বৈদ্যনাথ। হঠাৎ আমার সুযোগ এল এ-জঞ্জাল মুক্ত হবার। সে-দিন আনন্দের আমার সীমা ছিল না। ব্যক্তিগত জঞ্জাল-জ্বালার অসুখ অসুবিধা ছাড়াও আরও অনেক কিছু চুলের বেদনা। এ বয়সের কথা যত কিছু মনে আছে তার মধ্যে চুলের জন্য লজ্জা পাওয়ার কথা মনে আছে। বাইরের লোকে আমাকে দেখে প্রথমেই খুকী ব'লে সম্বোধন করত। একদিনের কথা আজও মনে আছে আমার। তখন আমার বয়স তিন বছর। প্রথম যাচ্ছি মামার বাড়ী পাটনায়। ট্রেনে চড়েছি প্রথম। আদমপুর স্টেশনে যখন ট্রেনখানা এসে প্রথম ঢুকল—সে ছবি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে একটা টকটকে লাল ছবির মত। মনে পড়ছে ইঞ্জিনের মুখটায় টকটকে লাল রঙ দেওয়া ছিল আর ঝকমকে সোনার মত উজ্জ্বল পিতলের হরফে কিছু লেখা ছিল। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে—কামরার ভিতরে বাবা, মা, মায়ের কোলে কয়েক মাস বয়সের আমার বোন এবং আমি। আর মাথায় কালো টুপি-পরা এক ভদ্রলোক ব'সে আছে। রেলিং দেওয়া ঘেরা ছোট্ট খাঁচার মত কামরা। ওই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি খোকী, মামা-বাড়ী যাচ্ছ? আমি যে কী লজ্জা পেয়েছিলাম—সে আর কী বলব! হাতে ধ'রে বিনুনি দুটোকে টানতে শুরু করেছিলাম।

গ্রামের অনেক প্রবীণ, যাঁরা নাকি সম্পর্কে ছিলেন ঠাকুরদাদা—তাঁরা

রহস্য ক'রে বলতেন তারাশঙ্করী। বাল্যবন্ধুরাও শুনে কথাটা শিখে নিয়েছিল।

তবুও কাটবার কোনো উপায় ছিল না।

মনে মনে দারুণ ভয় ছিল—বাবা বৈদ্যনাথের মানতের চুল। এর একগাছি চুল ছিঁড়ে গেলে দেবতা রাগ করবেন।

আজ ভাবি এই সব কথা। সে-সব জঞ্জাল আজ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হতে শুরু হয়েছে ভেবে আশ্বাস পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আকুতিতে তাকে খুঁজে-পেতে দেখি। সে আমলকে চোখে দেখেছি—অন্তরে অন্তরেও অনুভব করেছি ব'লেই স্পষ্ট বুঝতে পারি জীবনের হবিকে ভস্মে ঢালার মর্মকথা। আমাদের সমাজের যে সব মানুষের স্বল্প আয়, কিছু কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চালিয়ে আসছিলেন—তারা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতায়, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব উপস্থিত হ'লেই বিপর্যয়ের দুঃখ শুরু হয়। সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ ছিল বাইরের জগতে গিয়ে—যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে অর্থ উপার্জন ক'রে আনা। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল না, সাহসও ছিল না। সে আমলের সুখীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। সেই কারণে প্রবাসবাস ছিল দুঃখদায়ক, এবং সংসারে যা দুঃখদায়ক তাই ভীতির বস্তু। আর শুরু হয়েছিল শিক্ষা-বিপ্লব। যাঁরা ইংরাজী জানতেন না তাঁদের সম্মুখে বাইরের জগতের পথ ছিল রুদ্ধ; অন্তত তাঁরা তাই মনে করতেন। অথচ ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় তাঁরা আজকের দিনের উচ্চপদস্থের চেয়ে হীন কি অক্ষম ছিলেন না। এ-কালের শিক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্বের ও যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হ'লে সমান কৃতিত্বের পরিচয় তাঁরা দিতে পারতেন। এই অবস্থার মধ্যে প'ড়ে এই সব মানুষই অসহায় হয়ে একমাত্র দৈব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে ছিল। বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর, ভরসা ছিল না রাজশক্তির উপর, সুতরাং একটা ভরসাস্থল ছাড়া মানুষ বাঁচে কি ক'রে? ধর্মের অবস্থা তখন বিকৃত।

এই কালে ধর্মের বিকৃত অবস্থাটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত্ করেছে। এবং মানত্ করেছে বা করতে চেয়েছে তার সব কিছু। নখ থেকে চুল থেকে প্রিয় আহার্য এবং আরও অনেক কিছু। আমি হাত মানত্ রাখতে দেখেছি। ডান হাত এক বৎসরের জন্য মানত্ রেখেছিলেন আমার পিসীমা। ডান হাতখানি দেবতাকে দিয়ে সংসারের সকল কর্ম বাঁ হাত দিয়ে করতেন; প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ঘেমে সারা হচ্ছেন—বাঁ হাতে পাখা চালাচ্ছেন—বাঁ হাত ভরে গিয়েছে, পাখা রেখে দিয়েছেন, তবু ডান হাতে পাখা স্পর্শ করেন নি।

এক কালের নগর ভেঙে পড়ল জীর্ণ হয়ে, তার চারিপাশের উপবনগুলি সংস্কারাভাবে হয়ে উঠল অরণ্য, সেই অরণ্য শিকড় গজিয়ে ফাটিয়ে ফেললে নগরীর বসতি, দেওয়ালের সেই ফাটলে উড়ে এসে পড়ল গাছের বীজ, প্রাসাদের বসতির মাথায় মাথায় জন্মাল বনস্পতি—তারই মধ্যে যে মানুষের দল বাস করছিল, তাদের চোখে একদা প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এল যখন নূতন কাল তখন চোখ তাদের ধেঁধে গেল। উপায়ান্তরহীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ ক'রে লুকাতে চাইল ওই ভাঙা নগরীর গহনতম প্রদেশে। ওইখানেই তাঁদের বাঁচবার আশ্বাস।

অসহায় মানুষেরা মানত্ করেছে, পূজা করেছে, ভাল করেছে, মন্দ করেছে, যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে। তান্ত্রিক মদ খেয়েছে কালীমার 'নাম ক'রে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম ক'রে, বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দের নাম ক'রে। তাদের জন্য বেদনা অনুভব করি। ঘৃণা করতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি। ওই নির্মাল্যের সন্ধান। এই স্তূপীকৃত মিথ্যার মধ্যে সত্য কিছু দেখেছি আমি। হঠাৎ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করত। এই যে দেবতার পূজা, বিকৃত ধর্মাচরণের অন্তরালে এত পার্থিব কামনা—এই কামনা অকস্মাৎ দেখা যেত শেষ হয়ে গিয়েছে। সে-কালের মানুষেরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হতেন

তখন এই সত্য আত্মপ্রকাশ করত। আজকের দিনে নিজেরাই প্রবীণ হয়ে এসেছি, এই বয়সে এ-কালের অনেক প্রবীণের অন্তিম শয্যার পাশেও উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সে-কালের মানুষদের মৃত্যুর সম্মুখীনতার সময়ের রূপ বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। প্রবীণদের কথা বাদই দিচ্ছি; যাঁরা নাকি পঞ্চান্ন-ষাট বছর বয়সেও মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁদেরও শতকরা আশীজনকে আশ্চর্য প্রশান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেখেছি; যেটা নাকি এ-কালে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হবে না। রোগে যাঁরা অজ্ঞান হয়ে যেতেন, জ্ঞানহীন অবস্থাতেই যাঁদের জীবনান্ত ঘটত, তাঁদের কথা বলছি না। সে-কালে পল্লীগ্রামে টাইফয়েড বা ম্যানেনজাইটিস, আকস্মিক হার্টফেলে মৃত্যু বা সন্ন্যাস রোগ বিরল ছিল। মানুষের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পরমায়ুও স্বভাবতই ছিল দীর্ঘ। সজ্ঞানে প্রবীণেরা মৃত্যুকালে প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে বিদায় সম্ভাষণ জানাতেন, পরমাত্মীয়দের নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন। একটি কথা সকলেই ব'লে যেতেন—'অধর্ম ক'রো না সংসারে। দুঃখ কাউকে দিয়ো না।' আর বলতেন কে তাঁর কাছে কি পাবে। সে পাওনা শুধু আর্থিক পাওনাই নয়—অন্যবিধ পাওনাও বটে। বলতেন, 'অমুক আমার এই বিপদের সময় মহৎ উপকার করেছিল; আমি তার কিছুই করতে পারি নি, তুমি এই উপকারের ঋণ শোধ ক'রো।' অনেকে আবার ছেলেদের দেনা-পাওনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিতেন সরকারী কর্মচারীদের চার্জ নেওয়ার মত। তাঁর শ্রাদ্ধে কি খরচ করবে, সেও নির্দেশ দিয়ে যেতেন। তারপর হঠাৎ বলতেন—'আর না। দাও, আমার জপের মালা দাও।' কিংবা বলতেন—'শোনাও, এইবার নাম শোনাও। অনেকে কাশীতে অথবা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করতে আয়োজন ক'রে খোল করতাল বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে প্রতি দেবালয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে যেতেন—দৃষ্টি আবদ্ধ থাকত হয়তো আকাশের দিকে অথবা গ্রামের সর্বোচ্চ তরুশীর্ষে—কে জানে!

আজ পঞ্চাশোর্ধে যখন দিন চলেছে, তখন এই যাওয়াকে আর তুচ্ছ

করতে পারি নে কোনো মতেই। ব'সে ব'সে ভাবি আর অনুভব করি যেন তাদের এই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণও অমৃতের স্পর্শ আছে। সাধক রামকৃষ্ণের গান মনে পড়ে—

"আন রে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে।"

হয়তো সবটাই মানসিক বিকৃতি। এই বিকৃতি এতই প্রচণ্ড যে, পাগলের আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করতেন তাঁরা—এ বললে তর্ক করব না। সবিনয়ে মাথা নত করে হার স্বীকার ক'রেও বলব নূতন কালকে—নূতন কালের সত্যকে স্বীকার ক'রে, মাথায় নিয়ে কামনা করি, মৃত্যুর সময় যেন এমনই পাগলের আনন্দেই মৃত্যুকে বরণ করতে পারি অর্থাৎ কল্পনায়ও অমৃতবিন্দুর আস্বাদ পাই।

পরবর্তী জীবনে তখন আমি প্রায় গ্রাম্য পরিব্রাজক, পিঠে বোঁচকা বেঁধে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। মেলা বেড়ানো একটা রোগ দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখেছিলাম। বয়স কত অনুমান করা কঠিন। কাটোয়ার পথে দেখা হয়েছিল। কাটোয়ার পাকা সড়কে হেঁটে চলেছিলাম; পাঁচুন্দির পর কাঁচা সড়ক, সড়কের দুই ধারে বনওয়ারীবাদের রাজাদের কল্পবৃন্দাবনের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। বড় বড় দীঘি, বাঁধানো ঘাট, পুরাকালের সুরম্য উপবনের ভগ্ন স্মৃতি, কয়েকটি বাঁধানো বেদী, কতকগুলি কেয়াগাছ, কয়েকটি চাঁপা করবীর গাছ, দু-একটি মাধবীলতা; তাল গাছের বেড়া, দু-একটা ভাঙা কুঞ্জে শুধু একটা কি দুটো তমালের গাছ দাঁড়িয়ে আছে, আর আছে দু-একটা ছায়ানিবিড় সপ্তপর্ণী, যার চলতি নাম ছাতিমগাছ। এর কোনোটা তমালবন, কোনোটা কাম্যকবন, কোনোটা বা নিধুবন; অর্থাৎ বিস্তীর্ণ চার-পাঁচ ক্রোশ একটি অঞ্চল জুড়ে রাজারা বৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন রচনা করেছিলেন; তার অবস্থিতি হ'ল বনওয়ারীবাদ থেকে উদ্ধারণপুরের ঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে। এইখানে তাঁদের গৃহদেবতা বনওয়ারীজীর লীলা চলত। বনওয়ারীবাদের রাজার এখন ভগ্নাবস্থা। কীর্তিও ভাঙা-ভগ্ন হয়ে

এসেছে। কিন্তু ওই ভগ্ন কীর্তিময় পরিপার্শ্ব পথিকের মনে আজও একটি অপরূপ স্বপ্ন রচনা করে। এই পথে যেতে একটি প্রাচীন ছাতিমগাছের তলে দেখলাম এক বৃদ্ধ বাউলকে। একা ব'সে আছে নিস্পন্দ মৃতের মত। আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথমটায়। থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, মৃত নয়, জীবিত মানুষই বটে। এগিয়ে কাছে গেলাম, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, এই অবস্থায় তুমি এখানে গাছতলায় প'ড়ে কেন? কানে ভাল শুনতে পায় না লোকটি, এত জীর্ণ হয়েছে শরীর। ক্ষীণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলে—কি বলছেন বাবা? কানে হাত দিয়ে হেসে বললে—শুনতে পাই না ভাল।

একটু জোরেই প্রশ্নটিব পুনরুক্তি করলাম।—এই শরীর তোমার, ইত্যাদ ইত্যাদি।

আবার হেসে সে বললে—সেই জন্যেই তো বাবা, যাব উদ্ধারণপুর, মা গঙ্গার তীরে। দেহ রাখতে যাচ্ছি বাবা। পরমপুরুষ ভাঙা আবাসে আর থাকবেন না।

কথায় কথায় সে বলেছিল অনেক কথা। যার সারমর্ম হ'ল—বাবা, ওর মধ্যে কতদিন আত্মাপুরুষ বাস করলেন। দেহ তো নয় বাবা, দেহমন্দির। একদন কত গরব করেছি, কত মেজেছি ঘষেছি, সাজিয়েছি; আজ উনি রব তুলে অহরহ বলছেন—পড়ম্ পড়ম্। তাই নিয়ে চলেছি—গঙ্গার কূলে, সাধক উদ্ধারণ দত্ত বাবার পাটে—গিয়ে বলব—নাও এইবাব পড়, সামনে গঙ্গাব শীতল জল, জলে প্রভুর পায়ের পরশ, মাটিতে সাধকের পদধূলি; তুমি এই পুণ্যের সঙ্গে মিশে যাও।

প্রশ্ন করেছিলাম -কিন্তু এই দেহ নিয়ে যাবে কি ক'রে? আসছ কত দূর থেকে? এলে কেমন ক'রে?

—চিন্তামণির দয়ায় বাবা। আসছি, তা ক্রোশ ছয় হবে। গোবিন্দ ব'লে বেরিয়ে পড়লাম ঝুলি কাঁধে নিয়ে, পথের ধারে এসে দাঁড়ালাম, গরুর গাড়ীতে আসছি। গাড়োয়ানকে ডেকে বললাম—ধানের বস্তার

ফাঁকে আমাকে একটু বসিয়ে নাও না বাবা, আমিও বস্তার সামিল। তারা তুলে নিলে। ছোট লাইনের ইষ্টিশানে এসে রেলের বাবুদের বললাম—দাও না বাবা, মালগাড়ীতে বোঝাই করে। বেশী ওজন হবে না। তোমাদের ইঞ্জিনে টানতে একটুও কষ্ট হবে না। তারা তুলে দিলে গাড়ীতে। নামিয়ে দিলে পাঁচুন্দিতে। পাঁচুন্দি থেকে হেঁটে যাবারই বাসনা ছিল। তা উনি নারাজ। কেবল বলছেন, পড়ম্—পড়ম্—পড়ম্। পড়ব—পড়ব—পড়ব। গোটা এক দিন কোনো রকমে বুঝিয়ে-সুজিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে এই গাছতলায় বসেছি। দেখি, গাড়ী পেলেই বলব—নে বাবা, ভাঙা মন্দিরকে বেঁধে-ছেঁদে তুলে নে, উদ্ধারণপুরের পথে যতটা যাবি নিয়ে চল। যেখানে পথ ভাঙবি, সেইখানে দিস নামিয়ে। আবার বসে থাকব গাছতলায়—দেখব আবার গাড়ী।

অনেকক্ষণ তার কাছে বসেছিলাম। অনেক কথা বলেছিলাম। সে শুধু বলেছিল এই কথাই—জীর্ণ দেহমন্দিরখানিকে গঙ্গার পুণ্য-তীর্থময় ঘাটে বিসর্জন দিয়ে তার আত্মাপুরুষকে মুক্তি দেবে। কী আনন্দ যে তার সেই বহুরেখাঙ্কিত পাণ্ডুর মুখখানিতে দেখেছিলাম, সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ যিনি ছিলেন, তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি তিনি। তাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের লোক। বড় উকিল ছিলেন, উপার্জন ছিল প্রচুর, ভোগীও ছিলেন তেমনি। বিবাহ করেছিলেন তিনবার। অবশ্য প্রত্যেক বারেই বিপত্নীক অবস্থাতে বিবাহ করেছিলেন। সন্তান ছিল, সে সত্ত্বেও শেষ বারে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স অনেক, ষাটের উপর তো বটেই, সত্তরের কাছে, হয়তো বা উনসত্তর। কর্তা থাকতেন সিউড়ীতে, ছেলে থাকতেন লাভপুরে—সম্পত্তি দেখতেন। তিনি বিবাহ করলেন, ভাইয়ের নিষেধ শুনলেন না, বন্ধুর নিষেধ না, কারুর না। তাঁর বিবাহের পর সিউড়ীর উকিলেরা শুনেছি ঢাক বাজিয়ে বর-কন্যাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

কিন্তু তাতে তিনি লজ্জিত হন নি। বিচিত্র মানুষ বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করলেন, কিন্তু পত্নীকে পাঠিয়ে দিলেন লাভপুরের সংসারে। নিজে সিউড়ীতে রইলেন প্রণয়িনীকে নিয়ে। এতে তাঁর কোনো সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। লাভপুরে আসতেন, প্রচুর মদ্যপান ক'রে পূজা-সমারোহে সত্যসত্যই নাচতেন। এক কথায়, দান করতেন টাকা-পয়সা যা হাতে উঠত তাই। একবারও দেখতেন না কি দিচ্ছেন। মত্ত অবস্থায় আঙুল থেকে আংটি প'ড়ে গেছে, কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে, ফেরত দিতে এসেছে, বলেছেন—উঁহু, ও আর আমার নয়, ও তোর। আমার ভাগ্য আমার আঙুল থেকে খসিয়ে নিয়ে তোর হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের আইনে অবিশ্যি এটা আমারই, কিন্তু ভাগ্যের আইনে ওটা তোর।

নঝ.. ং ন। পারলে বলতেন, ওবে মূর্খ, ওটা তোর হ'ল, নিয়ে যা। আমি বাবা ও-পারে গিয়েও ওকালতি করব—সেই আইনের ধারা। এ তুই বুঝবি না। তবে তুই যখন ফিরে দিতে এসেছিস তখন তার জন্যে তোর এ-পারের আইনে আরও কিছু পাওনা হয়েছে। নে। ব লে আধুলিটা বা টাকাটা তার হাতে দিয়েছেন।

আবার যে পেয়েছে কুড়িয়ে—সে-কালের সে মানুষ এমনি যে, সে ভেবে আকুল হয়েছে, হায় হায় হায়, সে এখন করবে কি? পরের সোনা কুড়িয়ে পাওয়া যে ভাল নয়। যে মালিক সে ফিরে নিলে ভাগ্য মন্দ বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেত। মালিক নিলে না—সে এখন করে কি? যাক। এমনি মানুষ ছিলেন আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ। বাড়ীতে শিবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, দুর্গাপূজা এনেছেন, কালীপূজা সরস্বতীপূজা এনেছেন, নিত্য নারায়ণ সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অহঙ্কার ক'রে বলেন, কাশী বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। মানুষটাকে বিচার করলে মনে হয় —প্রতিষ্ঠার আনন্দে বিভোর, তার দম্ভে দাম্ভিক।
তীর্থে যেতে বললে বলতেন—কোথায় যাব, কিসের জন্যে যাব? আমার বাড়ীর দোরে সব দেবতাকে বসিয়ে রেখেছি। আমি যাব কোথায়? সত্যই দাম্ভিক লোক।

এই মানুষ জ্বরে পড়লেন। চেতনা হারালেন। কবিরাজ বললেন—এ জ্বর থেকে কর্তা উঠবেন না। যা ব্যবস্থা হয়, করুন।
গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হ'ল। পাল্কি সাজল, গরুর গাড়ী সাজল। তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ পাল্কিতে তোলা হ'ল। গ্রামের সকল দেবালয়ে পাল্কি নামিয়ে—সংজ্ঞাহীন মানুষটির ললাট রজবিভূষিত করা হ'ল। পাল্কি গিয়ে থামল—আমাদের গ্রামপ্রান্তে মহাপীঠতীর্থ ফুল্লরাতলায়। এই স্থানটিই গ্রামের শেষ বিদায়স্থল। এর পর পাল্কি একেবারে গঙ্গাতীরে গিয়ে নামবে। ষোলোজন বেহারাই যথেষ্ট—কিন্তু বত্রিশজন বলশালী কাহারের ব্যবস্থা হয়েছে। ফুল্লরা-দেবীর প্রাঙ্গণে পাল্কি নামল, পুরোহিত মাথায় আশীর্বাদী দিচ্ছেন—কর্তা চোখ মেললেন। চারিদিকে জনতা এবং দেবস্থলের ঘন জঙ্গল ও মন্দির প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে নিজেকে পাল্কির মধ্যে দেখে প্রশ্ন করলেন—কোথায় এনেছে আমাকে?
ভাই এগিয়ে এলেন, বললেন—মহাদেবী ফুল্লরা মাতার স্থানে। আপনাকে জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
হাত বের ক'রে ভাইয়ের মাথায় রেখে বললেন—আমি রামচন্দ্রের চেয়ে ভাগ্যবান। আমার লক্ষ্মণ আমার মহাপ্রস্থানের ব্যবস্থা করেছে, তাকে রেখে আমি আগে যাচ্ছি। আমার অন্তরের কামনা সে জানে না। অচেতন হয়ে পড়েছিলাম—অন্তিম কামনা জানাতে পারি নি।
ভাই বললেন—পাল্কি তুলবে এবার?
—না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কর্ম বাকী আছে আমার।
—বলুন।
—আমাদের ঘরে ভাগেরা আছেন। তাঁদের প্রাপ্য দিতে হবে। আমাদের সন্তানেরা কৃতী নয়, তারা অকৃতী কিন্তু ভোগী। তারা কখনও দেবে না। ...এই সম্পত্তি তাদের দিলাম আমি।
আর দুই-একটি ব্যবস্থার পর হেসে বললেন—বাস্।
ভাই জিজ্ঞেস করলেন—আর কোনও আদেশ থাকে তো বলুন।

বললেন—এইবার আদেশ, পাল্কি তোল। কালী'কালী বল সকলে। দু'কান ভ'রে শুনি। সময় বেশী আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। নিজে নাড়ী অনুভব ক'রে বললেন—হয়তো শেষ রাত্রি পর্যন্ত।

—আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে—?

হাত নাড়লেন। কোনো কামনা নেই আর, সুতরাং বক্তব্যও আর নেই আমার। এখন চল চল চল। আমার মালা দাও।

আমার পিতামহ কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। চুরাশী বৎসর বয়সে সপরিবারে তীর্থ-যাত্রা করলেন। চুরাশী বৎসর বয়সেও তিনি যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। এ-বয়সেও তাঁর চুল পাকে নি: কালো ছিল চুল। দেহেও ছিলেন সমর্থ। যা শুনেছি, তা বিস্ময়কর মনে হয় আজকের দিনে। পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সিউড়ীতেই বাস করেছেন। শেষের চার-পাঁচ বৎসর ওকালতি করতেন না। তখন আদালতে ইংরিজীর রেওয়াজ শুরু হয়েছে। ইংরিজী-জানা উকিলেরা এসে বসেছেন। বাংলা ও ফার্সীনবীসদের মানসম্মান চলে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তিনি ওকালতি ছেড়ে দিলেন। সে-কথা থাক। তাঁর সামর্থ্যের কথা বলি। দুর্গা পূজায় তিনি নিজে জপের কর্ম করতেন। ষষ্ঠীর দিন তিনি সিউড়ী থেকে লাভপুরে আসতেন। বিশ মাইল পথ, উপবাস ক'রে তিনি পদব্রজে রওনা হতেন, সঙ্গে পাইক থাকত; এই পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি উপবাসী থেকে পদব্রজে বিশ মাইল পথ হেঁটে লাভপুরে পৌঁছে পুনরায় স্নান ক'রে সন্ধ্যার সময় নবপত্রিকা ও নবপল্লবের অধিবাস ও পূজাসংকল্পাদি সেরে তবে জল খেতেন। চুরাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত দেহে রোগ বড় একটা কেউ দেখে নি। মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতশিরার জ্বর হ'ত। বাতশিরা এ-কালে বোধ হয় দুর্বোধ্য; ফাইলেরিয়ার জ্বরকে বাতশিরার জ্বর বলত। এই বয়সে তাঁর আহারও ছিল প্রচুর। দিনে খেতেন ভাতের সঙ্গে ঘি তরকারি মাছ এবং ঘরের দু' সের দুধ জ্বাল দিয়ে এক সেরে পরিণত ক'রে চিঁড়া কলা ও চিনি দিয়ে মেখে তাই; এবং রাত্রে হালুয়া ও আধসের

ক্ষীরের মত দুধ। এই মানুষ চুরাশী বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে যাবার সময় গ্রামের প্রতি জনের কাছে বিদায় নিয়ে, তখন একজন তাঁর দিদি সম্পর্কীয়া জীবিতা ছিলেন—তাঁকে প্রণাম ক'রে, গ্রামের প্রতি দেবালয়ে প্রাণিপাত ক'রে একটি প্রার্থনাই জানালেন যে, যে-কামনা নিয়ে তীর্থে চলেছি সে-কামনা যেন পূর্ণ হয় আমার। তীর্থস্থলে যেন আমার দেহান্ত ঘটে, আমি যেন মুক্তি পাই।

২২শে কার্তিক তিনি তীর্থযাত্রা করলেন। গয়াতীর্থ সেরে কাশীতে এসে পৌছলেন—২৭শে কার্তিক। ৫ই অগ্রহায়ণ তাঁর জ্বর হ'ল, ৬ই তারিখে সে-জ্বর ছেড়ে গেল- দেহের উত্তাপ ৯৫॥০ ডিগ্রীতে নামল। ৭ই অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পর্যন্ত খর্ব হয় নি। তার প্রমাণ– তিনি লাভপুর থেকে রওনা হওয়ার পর তাঁর একমাত্র দৌহিত্র অকস্মাৎ মারা গেল লাভপুরে। সে সংবাদ লাভপুরের পত্রে গোপন রাখতে হয়েছিল। লেখেনই নি তাঁরা। ৬ই তারিখে এই পত্র কাশীতে এল। দীর্ঘ পত্র, নায়েব লিখেছেন, পুত্র পিতাকে সে-পত্র প'ড়ে শোনালেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ৯৫॥০ ডিগ্রী দেহোত্তাপ নিয়ে বৃদ্ধ অর্ধশায়িত অবস্থায় পত্র শুনছিলেন, পত্র শেষ হতেই ঘাড় নেড়ে বললেন—পত্র তো ভাল বোধ হচ্ছে না বাবা।

পুত্র বললেন—কেন বাবা? সবই তো ভাল লিখেছেন নায়েব।

ক্রমশ-স্তিমিতদেহোত্তাপ বৃদ্ধ বললেন—দেখ বাবা হরিদাস, পত্রে গ্রামের লোকের সংবাদ আছে, এমন কি তোমার গরু-বাছুরের সংবাদ পর্যন্ত দিয়েছে, মামলা-মকদ্দমা বিষয়ের কথা আছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর একমাত্র সন্তান ভোলার সংবাদ তো নেই!

আমার বাবা বললেন—তোমার ভাবনা একটু বেশী বাবা। ভোলার বাপের মায়ের সংবাদ দিয়েছে, তাদের বাড়ীর খবর দিয়েছে, তার কথা আর স্বতন্ত্র ক'রে কি লিখবে?

ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধ বললেন—সকলের সংবাদ পৃথকভাবে না লিখলে

ভাবতাম না। বাবা। বালক হ'লেও ভোলা তো বাড়ীর গরু বাছুর থেকে ছোট নয়।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তখনও এতখানি। পরদিন ৭ই তারিখ রাত্রি নয়টায় একবার প্রলাপ বকলেন ব'সে থাকতেই। প্রলাপই বলব। অন্য কথা বলছিলেন, তার মধ্যেই ডেকে উঠলেন লাভপুরের নায়েবকে।—কই হে ফুল্লরাবাবু, তুমি কেমন লোক হে? কই, আমার আহ্নিকের জায়গা কই করেছ?

ছেলে শঙ্কিত হয়ে গায়ে হাত দিয়ে বললেন—বাবা, কি বলছ? সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। দেহের উত্তাপ আরও কমেছে।

বাপ আত্মস্থ হয়ে বললেন—কি বলছ?

—রাত্রিকালে আহ্নিকের জায়গা করতে বলছ কি?

—বলেছি? ও! একটু চোখ বন্ধ ক'রে থেকে বললেন—জ্বর আসছে—শিবজ্বর।

জ্বর এল। নিজেই বললেন—আমাকে এবার তীরস্থ কর। আমার উপবীত আমার আঙুলে জড়িয়ে দাও।

কুলদাপ্রসাদবাবুও ছিলেন বিচিত্র মানুষ।

যেমন ভোগী তেমনি রসিক সুগায়ক, তেমনি সুপুরুষ ও সুন্দরভাষী। কুলদাবাবু ছিলেন বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসক। লোকে তাকে ব্যঙ্গ করত। সাধারণভাবে তিনি গ্রামের লোকের পিয়পাত্র ছিলেন না; তাঁর সমস্ত গুণ প্রকাশের আতিশয্যে এবং বিষয়বোধের চারিত্রিক জটিলতার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কীর্তন শুনতে ব'সে তিনি কাঁদতেন; মধ্যে মধ্যে 'ওহো ওহো' বলে ভাবাতিশয্য প্রকাশ করতেন; বহু লোকের কাছে তা হাস্যকর মনে হ'ত। এর মধ্যে আতিশয্য ছিল, কিন্তু কপটতা ছিল না। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যেতেন, সেখানে বলতেন—দেখ, দইয়ের মাথাটা আন দেখি। আর তেলুক দেখে মাছ। তাঁর ভোগবিলাসে কুণ্ঠা ছিল না। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত দেখেছি ভোগের প্রতি অনুরাগ। পরিপাটী কোঁচানো কাপড়, শক্তকফ শার্ট, চকচকে জুতো, ঝক্‌ঝকে মাজা একটি গাড়ু, তার উপর

ভাঁজকরা পরিষ্কার গামছা, চকচকে গড়গড়া, চমৎকার সটকার নল, একখানি সুন্দর কম্বল, একটি ঝালর-দেওয়া পাখা, একটি বাক্স—এই আয়োজন থেকে কুলদাবাবুকে পৃথক করা যায় না। তাঁকে মনে পড়লেই এগুলি মনে পড়বে। লোকে অন্য অপবাদও দিত। তা হয়তো সত্যিই। কিন্তু সে-কালে এই দোষ থেকে মুক্ত মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। আমার বাবার ডায়রীতে পাই, তিনি আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন—"লাভপুরে আসিয়া—লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্পবয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল।" আমার মায়ের পদার্পণের পর তিনি এ গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মদ্যপান ছিল, কিন্তু সে ছিল তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংযত পরিমাণে পান। থাক।

কুলদাবাবুর বিষয়াসক্তিও ছিল প্রবল এবং জটিল। মামলা-মকদ্দমা অনেক করেছেন, করতে বাধ্যও হয়েছেন। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে আমি এক চিরকালের সম্ভ্রমের মানুষকে দেখেছি। এমন মিষ্ট ভাষা আর এমন সহ্যগুণ সংসারে বিরল। একবারের ঘটনা চোখের উপর ভাসছে। বৃদ্ধ ব'সে আছেন দুর্গাপূজা-মণ্ডপে। কম্বল বাক্স গড়গড়া গামছা পাখা নিয়ে আসর জমিয়ে নবমী-পূজার ব্যবস্থা করছেন। বহু সরিকের পূজা, অনেক কালের পূজা; সরকার-বাড়ীর পূজায় দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে কয়েকজন বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জেও সরিক। নবমী-পূজার দিন সরকার-বাড়ীর পূজাস্থানে বলি হয় অনেক, প্রায় ষাটটি। এই বলির পর্যায় বাঁধা আছে। এ পর্যায় বংশের সম্মান হিসাবেই নির্দিষ্ট। সে-বার এক প্রবীণ দৌহিত্র সরিকের তিরোধান হয়েছে। এই দৌহিত্রের বলি ছিল প্রথম বলি; দৌহিত্র নিঃসন্তান, তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছেন তাঁর ভাগিনেয়। ভদ্রলোক শিক্ষিত, গ্রাজুয়েট, কৃতী ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিবান, আধুনিক। কুলদাবাবু ব্যবস্থা করলেন—এবার প্রথম দেওয়া হবে প্রবীণতম সরিকের বলি। কথাটা গোপন ছিল না। প্রথমেই এ নিয়ে বাদানুবাদ ক'রে মীমাংসায় উপনীত হ'লে ঘটনাটি ঘটতে পেত না। কিন্তু দৌহিত্রের

উত্তরাধিকারী এ নিয়ে কোনো কথা বললেন না। তার অজুহাত, তাঁকে তো জানানো হয় নি। তবে তিনি ব্যবস্থা সবই করলেন। ঠিক বলির সময় তাঁর ভাগিনেয় ঝাপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুললে। কুলদাবাবুর ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দিয়ে নিজেদের বলিই হাড়িকাঠে ফেললে। সেই বলিই প্রথম বলি হ'ল। গণ্ডগোলটা বলির সময় স্থগিত থাকল চাপা আগুনের মত। বলি শেষ হওয়ার পর জ্ব'লে উঠল।

দৌহিত্রের উত্তরাধিকারী আত্মস্থ ছিলেন না। ইচ্ছাপূর্বকই ছিলেন না। চক্ষুলজ্জাকে অতিক্রম করার জন্যই ছিলেন না। তিনি এসে আক্রমণ করলেন বৃদ্ধকে, মৌখিক আক্রমণ। মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি তখন যেন উন্মত্ত। বাক্যপ্রয়োগে শ্লীলতা তো অতিক্রম প্রথম থেকেই করেছিলেন, কয়েক ক্ষেত্রে শ্লীলতাও অতিক্রান্ত হ'ল। জনতা থমথম করছে। স্তব্ধ। বৃদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে নির্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন আর তামাক টানছেন। তার চারিপাশে তার তিন পুত্র, চার ভ্রাতুষ্পুত্র—সাতজন। এদের মধ্যে বড় ছেলে কৃতী, কয়লা-ব্যবসায়ী, দেহেও শক্তিশালী। ভ্রাতুষ্পুত্রদের একজন বড় পুলিশ কর্মচারী, শূরবীর চেহারা। অন্য তিন ভ্রাতুষ্পুত্র শুধ শক্তিশালীই নয়, রোষ-ববরতার অখ্যাতিতে কুখ্যাত। আর প্রতিপক্ষেরা স্বজন-শক্তিতে মাত্র দু'জন। হয়তো কুলদাবাবু বহু স্বজনের রোষভাজন ছিলেন, কিন্তু সে-দিন বিবাদ যা দাঁড়িয়েছিল তাতে সমগ্র সরকার-বংশের এক হওয়ারই কথা। শুধু মাত্র কোনো একজনের প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদ শুরুর অপেক্ষা। ওই মানুষটি মুখে প্রতিবাদ শুরু করলেই তা হবে। তার মুখ খোলার অপেক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য! দৌহিত্র-বংশের উত্তরাধিকারী প্রতিবাদ না পেয়ে অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, গালাগালি অভিসম্পাত ক'রেই চলেছেন, তবু এ মানুষটি নির্বাক, স্থিরদৃষ্টি, স্থির হয়ে ব'সে আছেন। শেষে তাঁর বড় ছেলের আর সহ্য হ'ল না। তিনি বাপের পাশেই ব'সে ছিলেন, অধীর হয়ে ব'লে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে।

বারেকের জন্য বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন। আমি বলব—জ্যোতিষ্মানের মত জ্ব'লে উঠে তিনি যেন গৃহদাহী বহ্নিকে নির্বাপিত ক'রে দিলেন। কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মাথায় তিনি সর্বসমক্ষে চড় মেরে বসিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠলেন—খবরদার! চারিদিকে আসন্ন বিস্ফোরণ মুহূর্তে স্তব্ধ ক্ষান্ত হয়ে গেল। এমন কি দৌহিত্রের উত্তরাধিকারীও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আজও আমার চোখের উপর ভাসছে, আমি দেখছি সেই মুহূর্তের ছবি, মানুষের মুখে-চোখে পশু তার হিংস্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে—সে হিংস্র চীৎকার করতে উদ্যত হয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। আমার মনে হ'ল, একটা প্রহেলিকা খেলে যাচ্ছে। তার অর্থ কি উপলব্ধি করতে পারছি না। স্তব্ধ নাটমণ্ডপে তিনি ব'লে গেলেন তার বাক্যগুলি, আমার মনের আকাশে-বাতাসে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই প্রতিধ্বনির ধ্বনিই আমি আজ লিখে চলেছি। তিনি ব'লে গেলেন—পরে মূর্খ বর্বর, তুই কাকে কি বলছিস? কার উপর হাত তুলতে চলেছিস? জানিস ও কে?

অবাক হয়ে জনতা শুনে গেল।

—জানিস ও কে? ও হ'ল—এর ভাগ্নে।—এর দৌহিত্র। (মায়ের নাম ক'রে)—এর বেটা। ওরে মূর্খ, ও যখন শিশু ছিল তখন ওকে বুকে নিলে ও যদি আমার বুকে বিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে দিত, তবে কি আমি তাকে ফেলে দিতাম সেদিন? ও আজ বড় হয়েছে দেখছিস কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়েছি হতভাগা; তোদের চোখ নেই, তোরা অন্ধ। তাই তোরা দেখতে পাস না, ও আমার কাছে তাই আছে। বলুক, ওর যা খুশি ও বলুক। আমার ওপর রাগ করবে না তো করবে কার ওপর?

চারিদিকে দেখলাম মানুষের চেহারা পাল্টে গেছে, পশু কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানুষের মুখে প্রসন্নতা, চোখে জল।

একবার নয়, বার বার দেখেছি এমন সহ্যগুণ।

এক ধনীর বাড়িতে মাতৃবিয়োগের পরই তিনি তত্ত্ব করতে এসেছেন।

ধনী আধুনিক—বহুকীর্তিমানের উত্তরাধিকারী। আশ্চর্যের কথা, তবুও তিনি আত্মীয়তাকামী এই বৃদ্ধ আগন্তুককে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য আক্রমণ শুরু করলেন। নাতি-ঠাকুরদার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে রহস্যের মধ্য দিয়ে কুটিল আক্রমণ। চরিত্র, লোভ, হীনতা, দৈন্য ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ। বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসি হাসতে শুরু করলেন। অমৃতং বালভাষিতং। সত্য বলতে, আমি মনে করি, বৃদ্ধের সে বোধ মিথ্যা বা কপট ছিল না।

তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে স্বজনপরিবৃত হয়ে দেহ রেখেছিলেন।

কুলদাবাবুর এক পূর্বপুরুষের কথা না ব'লে পারছি না।

তিনি গ্রামেরই কুটুম্বের কাছে ঋণ করেছিলেন। দলিল-দস্তাবেজ ছিল কি ছিল না, সে-কথা বাহুল্য। মৃত্যুকালে তিনি কুটুম্বকে ডেকে বললেন—ঋণদায় নিয়ে মরণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, শান্তি পাচ্ছি না আমি। আমার নগদ টাকা এখন নাই। আপনি এই ভূমি-সম্পত্তি নিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই। কুটুম্ব বললেন—তাই হ'ল।

সানন্দে মৃত্যুপথযাত্রী বললেন—দলিল, একটা দলিল কর।

কুটুম্ব বললেন—গ্রহীতার নাম এই—। আমার নামের পরিবর্তে ওই নামে হবে।

সে নাম কুটুম্বের ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়-বধূর নাম। মৃত্যুপথযাত্রীর জামাতা অথবা কন্যা।

মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়াল। মুখে তিনি নামগান শুরু করলেন। মুছে ফেললেন সকল পার্থিব ভাবনা।

ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স সাত-আট বৎসর, সেই সময় প্রথম দেখেছিলান—আমাদের গ্রামের বিষ্ণু মুখুজ্জে মহাশয়কে ঠিক এমনি কামনা নিয়ে কাশী যেতে। খোল করতাল বাজিয়ে গ্রামের—গ্রামের কেন—আশপাশের গ্রামের লোকদের প্রণাম নিয়ে, গ্রামের দেবতাদের প্রণাম ক'রে—কাশী গিয়েছিলেন দেহত্যাগ করতে।

আমাদের গ্রামের হিরণ্যভূষণবাবুর মা গিয়েছিলেন গঙ্গাতীর।

আমাদের আশেপাশের গ্রামের অনেকে এমন যাওয়া গিয়েছেন শুনেছি।

এই সব কথা আজ যখন মনে ভাবি, তখন মনে হয়, সে-কালের সবই আবর্জনা ছিল না। আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে খানিকটা কিছু ছিল।

আর-একটা জিনিস ছিল।

সে-কালের এই ধর্মাশ্রয়ী মানুষদের ভাষা ছিল বড় মধুর, বড় মিষ্ট। তেমনি ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা। আজকের দিনের ভাষা সে-দিনের ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত—দীপ্তিতে তীক্ষ্ণতায় ব্যঞ্জনা-মহিমায় প্রকাশ-শক্তিতে অপরূপ, মনের মধ্যে দাগ কেটে ব'সে যায়, ক্ষেত্র-বিশেষে বীণার সপ্ততারে ঝঙ্কার তোলে; কিন্তু মিষ্টতায় সে-দিনের ভাষা ছিল বড় মধুর।

এই দুটি বস্তু আজ মনে হয় আমরা হারিয়েছি। অন্যথায় সে-কালের অবস্থার ঐতিহাসিক দোহাই পেড়েও আর কোনো মানসিক অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারি না। মিথ্যার জঞ্জাল সেদিন আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। এই জঞ্জাল অপসারণের ঢেউ তখন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় উঠেছে, কিন্তু আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌছায় নি। বন্যার প্রথমেই যেমন ঢেউয়ের আগে ভেসে আসে রাশীকৃত ফেনা আর নদীর উৎসমূলের খড়-কুটা আবর্জনা, তেমনি নবজীবনের শক্তির সঞ্চারের আগে এসে লাগল ফ্যাশন। গোড়াতেই বলেছি, ভৃঙ্গারে ভ'রে মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা আসে নি, এসেছিল কেস-বন্দী স্কটল্যাণ্ডের তৈরী স্কচ হুইস্কি। সে-কালের হুইস্কির বোতল আমাদের বাড়ীতেও আমি দেখেছি। আমার বাবা ছিলেন তন্ত্রোপাসক, বাড়ীতে কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যার পূজা ছিল। তারাপূজায় কারণের ঘট স্থাপন করতে হয়। কারণের ভোগ হয়। মা-তারাকে উপাদেয়তর দুর্লভ সামগ্রী হিসাবে স্কচ হুইস্কির ভোগও দেওয়া হয়েছিল বোধ হয়। বোতলের গায়ের নাম দেখেছি—H.M.S.; ওটাই নাকি চলতি বেশী ছিল সে-কালে। এ বিষয়ে আমার একটা কথা মনে হয়—হুইস্কির নামটা সার্থক ছিল।

ইংলণ্ডের রাজার রাজকীয় কর্মসাধনের জন্যই ওটা ঢুকেছিল। শিক্ষার আগে এল ফ্যাশন। জুতোয় জামায়, ম্যান্‌চেস্টারের রেলি-ব্রাদার্সের ধুতিতে শাড়িতে, নূতন কালের চুল ছাঁটায়, কথায়-বার্তায় ঢঙে-ধারায় ধরনে সে এক ফ্যান্সি ফেয়ার এসে ব'সে গেল দেশের মধ্যে।

পূর্বেই বলেছি, আমার চুল মানত্‌ ছিল বাবা বৈদ্যনাথের কাছে। সেই চুল মানত্‌ দিতে গেলাম আমি বিচিত্র পোশাকে, সার্জের সুট প'রে মাথায় বেড়া বিনুনি বেঁধে, তার উপর একটা নাইট ক্যাপের মত টুপি এঁটে। সেদিনের কথা আজ মনে পড়ছে। চুল বেঁধে সুট প'রে টুপি মাথায় দিয়ে বেশ গৌরব অনুভব করেছিলাম; একটি শিশুর আধুনিকত্বের গৌরবে যতখানি স্ফীত হওয়া সম্ভবপর তা সেদিন হয়েছিলাম আমি।

আমার চুল হয়তো আরও কিছুদিন থাকত। হয়তো বৈদ্যনাথের মত পৈতের সময় পর্যন্ত চুল আমাকে বাঁধতে হ'ত, কিন্তু পর পর মর্মান্তিক ঘটনা ঘ'টে গেল। এই উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বে বাবা আমার মুহ্যমান হয়ে প'ড়ে বৈদ্যনাথের কাছে মর্মবেদনা নিবেদন করতে ছুটে গেলেন। একটা ঘটনা ঘটল, যা আজ বিচিত্র মনে হবে।

গ্রামের নব-অভ্যুদিত ধনী হাই ইংলিশ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইস্কুলের সভাপতি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজিং কমিটিতে গ্রামের প্রধানদের নেওয়া হয়েছিল। আমার বাবাও ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। স্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ। তাঁর ওই স্পষ্টভাষিতার অপরাধে একদা তিনি অকস্মাৎ অপসারিত হলেন। করলেন—হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষও রাখলেন না ব্যাপারটা। এক কথায় বাড়ীর মালিকের মত জবাব দিয়ে দিলেন। সেক্রেটারি ছিলেন ইস্কুল প্রতিষ্ঠাতা নিজে; ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজলভ্য ছিল। তাঁদের অনুগামী সভ্যের সংখ্যাই বেশী, তবুও অধীরতার তাড়নায় তাঁরা অপেক্ষা করলেন না। এরই প্রতিবাদে বাবা এবং আরও দুইজন কমিটিতে যাওয়া বন্ধ করলেন।

হয়তো কেন—নিশ্চয়ই এটা তাঁদের দিক থেকে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের একটা রূপান্তরিত প্রকাশ। অন্য দিকে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দিক থেকে বিচার ক'রে অন্যায় দেখতেও পেলেন না, স্বীকারও করলেন না। এবং তিনি গ্রাহ্য করলেন না—এঁদের অসহযোগিতা। এর পর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, তাঁর নাম ছিল—এস. সি. মুখার্জী, আই-সি-এস। সে সভাতেও এঁরা গেলেন না—প্রতিবাদ জানাবার জন্যই গেলেন না। অনুপস্থিতির অভিযোগ সাহেবের কানে উঠল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়, এবং তিনি সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গ্রামের এই তিন প্রধান—এই সভায় অনুপস্থিত হয়ে কেবলমাত্র ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতাকেই অপমানিত করেন নি, রাজপ্রতিনিধিরও অসম্মান করেছেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, এস্-পি এলে স্থানীয় জমিদারের ডাক-বাংলোয় সেলাম দিতে যেতে হ'ত। সে-কালের আই-সি-এস ম্যাজিস্ট্রেটের কথাটা মনে নিলেন। তিনি সদরে ফিরে গিয়ে—দারোগা মারফৎ হুকুমনামা পাঠালেন। এই তিনজন জমিদারকে এই অপরাধের জন্যে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে—স্থানীয় সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সম্মুখে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। 'দিল্লীশ্বরো-বা জগদীশ্বরো-বা' কথাটায় যদি কারও সন্দেহ ছিল মুসলমান আমলে, ইংরেজ আমলে 'ইংলণ্ডেশ্বরো-বা জগদীশ্বরো-বা' ঐ কথাটায় কারও তখন সন্দেহ ছিল না। বুয়োর যুদ্ধ এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, এঁরা প্রত্যেকেই সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন, তবুও ইংরাজের সম্পর্কে মনোভাব টলে নি। কাজেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির এ আদেশ অমান্য করতে তাঁদের সাহস হ'ল না। তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু মনে হ'ল এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা। এই নব-অভ্যুদিত ধনী কিনলেন মুসলমান-নবাববংশীয় জমিদারের কাছে একটি জমিদারি। ব্যাপারটা

একটু জটিল। সংক্ষেপে বলি। আমাদের গ্রামের জমিদারির অংশীদার সকলেই, কিন্তু দক্ষিণপাড়া—যে-পাড়ায় আমাদের বাস—সে-পাড়াটি ছিল মুরশিদাবাদের এক মুসলমান জমিদারের। উচ্চ মূল্য দিয়ে এই দক্ষিণপাড়ার জমিদারি কিনলেন। এবং নিজে অর্থ ব্যয় ক'রে আনলেন গভর্নমেণ্ট সেটেলমেণ্ট। প্রমাণ করতে চাইলেন—গ্রামের প্রধানদের বাড়ীগুলি, যা তাঁরা এতকাল মুসলমান জমিদারের আমলে ব্রহ্মত্র বা লাখরাজ হিসাবে ভোগ ক'রে প্রজা হয়েও প্রজা-না-হওয়ার সুবিধা পেয়ে আসছেন—সে সুবিধা তাঁরা পেতে পারেন না, ব্রহ্মত্র-লাখরাজ মিথ্যা। তাঁর এই অনুমান পুরাপুরি সত্য না হ'লেও অনেকটাই সত্য ছিল। আমাদের দেশের সেটেলমেণ্টে এক রকম নূতন লাখরাজের সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম—ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর লাখরাজ। সূত্রটা যেখানে খাজনা না দিয়ে ভোগদখলের, সেখানে দখলটা জবরদখল। প্রাচীন মুসলমান জমিদার বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের এই জবরদখল সহ্য করেছিলেন। এরা বর্ধিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ, এই ছিল সহনশীলতার কারণ। কিন্তু নূতন জমিদার সেটা সহ্য করতে চাইলেন না। লাখরাজ যেখানে সত্য নয়, সেখানে কর দিয়ে তাঁকে জমিদার স্বীকার ক'রে তাঁদের প্রজা হতে হবে। যে সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সামনে তাঁদের ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, সেই সেটেলমেণ্ট ডেপুটি এই উপলক্ষ্যেই তখন লাভপুরে ছিলেন। একদা দেখা গেল—সেটেলমেণ্টের চেন থাক্ নকশার দাগে দাগে যেতে গিয়ে আমাদের কয়েক বাড়ীর অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। তার পিছনে পিছনে আমিন কানুনগো, সেটেলমেণ্টের টেবিল ঘাড়ে নিয়ে কুলী, থাক্ নকশা বগলে জমিদারের কর্মচারী এবং আরও অনেকে। অন্দরের উঠান ছিল বাঁধানো, সেখানে পায়ের ছাপ বা জুতোর দাগ পড়ার কথা নয়, কিন্তু মালিকদের অন্তস্তল দলিত হয়ে গেল।

আরও একটি ঘটনা ঘটল। এর সঙ্গে গ্রামের কোনো লোকের সংস্রব ছিল না। আমাদের একটি বড় মামলায় পরাজয় হ'ল। একটি ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম।

এই তিনটি ঘটনার আঘাতে আমার বাবা মুহ্যমান হয়ে আশ্রয় সন্ধানে ছুটে গেলেন বৈদ্যনাথধামে। দেবতার পায়ে গড়িয়ে পড়বেন। বলবেন—তুমি তোমার শক্তি প্রয়োগে এর প্রতিকার কর। মানত্ করবেন। শুধু তাই নয়, আমার পিসীমা ধর্না দেবেন সেখানে। সপরিবারে বৈদ্যনাথ গেলাম। বৈদ্যনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণ, মন্দিরের ধ্বজা আজও আমার চোখের উপর ভাসছে। এর পর আরও কয়েকবার দেওঘর গিয়েছি, এই গতবার ১৩৫৫ সালেও গিয়েছি—কিন্তু সে ছবির সঙ্গে মেলে না। সে মন্দির এত উঁচু, এত শুভ্র যে, মনে হয় আকাশের গায়ে সাদা মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

আমার মাথার চুলের লজ্জা বৈদ্যনাথের পাথর-বাঁধানো অঙ্গনে উজাড় 'ক'রে দিয়ে সেই দিন সেইখানে নিলাম হাতেখড়ি। মনে হচ্ছে বাংলা এবং দেবনাগরী দুই অক্ষরেই খড়ি বুলিয়েছিলাম। যে পাথরখানির উপর খড়ি বুলিয়েছিলাম, সেই পাথরখানিকে বের করবার জন্য (এবারে ১৩৫৫ সালে) কত যে মনে মনে সন্ধান করেছি! যে-দিন গিয়েছি মন্দিরে, সেই দিনই বৈদ্যনাথের 'ব' দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু খুঁজেছি খুঁজেছি খুঁজেছি। স্ত্রী কন্যা পুত্র জিজ্ঞাসা করেছেন, কি? এমন ক'রে কি দেখছেন?

উত্তর দিই নি। হেসেছি। সম্ভবত লজ্জা অনুভব করেছি।

সে-কথা থাক।

বাবা কেঁদেছিলেন দেওঘরে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাত্রে শোবার সময় বিছানায় ব'সে বেশ স্ফুটকণ্ঠেই প্রার্থনা করেছিলেন মনে আছে—রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে? হে দেবাদিদেব! হে আশুতোষ!

আমার চোখেও জল এসেছিল। তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এইভাবে সৃষ্টি হ'ল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিক-ভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।

অপর প্রভাব এই দেবভক্তিই বলি, আধ্যাত্মিকতাই বলি, নীতিবাদই বলি তার প্রভাব। একটি গভীর অজ্ঞাত অনুশাসন আমি অনুভব করি; মানব-হৃদয়ের এই অনুশাসনের একটি বেদনাময় আকুতি আমার আছে। এ দুর্বলতা হ'লে আমি দুর্বল। পরাজয় হ'লে আমি পরাজিত।

সে-কালকে যতই চেষ্টা করছি প্রকাশ করতে, ততই যেন মনে হচ্ছে ঠিক প্রকাশ করা হ'ল না। প্রথমেই বলেছি, ছোট ছোট জমিদার-প্রধান একটি অঞ্চল, সে অঞ্চলে অকস্মাৎ অভ্যুদয় হ'ল এক লক্ষপতি ব্যবসায়ীর, তাঁর সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে সংঘর্ষ বাধল আমাদের অঞ্চলে। জমিদার-শ্রেণী যতই বিব্রত বিপন্ন হলেন, ততই তাঁরা ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। ভগবানের তখন বহু মূর্তি। দেবতা তেত্রিশ কোটি, সুতরাং রূপ তাঁর তেত্রিশ কোটিই। ওর মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে—মূর্তি ছিল আসলে দুটি। শক্তিমূর্তি আর বিষ্ণুমূর্তি। মোটামুটিই ধরা যাক আর অতিসূক্ষ্মভাবেই বিচার করা যাক—ধর্মজীবনে ছিল দুটি পথ বা মত—শাক্ত ও বৈষ্ণব। যুগল বিগ্রহ অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ, বাসুদেব, গোপাল, নাড়ু-গোপাল, শালগ্রামশিলা, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ—এই ছিলেন বৈষ্ণবদের দেবতা। তা ছাড়া দুর্গা থেকে শুরু ক'রে মনসা ওলাইচণ্ডী পর্যন্ত সবাই ছিলেন শাক্ত-তনখাভোগী; শিব ঠাকুর থেকে শুরু ক'রে পুরুষ দেবতারাও ওই শাক্ত মতের পথের পাশে বাসা গেড়েছিলেন। গাজনে শিব ঠাকুর উঠতেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজ, ভাদ্রে ইন্দ্রদেবতা বিশ্বকর্মা—এদের সকলের পূজোতেই পাঁঠা-বলির ব্যবস্থা ছিল। ছিল কেন, আজও আছে। সুতরাং ওঁরা শাক্তের দলে। তবে মা লক্ষ্মী এবং মা সরস্বতী এঁরা দু'জন সবারই পূজ্য এবং এঁরা বৈষ্ণবের দলে, ওঁদের কথা উঠলেই আজও মনে হয়—নারায়ণ ব'সে আছেন মাঝখানে, দু'পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা—লক্ষ্মী আর সরস্বতী। অদৃষ্ট পরিবর্তনের কামনায় মানতের পরিমাণ বাড়তে শুরু করল এক

দিকে, অন্য দিকে যাঁর অভ্যুত্থান হচ্ছে তিনি বাড়াতে লাগলেন সমারোহ।

দেশেও তখন প্রাচুর্য ছিল।

ক্ষেত্র ছিল উর্বর, বর্ষাও তখন এখন থেকে প্রবল ছিল, মাঠে পুকুর-গুলিও তখন এখানকার মত এমনভাবে মাঠের সমান হয়ে ম'জে যায় নি, ফসল যথেষ্ট হ'ত। ধান কলাই গম আখ সরষে আলু—এ প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের ক্ষেতে জন্মাত। গোয়ালে ভাল ভাল গাই ছিল, দুধও হ'ত প্রচুর, পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত, অভাব দেশে ছিল না; অল্প চার-পাঁচ হাজার টাকা আয়ে রাজার হালে চ'লে যেত। আমার নিজের যখন বারো-চোদ্দো বছর বয়স তখনকার হাট-খরচা আমার মনে আছে—সপ্তাহে দু'দিন হাটে তরকারির খরচা ছিল—ছ আনা হিসেবে বারো আনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর খরচাটা বাড়ল—বারো আনা থেকে আঠারো আনা পাঁচ সিকিতে পৌছল। আমাদের বাড়ীর মুদীর দোকানের খরচ ছিল বছরে একশো টাকা। কোনো বছর দশ টাকা কম—কোনো বার পাঁচ টাকা। বছরে দু'বার কাপড় কেনার ব্যবস্থা ছিল—আশ্বিনের পূজোর সময় এবং বছরের শেষই বলুন পরের বছরের প্রারম্ভের আয়োজনেই বলুন, চৈত্র মাসে আর এক দফা কাপড় আসত। পূজোর সময়—শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গার পোশাকী কাপড় থেকে শুরু ক'রে, গুরু পুরোহিত পূজক দেবপূজার কাপড়, বাড়ীর মুদী মোদক জেলে মুড়িভাজুনী মেথর চাকর-বাকর—এসব নিয়ে পাহাড়প্রমাণ কাপড় (তাই বলত লোকে) কেনা হ'ত দোকান থেকে, ফর্দ আসত সত্তর পঁচাত্তর আশি। পাঁচশো টাকা ঋণ হ'লে গৃহস্থ ভাবত, ঋণে সে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। চাকরের মাইনে ছিল দেড় টাকা, কাপড় কোঁচানো থেকে সকল রকম তরিবত জানা খানসামার মাইনে আড়াই টাকা, মেয়ে-রাঁধুনী থাকত দু' টাকা আড়াই টাকায়, পুরুষ-রাঁধুনীর বেতন সাড়ে তিন টাকার বেশী ছিল না। পশ্চিমা দারোয়ানেরা শুখো সাত টাকা মাইনে পেলে বলত —দরকার হ'লে জান ডাল্ দেগা। বাউরী

প্রভৃতি জাতীয় যারা গো-সেবা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকত, তাদের ছোটরা থাকত পেট-ভাতায়, আর বড়দের মাইনে ছিল বছরে ছ' টাকা থেকে নয় টাকা পর্যন্ত।

কাজেই সংসার চালিয়েও মানত্ দিতে খুব বেগ পেতে হ'ত না। দোষ তাঁদের নেই। আবহাওয়াই ছিল তখন এই। ভাগ্য আর অদৃষ্ট ছাড়া পথ ছিল না। দেবতারা ছিলেন ভাগ্যের কাণ্ডারী। সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে। খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন। প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন—চে—ৎ চণ্ডী! কালী কপালী নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট মা, বন্ধন কাট। মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবরণীর উপর শিক্‌রে পাখী (বাজ পাখীরই একটি ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশী হাতে তৈরী সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপাল-হারা মা যশোদার বেদনার গান। কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন—

এই দেহে কিবা ফল— পদ্মপত্রে জল—
এ দেহের মিছে গৌরব করিস মন!

কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন। অঞ্চলে যত পীর আছেন, হিন্দুর জাগ্রত দেবতা আছেন, সবাই ছিলেন পীর, সকলের মহিমাই কীর্তন করতেন তাঁরা। সে কি হিন্দুর দোরে, কি মুসলমানের দোরে, তাঁরা ওই গানই গেয়ে যেতেন—সকলেই ভক্তিপুলকিত চিত্তে শুনত।

পীর বড় ধনী রে ভাই—ঠাকুর বড় ধনী—
পীর গাজী—মুশকিল আসান কর, পীর গাজী—!
তোমার গোপাল দুগ্ধ খাবেন জন্ম যাবে সুখে—
দুঃখ তোমার দূরে যাবে—অন্ন দিয়ো ভুখে
পীরের ঘোড়া পীরের জোড়া পীরকে কর দান,
বাত ব্যাধি হইতে মাগো পাইবে পরিত্রাণ।

মস্ত বড় গান। আজও মনে আছে আমার। আরও মধ্যে মধ্যে

আসত 'গরুমারা'। অর্থাৎ গো-বধ ক'রে প্রায়শ্চিত্তকারী ভিক্ষুক। আমার মনের মধ্যে আজও ছাপ কেটে রয়েছে প্রথম 'গরুমারা'র ছবি। গরমের সময় স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ার উপর তেঁতুল থেকে বীচি ছাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। মা পিসীমা ঝি রাঁধুনী এদের সঙ্গে আমিও ব'সে গেছি; আমার সঙ্গে আছে আমার শৈশব-সঙ্গিনী চারু, ডাকনাম নেড়ী; সকলেই এক-একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে তেঁতুলবীচি বের করছি। হঠাৎ সদর-দোরে ডাক উঠল, হাম্ বা—অ্যা-ম-ব্যা—অ্যা-ম-ব্যা—সমস্ত শরীর কেমন যেন ক'রে উঠল। দরজায় উঁকি মেরে দেখলাম, ধূলিধূসর কৌপীন পরনে একটি জোয়ান মানুষ হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে এমনি চীৎকার করছে, অ্যা-ম-ব্যা! অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলে যে উদ্বেগ তার বুকখানাকে তোলপাড় ক'রে তোলে—সেই অসহনীয় উদ্বেগ আমার শিশুচিত্তকে অধীর অস্থির করে তুলেছিল। আমি সমস্ত দিন কেঁদেছিলাম। মায়ের কাছে শুনেছিলাম এইভাবে বারো বৎসর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সপ্তাহে দু'তিন দিন আসত পটুয়ারা। দ্বিজপদ পটুয়াকে আজও মনে আছে। সুন্দর চেহারা ছিল তার। তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রাসলীলা-গৌরাঙ্গলীলার পর পর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত আর গান গেয়ে যেত—

আহা, কী মধুর লীলা রে!

পটের শেষের দিকটায় থাকত ধর্মরাজ অর্থাৎ যমরাজার দরবার। বৈতরণী নদী পার হয়ে যেতে হয় দরবারে, যেতেই হবে, না গিয়ে পরিত্রাণ নাই। যমদূতে নিয়ে যাবে। পাপীর কাছে বৈতরণী টগবগ ক'রে ফুটছে। তাকে ঐ নদীর ফুটন্ত জলে ভাসতে ভাসতে যেতে হবে। ওপারে দরবারে ব'সে আছেন ধর্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ব'সে আছেন এই দেখুন হিসেবনিকেশের খাতা নিয়ে।

নীলবর্ণ যমরাজ। রাজবেশ। পালোয়ানের মত গোঁফ, বড় বড় সাদা চোখ। চিত্রগুপ্তের কানে কলম, হাতে খাতা—খতিয়ানের লম্বা

খেরুয়া-বাঁধানো খাতার মত খাতা। তারপর বিভিন্ন পাপে বিভিন্ন নরকে ভূতের মত চেহারা যমদূতের হাতে পাপীদের শাস্তির দৃশ্য— কোথাও অসংখ্য সাপ-বিছে-কাঁকড়াবিছে-পরিপূর্ণ নরকে পাপীকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ফুটন্ত কড়াইয়ে তাদের ভাজা হচ্ছে, কোথাও ঢেঁকির তলায় ফেলে কোটা হচ্ছে, কোথাও আগুনে গলানো লোহার সাঁড়াশী দিয়ে জিভ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। খেজুরগাছে তুলে হাত-পা গাছের সঙ্গে বেঁধে টেনে নামানো হচ্ছে এমনও একটা ছবি ছিল। সব শেষ ছবিটি ছিল নদীর ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হয়ে ব'সে আছেন নৌকা নিয়ে। দ্বিজপদ গাইত—ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।

বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরত—গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদর নাচাত, আর চলত। ওরা যেত— মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম—মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ, তেমনি কি ছিল চুল—পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য যে ভারতবর্ষের যে-কোনো শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি—রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মত। তেমনি টিকলো নাক আর তীক্ষ্ণ চোখ।

ওদের গানের দু-একটা মনে আছে।

ও কালীনাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে প'ড়ে ধূলাতে।
কালী—না—গ।

আর একটা গান—

ও জানি না গো—ও গো- এ—মন হবে।
গোকুল ছাড়িয়ে কালা মথুরাতে যাবে।

আর একটা গান—

কালীদহের ও লাগিনী ফুঁসিস না—এমন ক'রে ফুঁসিস না।
ও তারে—দেখলে লাজের মাথা খাবি, তাও কি মরণ বুঝিস না।
ও লাগিনী ফুঁসিস না।

কালো কেউটে সাপ অত্যন্ত হিংস্র। মানুষকে এরা তাড়া ক'রে কামড়ায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই তা নয়। একটি কেউটে সাপের সঙ্গে আমার এক সময় নিত্য দেখা হ'ত। কিন্তু সে কখনও মাথা তোলে নি। সাড়া পাওয়া মাত্র চ'লে যেত। তার কথা পরে বলব। কিন্তু সাধারণভাবে কেউটের স্বভাব হিংস্র এবং এরা তাড়া ক'রে যায় মানুষকে। আমিও তাড়া খেয়েছি অন্য কেউটের দু-চারবার। এই বেদেরা আশ্চর্য। এরা তাড়া ক'রে ধরে এই সব সাপ। দেখেছি, বেদের মেয়ে বর্ষার ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি—কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধ'রে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধরে' আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে—"আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি ?" মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা পাঁচনি ছড়ি হাতে নিয়ে—সদ্য-ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচাতে দেখেছি, গাইতে শুনেছি—"ও লাগিনী ফুঁসিস না।"

পটুয়ারা এবং বেদিয়ারা ধর্মে মুসলমান। বহুকাল পর্যন্ত এ তথ্য জানতাম না। দ্বিজপদ পটুয়া, রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার হৃদ্য একটি সম্পর্ক জন্মেছিল। দ্বিজপদের সুন্দর চেহারা এবং রাধিকার একপিঠ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ণ চোখ যেন আকর্ষণ করত আমাকে। রাধিকা এক-একদিন বাঁদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত—

হীরেমন নাচ দেখি লো!
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে, বাহার ক'রে,
ও হীরেমন নাচ দেখি লো!
যেমন আমার খোকাবাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবি লো!

আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলত—মায়ের কাছে একখানা শান্তিপুরে শাড়ি এনে দাও খোকাবাবু, হ্যাঁ।

তা আমি দিয়েছিলাম। মা একবার পুরানো একখানা শান্তিপুরে শাড়ি তাকে দিয়েছিলেন। সে কাপড়খানা আমাদের বাড়ীতেই প'রে হেলে-দুলে চ'লে গিয়েছিল। বুড়ী রাধিকা একদিন আমায় বললে—তখন আমি কংগ্রেসের কাজ করি—১৩।১৪ সালে বোধ হয়। বললে—হ্যাঁ, খোকাবাবু, দাড়কার অবনীশবাবু যে আমাদিগে হিঁদু হতে বলছে, কি করি বল তো?

দ্বিজপদও বলেছিল। কয়েকদিন পর সেও এসেছিল, সেও বললে। তখন জানলাম ওরা ধর্মে ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

আর এক দল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। মনে আছে, ছেলেবেলায় শুনেছি—

ও মহারানীর মিত্যু হ-ই-ল।
ও- বড়লাট ছোটলাট কাঁদিতে বসিল।

এদের কাছেই ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান শুনেছিলাম। ওরা বলেছিল—আমাদের বাঁধা গান।

ও—বিদায় দে মা—ফিরে আসি।

এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে, দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্য-ব্যবসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় শৌখীন শাড়ি—দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে প'রে, নাকের নথ দুলিয়ে, ভুরু টেনে, হেলে দুলে, সুর ক'রে কথা ব'লে গৃহস্থের দোরে এসে দাঁড়ায়—ভিক্ষে পাই মা, সোনাকপালী, স্বামীসোহাগী, চাঁদবদনী, রাজার রানী! কোমরে হাতের কনুই দিয়ে ধ'রে রাখে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িটা রেখেই বলে—নাচন দেখাই মা, দেখ। ব'লেই আরম্ভ ক'রে দেয়, দুই হাতে তুড়ি মেরে, দেহখানি নৃত্যদোলায় দুলিয়ে দিয়ে গান ধরে—

উর্‌র্‌—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জার ঘিনি না—

উরুর-র—

অদ্ভুত মিষ্ট ভাষা এদের। তেমনি কী নাছোড়বান্দা! হাঁক দিয়ে দাঁড়ালে যদি গৃহস্থ বলে—ভিক্ষে দিতে নেই, বাড়ীতে অসুখ।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে দরদ মাখিয়ে সুরেলা উচ্চারণে বলে উঠল—বালাই ষাট, ওকথা বলতে নাই মা—শত্রুর অসুখ হোক। হাত জোড়া আছে বললে, বলে—হাতের কঙ্কণ নাড়া দিয়ে জোড়া হাত খুলে ফেল রাজার মা, বাবু-সোহাগী! এদের বাজী অর্থাৎ যাদু-বিদ্যার পারদর্শিতা অদ্ভুত। এরা বলে অনেক কথা—টাকু মোড়ল ব'লে কে এক ওস্তাদ ছিল; তার দোহাই দিয়ে বাজী দেখাত।

আরও আসত সতাকারের বেদের দল।

তাঁবু, গরুর গাড়ী, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচ শো পর্যন্ত লোক থাকত। নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সে-কালে বছরে তিনটে-চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, এক ফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মত দেহ, তারা আসত—পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর; এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে প্রান্তরে শিকার ক'রে আনত খরগোস, সজারু, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল, বড় বড় ধামিন সাপ। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়-হয়, তখন তারা শিকার ক'রে ফিরত, অস্পষ্ট আলোয় ছায়ামূর্তির মত দেখাত, কাঁধে বাঁকে ঝুলত রাশীকৃত মৃত জন্তু, সরীসৃপ। এদের মেয়েরা গ্রামে দুপুরে ভিক্ষা করত। মাটির ঝুমঝুমি, খেজুরপাতায় বোনা থলে বিক্রি করত। দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠত—এ খোকার মা, ঝুমঝুমি লিবি? কিনলেও বিপদ, না-কিনলেও বিপদ, ঝগড়া কোনোক্রমে বাধিয়ে কিছু-না-কিছু কেড়ে নিয়ে পালাত।

অপেক্ষাকৃত সভ্য বেদের দল আসত।

ইরানীরা আসত। এদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত।

ছুরি কাঁচি বিক্রি করে। মাথায় ডবল বেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা পাঞ্জাবি পরে মেয়েরা। মাথায় পাগড়ি বা মেমটুপি, পাজামা পাঞ্জাবি পরে পুরুষরা দল বেঁধে গ্রামে ঢুকত। দর করলে নিতেই হ'ত জিনিস। এবং যে দাম বলত—সেই দামই আদায় করত। আমাদের বাড়ীতে যোগেশদাদা নায়েব ছিলেন। ভারি ভাল মানুষ, সুপুরুষ, গৌরবর্ণ মানুষ, মাথায় লম্বা চুল, গোঁফ-দাড়িতে মানুষটিকে মানিয়েছিল চমৎকার। সাধু ভাষায় কথা বলতেন। তিনি একবার একটি ইরানী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ্যায় ?

বেণী দুলিয়ে উদ্ধত যাযাবরী ছুটে সিঁড়ি বেয়ে এসে সেলাম করে বললে—ছুরি আসে, কাঁইচি আসে, ক্ষুর আসে—দেকো-দেকো-দেকো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে পসরা খুলে ব'সে গেল ইরানী মেয়ে। টকটকে রঙ, মাথায় লাল রুমাল, গায়ে গাঢ় নীল সবুজ পাঞ্জাবি, কালো দুটো বেণী, খাটো কিন্তু মোটা। যোগেশদাদা একখনা ক্ষুর নিয়ে দেখে বলেছিলেন—আচ্ছা নেহি।

—আচ্ছা নেহি ? ইরানী মেয়ে ফোঁস ক'রে উঠল।—আচ্ছা নেহি ? ব'লে এক হাতে যোগেশদাদার হাত চেপে ধ'রে অন্য হাতে ক্ষুরখানা ধ'রে বললে—বলো, কাটেগা ?

—আরে, কাটেগা কি ? না—না—

খিলখিল ক'রে হেসে মেয়েটা যোগেশদাদার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে —তবে দেকো। ব'লেই ক্ষুরটা বসিয়ে দিলে নিজের হাতে। অল্পই বসালে অবশ্য। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল। হেসে রক্ত দেখিয়ে বললে—দেকো। ক্যায়সা দার হ্যায় দেকো। আব লেও।

যোগেশদাদা বললে—না। নেব না। তুই ভয়ানক—

ভয়ানকই বটে, ইরানী মেয়েটা খপ ক'রে যোগেশদাদার দাড়ি চেপে ধ'রে বললে—তব তুমার দাড়ি লে লেগা! হামারা ক্ষুর দেখানেকা দাম।

আর আসত সভ্য বেদে। আজকাল অনেকেই এদের জানেন না। মস্ত দল, ঘোড়া গরু মহিষ তাঁবু কুকুর-সরঞ্জাম অনেক। এরা সব

কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেউ সাজত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কপালে তিলক, গলায় তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু, বেশ সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে এসে দোরে দাঁড়াত। এদের একটা ভিক্ষের বুলি আমার আজও মনে আছে—সীত্যারাম—সীত্যারাম। বাড়ীর মঙ্গল হোবে রাম। সাধু বিদায় করো রাম। ব'লেই যেত, ব'লেই যেত—রাজ্য পাবে, পুত্র পাবে মনের মত পত্নী পাবে। তেমন ভক্তিমান দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলত—ধরো, ধরো। রামজী স্বপ্ন দিয়া তুমকো দেনেকো লিয়ে, ধরো। গৃহস্থ শঙ্কিত হয়ে হাত বাড়াত। পেত একটা তামার মাদুলী। সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলত দে দক্ষিণা। একশো- পঞ্চাশ—পঁচিশ—পাঁচ। শেষে এক টাকায় এসে চোখ রাঙা ক'বে বলত—ভস্ম ক'রে দেব। শাপ দেব।

৬

শুধু কি এরাই সে-কালের সব? আরও ছিল। বলতে গিয়ে কথা ফুরোয় না। ডাইনী ছিল—স্বর্ণ ডাইনীকে মনে পড়ছে। শুকনো কাঠির মত চেহারা, একটু কুঁজো। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, হাটে তরিতরকারি কিনে গ্রামে-ঘরে বেচে বেড়াত। চোখ দুটো ছিল নরুনের চেরা চোখের মত ছোট। দৃষ্টি তীক্ষ্ণই ছিল, কিন্তু ডাইনী শুনে মনে হ'ত সে চোখ যেন আমার বুকের ভেতরটা ভেদ ক'রে ঢুকে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা খুঁজে খুঁজে ফিরছে। স্বর্ণ গ্রামে বড কারও ঘরে ঢুকত না। আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমরা স্বর্ণপিসী বলতাম। বেচারী গ্রামের ভদ্রপল্লী থেকে দূরে—জেলেপাড়ার মোড়ে একখানি ঘর বেঁধে বাস করত। সে-পথে যেতে-আসতে দেখেছি, বুড়ী ঘরের মধ্যে আধো অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে ব'সে আছে। চুপ ক'রে ব'সে আছে। কথা বড কারও সঙ্গে বলত না। কেউ বললেও তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে

ঢুকে যেত। তার শেষ-কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ ক'রে সে মনে মনে শিউরে উঠত; কাউকে দেখে চোখে ভাল লাগলে সে সভয়ে চোখ বন্ধ করত; চোখে ভাল লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। দুই ক্ষেত্রেই তার শঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে, হয়ত বা ফেলেছে, বিষাক্ত তীরের মত তার লোভ গিয়ে ওদের দেহের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না, স্বজন ছিল না। রোগের যন্ত্রণায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে।

ডাইনী স্বর্ণ একাই ছিল না, আরও ছিল। কিন্তু স্বর্ণের মত অপবাদ কারুর ছিল না। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমার চোখের উপর ভাসছে। জীবনে ভুলতে পারব না শৈশবের দেখা সে ছবি। বলব ঘটনাটি। আমাদের বাড়ীতে ছিলেন আমাদেরই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। রান্নার কাজ করতেন। আমি তাঁকে বলতাম 'দাদার মা'। তার ছোট ছেলেটিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন আমাদেরই বাড়ীতে। অবিনাশ-দাদার উপর ছেলেবেলায় আমার গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে আঁকড়ে থাকতাম, স্কুল যাবার সময় তিনি বিপন্ন হতেন। তিনিও আমাকে গভীর স্নেহ করতেন। নইলে ছোট একটি ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার মত সম্পদ তাঁর কিছু ছিল না। অবিনাশ-দাদার গল্প-ভাণ্ডারে একটি মাত্র গল্প ছিল,—'ব্যাজারে ব্রাহ্মণের গল্প'।—এক ব্রাহ্মণ মাঠে গিয়েছেন। এক জায়গায় কুলকাঁটা ছড়ানো ছিল, ভুল ক'রে তারই উপর গিয়ে পড়েছেন আর পায়ে কাঁটা ফুটেছে। সে-কাঁটা বের করতে গেলেন, এদিকে অন্য পাটি ট'লে পড়ল কাঁটার উপর, তাতে ফুটল কাঁটা। এ-পা মুক্ত ক'রে নামিয়ে সে-পায়ের কাঁটা তুলতে তুলতে টলল এ-পা। ফুটল কাঁটা। মোট কথা, কাঁটা আর ছাড়ে না। ব্রাহ্মণের একেই ব্যাজার স্বভাব, তার উপর এই ব্যাপার। ক্ষেপে গেলেন ব্রাহ্মণ এবং দুই পায়ে সেই কাঁটা ছড়ানো ঠাঁইটুকুর উপর, ভ্যাক ভ্যাক ক'রে লাথি মেরে নাচতে লাগলেন আর

চ্যাচাতে লাগলেন—ভোঁক—ভোঁক—ভোঁক - ভোঁক। আমাদের দেশে 'কাঁটা ফোটা' বলে না ; বলে—কাঁটা ভোঁকা, কাঁটা ফুঁকেছে। এইটুকু গল্প। কিন্তু সে থাক। গল্প একটিই হোক আর যত তুচ্ছ সামান্যই হোক, অবিনাশ-দাদার মুল্য আমার কাছে অসামান্য ছিল। একদা খবর পেলাম অবিনাশ-দাদাকে স্বর্ণ ডাইনী খেয়েছে। ডাইনে নজর দেওয়াকে আমরা বলি - ডাইনে খাওয়া। প্রবল জ্বরে অবিনাশ-দাদা অচেতন। দাদার মা তখন তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকেন, আমাদের বাড়ীতে কাজ করেন নাই, কাজ করেন তাঁর বড় মেয়ে সাতনদিদি। সাতনদিদিই সকালে কাঁদতে কাঁদতে এলেন। খবর পাঠানো হ'ল গোঁসাই-বাবার কাছে। 'ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু। তখন তিনি আমাদেরই বাগানে তারা-মায়ের আশ্রমে থাকতেন। প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন। আমারই মায়ার ডোরে সন্ন্যাসী আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন। গোঁসাই-বাবা ডাইনের ওঝা ছিলেন। মন্ত্র জানতেন। তাঁরই সঙ্গে, বোধ হয় তাঁরই কোলে চেপে, গেলাম দাদার মায়ের বাড়ী। উঠান তখন লোকে লোকারণ্য। সনা ডাইনে খেয়েছে অবিনাশকে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠায় অর্থাৎ মাটির দোতলায় অবিনাশ-দাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। ডাকলে সাড়া নাই। প্রবল জ্বর। মাথার শিয়রে দাদার মা ব'সে। ও-পাশে ব'সে অবিনাশ দাদার দুই বোন। গোঁসাই-বাবা ডাকলেন—মামা। গোঁসাই-বাবাকে দাদার মা 'গোঁসাই-দাদা' বলতেন, সেই হেতু অবিনাশ-দাদা তাঁকে বলতেন, রামজী মামা। সাধু অবিনাশ-দাদাকে বলতেন ভাগ্না, কখনও মামা।

কোনো উত্তর দিতেন না অবিনাশ-দাদা।

—অবিনাশ!

অবিনাশ এবার ঘুরে শুল।—মর্, হাঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে, আমাকে কি বলিস তুই?

—তু কৌন রে?

চুপ ক'রে রইল অবিনাশ।

—কৌন তু ?

—বলব না।

—বলবি না ?

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হ'ল। বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র প'ড়েন রামজী সাধু আর মধ্যে মধ্যে ফুঁ দেন—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

অবিনাশ চীৎকার ক'রে উঠল, পরিত্রাহি চীৎকার।—বলছি—বলছি—বলছি।

তবু মন্ত্র পড়া চলল।—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

—বাপ রে, মা রে! ও গোঁসাই, আর মেরো না। বলছি, আমি বলছি।

—বোল, তু কৌন ?

—আমি স্বর্ণ। স্বর্ণ ডাইনী।

—তু কাহে এখানে ? আঁ ?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—খেলি ? কাহে—কাহে খেলি ?

—কি করব ? আমার ঘরের ছামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে ? কাহে বললি না—হামাকে দাও ?

—কি ক'রে বলব ? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ। তব ইবার তু যা। ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে ব'লো না।

আদেশের সুরে গোঁসাই বললেন—যা তু। হামি বলছে।

—না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশ-দাদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না ? আচ্ছা। এ দিদি, আন্ সরষা।

সরষে এল। "হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ে— ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশ-দাদার গায়ে।

চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল অবিনাশ-দাদা—বাবা রে, মা রে, ওরে, মেরে ফেললে রে! ওরে বাবা রে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ, যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ? হাত তুললেন রামজী সাধু, মারবেন ছিটে। অবিনাশ চীৎকার করলে আবার—না না! যাব, যাচ্ছি।

—যাবি?

—হাঁ, যাবো।

—তব্ এক কাম কর। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে। দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

যারে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজী বাবা বললেন—না। ঘর থেকে অবিনাশ বের হ'ল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল. সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধ'রেই নেয়ে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খ'সে প'ড়ে গেল, সে নিজেও প'ড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাই-বাবা।

এবার বিপুল বলশালী পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্যযুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলা ক'রে তুলে উপরে

এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোঁসাই-বাবার পাশেই-পাশেই রয়েছি আমি। এবার গোঁসাই-বাবা ডাকলেন—অবিনাশ! মামা!

—অ্যাঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশ-দাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী-আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা মার খেয়েছিল, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পর, তখন আমা বয়স তেরো-চোদ্দো বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ী। আমার ভয় চ'লে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম, স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় ব'সে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবীপরিত্যক্ত স্বর্ণ কখনও কথা বলতে সাহস হ'ত না। কি জানি, স্বর্ণ যদি সেই ডাইনী মন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ ক'রে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে বলে, তোকে দিলাম। তবে আমিও যে ডাইনী হয়ে যাব। স্বর্ণ পাবে জীবন থেকে মুক্তি।

কথাটা আমাকে বলেছিলেন আমার পিসীমা। আতঙ্কে এক রাত্রি ঘুম হয় নি। মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন—জানি নে বাবা, সত্যি মিথ্যে কি। সত্যি ব'লে আমার মনে হয় না। তবে ও তোমার এমন অনিষ্ট করবে কেন? স্বর্ণ আমাকে ভালবাসে। তোমাদেরও ভালবাসে। তা ছাড়া, কই, অবিনাশের ওই ঘটনার পার আর তো স্বর্ণকে দিয়ে কারুর অনিষ্ট হয় নি?

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক

বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে-গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। এক দিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হ'ত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম, ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন্। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরম-কালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে ব'সে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে আমোদ-আহ্লাদ করছে, এমন সময় আকাশ-পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হ'ল—একি!

গুণীন্ হেসে বললে—গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে? কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে ব'সে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তরে। ডাকিনী চলেছে আকাশ-পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

· দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন্ হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে একটা চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, একসঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠল, ঈ—

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন্ আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেই চলল। মেঘের মত জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সামনে সে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নামল এক অশত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামে নি। মাটি ফাটল, শিকড় সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এইখানে জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারও চেয়ে বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, একপিঠ এলোচুল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন্, দশের সামনে এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হ'লেও মেয়ে। আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন্ হাসল।

ডাকিনী তখন নেমে হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন্ হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর সইল না; একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন্ তাকে ধমক দিলে—না।

ততক্ষণে আর-একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিলে, গুণীন্ আঁতকে উঠল -করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। গামছাখানার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিক ঢেকে, হেঁট হয়ে, পায়ের দিকের গামছার প্রান্তটা ধ'রে উপর দিকে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার ক'রে ফেলে দিলে। গুণীন্ মর্মান্তিক চীৎকার ক'রে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়া পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল। চামড়া-ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ ক'রে উঠল। ডাকিনীর খিল-খিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন্ সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল; মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটার আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবরার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চ'লে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

এর উপর ছিল ভূত।

আমাদের বাড়ীর গলিতে—বাড়ী থেকে বৈঠকখানা ও সদর রাস্তায় যাবার পথে, জ্যাঠামশায়দের ডুমুরগাছে ভূত ছিল। শিউলিগাছে

ব্রাহ্মণ-প্রেত ছিল। এই গলিপথ নিচের দিকে ছিল সর্পসঙ্কুল—অন্য দিকে মাথার উপরটা ভূত-অধ্যুষিত। সে কী বিপদ শিশুর পক্ষে! বারো-চোদ্দো বৎসর বয়স পর্যন্ত গলির মুখে এসেই ঢুকতাম আমাদেরই বাড়ীর দৌহিত্র-বংশের এক বাড়ীতে। সকাতরে বলতাম —ওগো, আমাকে একটু দাঁড়িয়ে দাও।

সাপের ভয় আমার ছিল না কোনো কালে। আজ পর্যন্ত, আমি একলা যখন যাওয়া-আসা করেছি, কখনও আলো হাতে যাবার প্রয়োজন অনুভব করি নি। মোটামুটি ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওদের চলাফেরা বুঝতে পারি। গ্রামের মধ্যে যে সব সাপ বাস করে, তারা মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বাস করে—এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি। বিপদ মাঠের সাপের কাছে। তারা মাঠে থাকে, মানুষকে তারা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাও, উত্তরকালে, আমি যখন কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলাম আবাদ করে সোনা ফলাবার জন্য—তখন এক কালো কেউটের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়েছিল। প্রায় নিত্যই আমার সঙ্গে দেখা হ'ত তার। পরে তার বাসাও আবিষ্কার করেছিলাম। একবার প্রবল বৃষ্টিতে দেখেছিলাম, তার বাসাটার উপরে মাটি খুলে একরাশি ডিম জলের স্রোতে ভেসে গেল। তখন জানলাম, সাপটি নারী জাতীয়া—নাম দিয়েছিলাম তার কালকূটী।

ভূত থেকে সাপের কথায় এসে পড়েছি। সাপের কথা থাক।

আমাদের গলিতে ডুমুরগাছের ভূত আমাকে উত্যক্ত করেছে।

শিউলিতলার ব্রাহ্মণের বিবরণ বিচিত্র। ইনি ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা দেন। দেখা দেন কালপুরুষের মত। তিনি দেখা দিলেই বুঝতে হবে, আমাদের কয়েক বাড়ীর মধ্যে কারুর ডাক পড়েছে।

আমাদের বাড়ীর গলির ওপাশে ছিল ভট্চাজদের বাড়ী। গল্প শুনলাম এই বাড়ীর রামাই ভূতের। রামাই বাড়ীর চালের সাঙায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকত। তার শিশু ভাইপো বিছানায় কাঁদলে তাকে বিছানা-সুদ্ধ তুলে সাঙায় নিয়ে দোল দিত। আরও অদ্ভুত কাণ্ড

রামাই ভূতের। শুনেছি, নাকি কাঁদীর রাজবাড়ীতে রাস-উৎসবের খুব সমারোহ হয়। খাওয়া-দাওয়া দু-তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত। একবার বাড়ীর মেয়েরা রাস-পূর্ণিমার দিন ওই রাজবাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার গল্প করছিলেন। একজন বলেছিলেন—মিছে গল্প ক'রে কি হবে? খাওয়াচ্ছে কে? পর-মুহূর্তেই রামাইয়ের কথা মনে করে বলেছিলেন--রামাই যদি দয়া করে তবে নিশ্চয় সাধ মেটে, খেতে পাই!

বাস্, ; ঘণ্টা খানেক যেতে-না যেতেই শূন্যলোক থেকে নেমে এল দুই চ্যাঙারি। লুচি, মালপো, মিষ্টিতে বোঝাই।

এর পর আর ভূত বিশ্বাস না-ক'রে উপায় আছে?

ভূতের গল্প মাও বলতেন, কিন্তু ভূতকে ভয় ছিল না তাঁর। সে কথা আগে বলেছি ডুমুরগাছের ভূতের ভয় আশ্চর্যভাবে আমার কেটেছিল। সে কথা এখানে নয়, পরে বলব।

ডাইন ডাকিনী ভূত প্রেত-সমাকুল আমার সে-কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতি দিনই এদের কারুর-না-কারুর বা কোনো দলের-না-কোনো দলের সঙ্গে দেখা হ'তই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় ক'রে এসেছে ঠিক এই কারণেই। কলকাতায় ম্যাজিকওয়ালারা বা বাজীকরেরা যারা তাঁবু খাটিয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিতরে কাচের জারের মধ্যে আরকে ডুবানো মরা ছ'টা পা দুটো মুণ্ডুওয়ালা ছাগলের বাচ্চা দেখায়, তাদের মত বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য আমি এদের খুঁজেপেতে আনি নি। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট কাহিনী বলব আমার সাহিত্যিক জীবনের।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ের কথা। আমার 'ছলনাময়ী' গল্পের বইয়ে "ডাইনীর বাঁশী" গল্পটি আছে। স্বর্ণ ডাইনীর গল্প। রবীন্দ্রনাথ নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বললেন—ডাইনীর গল্পটি ভাল হয়েছে। খুব ভাল লেগেছে আমার। আমি কলকাতায় কয়েকজনের কাছে বললাম। একজন বললেন—আমাদের দেশে উইচ নিয়ে গল্প? গল্পটি নিশ্চয় বিদেশী গল্প থেকে নিয়েছে।

আমি তাঁর কথার মধ্যেই ব'লে উঠলাম—না। ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরিজী ভাল জানি না, আমার গ্রামে ইংরিজী বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি। আমি—

হেসে তিনি বললেন—আমিও তাঁদের তাই বলেছি। এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে। পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণ দুপুরবেলা ব'সে আছে আর সামনের তালগাছটার মাথায় চিলটা ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইচক্র্যাফ্‌টের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইন দেখেন নি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হ'লেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না ব'লে ধার করেছে।

এরই মধ্য থেকেই, মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকুতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ।

আমার মায়ের মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়াও আর এক উপাদেয় ধারায় পেয়েছিলাম এই শিক্ষা—মায়ের গল্প বলার কথা আগে বলেছি। নিত্য সন্ধ্যায় শুনতাম গল্প। যে-দিন চুল বাঁধতে বসতে হ'ত, সে-দিন চুল বাঁধার সময় গল্প বলতেন।

"এক ছিল রাজা।
রাজার দুই মেয়ে।"

বলতেন সত্যপ্রিয়ের কাহিনী। আমার 'শ্রীপঞ্চমী' নামে ছেলেদের গল্পের বইয়ের প্রথম গল্প। সত্যই একমাত্র প্রেয় ছিল কুমারটির, শ্রেয়ই হয়েছিল তার প্রেয়। তারই কাহিনী থেকে পেতাম পথের নিশানা। সত্যই একমাত্র পথ।

গল্পের শেষে মা বলতেন—

কহনী হ্যায় সাচ্চা,
বলনেবালা ঝুটা,
শুননেবালা সাচ্চা।

বলতেন—আমি বললাম বানিয়ে। কিন্তু তুমি সত্যি, আর গল্প সত্যি। গল্প তুমি কোনোদিন ভুলবে না।

৭

ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে, সে-কালের গল্পগুলির মধ্যে, অন্তত আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।

এ-কালে অনেক পুরাকালের গল্প-সংগ্রহ বেরিয়েছে; 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি', আরও অনেক। এগুলির মধ্যে আমার শোনা গল্পগুলি পাই নি। এর কারণ বোধ হয় আমার শোনা গল্পগুলির উৎপত্তিস্থান বাংলা দেশ নয়। আমার প্রথম গল্পকথক আমার মা। তাঁর জন্ম পাটনা শহরে, মানুষও হয়েছিলেন তিনি পাটনায়। তিনি বলতেন যে-সব গল্প, তার অধিকাংশই তিনি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের ঝিয়ের কাছে। বলতেন—বুড়ী দাই। বুড়ী দাইকে তাঁর কী শ্রদ্ধা আর মমতা ছিল! ওই সত্যপ্রিয়ের কাহিনীর কথা এর আগে উল্লেখ করেছি; কাজলহারার কথা বলেছি; আর একটা গল্প তাঁর 'ঘাসেড়ানন্দনের গল্প'। ঘাসেড়ানন্দন শব্দটাতেই হিন্দী ভাষার গন্ধ আছে। তবে আমার মা তাকে আশ্চর্যভাবে আত্মসাৎ ক'রে একেবারে বাঙালীর গল্প ক'রে তুলেছিলেন। এই সেদিনও, বোধ হয় মাস তিনেক আগে (১৩৫৭ সালের ভাদ্র মাসে), সেই গল্প তিনি আমার পৌত্রকে শোনাচ্ছিলেন। আমিও বসলাম পাশে। মা হাসলেন। আমার পিঠে হাত দিয়ে যেন আমাকেই বলতে লাগলেন। এক জায়গায় নানা খাবারের কথা আছে। তিনি ব'লে গেলেন—মল্লিকা ফুলের মত সাদা সুগন্ধ অন্ন, কাঁচা সোনার মত রঙের সোনামুগের দাল, শাক শুক্তো দালনা, নানা রকমের ভাজা, ঝোল ঝাল অম্বল চাটনি, দই পায়স ক্ষীর পিঠা, নানাবিধ মিষ্টান্ন,

রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, চমচম, বরফি—অনেক নাম ক'রে গেলেন। কিন্তু কোনোটি বিহারের বিশেষ খাদ্য নয়। এই গল্পটির মধ্যে বড় হ'ল বন্ধুপ্রীতি, সত্যপ্রীতি এবং বীর্যবানের বীর্য। রাজকন্যাও আছে, মায়াবিনী ডাকিনীও আছে, কিন্তু সে-সব কিছুই মনে থাকে না। মনে থাকে, বন্ধুর কাছে সত্য গোপন করেছিলেন ব'লে মহাবীর ঘাসেড়ানন্দন তাঁদের বললেন—ভাই, তোমরা বন্ধু, তোমাদের ভোলা অসম্ভব, ভুলতে কখনই পারব না জীবনে। তবে ভাই, সত্য হ'ল তার চেয়েও বড়। সেই সত্যকে আমার কাছে গোপন করেছ তোমরা ; সুতরাং আজ থেকে বুকের বন্ধুত্ব বুকে রেখে আমরা পৃথক হলাম। যখন আহার করব, অন্ততঃ চারজনের আয়োজন করব, চার পাতে সাজাব, আগে তোমাদের তিনজনকে নিবেদন ক'রে তবে নিজে খাব। চারজনের মত আয়োজন যদি না জোটে, তবে যা জুটবে তাই চার ভাগ ক'রে তিন ভাগ তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে আমি এক ভাগ খাব। তিন ভাগ বিতরণ ক'রে দেব দীনদুঃখীকে।

তিন বন্ধু চ'লে গেলেন একদিনে। তাঁরাও তাই স্বীকার করলেন। দোষ মেনে নিলেন। বললেন—এই মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যদি পারি তো আবার দেখা হবে।

দেখা অবশ্যই হয়েছিল। এবং গল্প শোনার পরমানন্দের মধ্যে ওই কথা কয়টিই কানে বাজত। ওই তো সেই প্রাণপুরুষের সন্ধানের রহস্যমন্ত্র।

গল্প শোনার পর্বকে বলতে পারি—আমার হাতেখড়ির আগে মুখে মুখে জীবনের বর্ণপরিচয়ের চেষ্টার প্রথম পর্ব। এই পর্বের মধ্যে মায়ের পরই হলেন আমার গোঁসাই বাবা রামজী সাধু। তিনি আমাদের গ্রামের ফুল্লরা মহাপীঠে তীর্থভ্রমণে এসে আমার বাবার আধ্যাত্মিক চর্চার পরিচয়ে আকৃষ্ট হয়ে বাবার পরম বন্ধুতে পরিণত হন। গ্রামপ্রান্তের একটি প্রান্তরে বাবা তখন একটি বাগান তৈরি করাচ্ছিলেন। সেই বাগানটির মধ্যে সন্ন্যাসী বন্ধুর জন্য একটি আশ্রম তৈরি ক'রে দেন এবং সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি মন্দির

তৈরি ক'রে সেখানে শারদ শুক্লা-চতুর্দশীতে তারা-পূজার প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর তারা-পূজার প্রবর্তন হয় সেই বৎসরেই ঠিক দশ মাসে আমার জন্ম হয়, সেই কারণেই এই সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে হাতে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরি করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে। সন্ন্যাসী-জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু। আমার ভাগ্যক্রমে রামজী বাবা—আমার গোঁসাই বাবাও—ছিলেন অদ্ভুত দক্ষ কথক। আমার জীবনে, চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-কথকের সাক্ষাৎ পেয়েছি; আমার মা, আমার গোঁসাই বাবা, আর দু'জনের সাক্ষাৎ পেয়েছি পরিণত বয়সে—একজন প্রায় আমার সমবয়সী, তিন-চার বৎসরের বড়—তাঁর নাম গৌর ঘোষ। অপরজন ত্রিকাল ভট্টাচার্য—অকস্মাৎ অপরিচিত মানুষটি এসে আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন। ত্রিকাল ভট্টাচার্য এক কালে ছিলেন পেশাদার গল্প বলিয়ে, তাঁর মত গল্প-কথক বাংলা দেশে আর কেউ আছেন বলে কল্পনা করতে পারি না। গৌর ঘোষ আশ্চর্য রকম ভাল ভূতের গল্প জানে এবং বলতে পারে। গৌর ভূতের ভয়ে চটি ফেলে ছুট পালাত, কিন্তু সে যখন ভূতের গল্প বলত তখন ভূত যেন মজলিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বলত—হঠাৎ উ-স শব্দ হ'ল, ছাদ ফুঁড়ে সড়-সড় সড়-সড় ক'রে নেমে এল একটা সদ্যজাত ছেলে, ছেলেটা ওঁয়া-ওঁয়া ক'রে কাঁদছে। গৌর নিজেই ওঁয়া-ওঁয়া শব্দে ককিয়ে উঠত, আর মজলিসসুদ্ধ লোক আ শব্দ ক'রে আতকে উঠত। রামজী বাবা ভাঙা বাংলায় হিন্দুস্থানী রূপকথা বলতেন। "সহবৎ অসর, না—তরুম্ তাসীর? জন্মগুণই বড়, না, শিক্ষা-সহবতের গুণ বড়?" তাঁর গল্পের বড় হ'ত শিক্ষার গুণ, জন্মের গুণকে খাটো ক'রে বলতেন—বাবা সহবৎ—সহবৎই হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। রাজার ছেলে মুরুখ হ'লে সে ভূত, সে জানোয়ার। সন্ধ্যায় আসতেন

—আমি পড়া সেরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতাম, রাস্তার দিকে কান পেতে থাকতাম, রাস্তার উপর কখন সবল পদধ্বনি বেজে উঠবে, তার সঙ্গে ঝনাৎ ক'রে বাজবে তাঁর চিমটার কড়ার শব্দ। তিনি বৈঠকখানার ফটকে ঢুকেই হেঁকে উঠতেন, "নমো নারায়ণায়।" আমার বাবার বৈঠকখানার মজলিস ছিল বিখ্যাত মজলিস। গ্রামের সকল বিশিষ্ট লোকেরাই এখানে আসতেন, বসতেন। চায়ের ব্যবস্থা ছিল—সমারোহের ব্যবস্থা। এক-একবারে বিশ থেকে ত্রিশ কাপ চা তৈরী হ'ত। চায়ের জন্য স্বতন্ত্র ঘর ছিল, সে ঘরে উনান নিবত না। কল্কের পর কল্কেতে তামাক সাজা থাকত। আমার অনন্ত দাদা বাবার খাস খানসামা, সে চিমটে ধ'রে তাতে আগুন চড়াত। মজলিসে গ্রামের সামাজিক, বৈষয়িক আলোচনা চলত কিছুক্ষণ, তারপর ধর্মশাস্ত্র আলোচনা হ'ত। গোঁসাই বাবা এলেই সকলে উঠে দাঁড়াতেন। গোঁসাই বাবার কিন্তু সে ঘরে ঢোকবার উপায় ছিল না। তিনি এসে ঢুকতেন আমার পড়ার ঘরে।

বাবা হামার—বাবা হামার—বাবা হামার রে!

আমি লাফ দিয়ে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলে পড়তাম, তিনি বুকে তুলে নিয়ে বলতেন—আজ তো বাবা, লড়াইকে গল্প বলবে। মণিপুরকে গল্প।

মণিপুরের টিকেন্দ্রজিত মহাবীর, মহাভারতের পাণ্ডব-বংশধর; মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত মহাবীর বভ্রুবাহন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। শুধু তাই নয়, পাণ্ডবের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে বভ্রুবাহন ও অর্জুনে—পিতাপুত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করেছিলেন বভ্রুবাহন। সেই বংশের সন্তান টিকেন্দ্রজিত। তাঁরই গল্প।—টিকেন্দ্রজিত বীর হইলে কি হোবে বাবা, আংরেজকে কামান—আরে বাপ রে বাপ—সে ছুটল—দনা-ন্-ন্-ন্। দনা-ন্-ন্-ন্। আমার চোখের সামনে ভেঙে ভেঙে পড়ত দুর্গপ্রাকার। চোখে আসত জল।

মধ্যপথে অনন্ত দাদা অথবা ভীমসিং চাপরাসী আসত বাড়ীর ভিতর

থেকে, আমার পিসিমায়ের তাগিদ নিয়ে। তিনি আমার জন্য ব'সে আছেন। খাইয়ে-দাইয়ে আমাকে নিয়ে শোবেন গিয়ে। আমার পিসিমা শৈলজা দেবী আগুনের মত উত্তপ্ত। আমিই ছিলাম সে উত্তাপে জল। প্রথম জীবনে বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্র হরিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিলেন; বুকে নিয়ে এসেছিলেন জ্বলন্ত চিতাবহ্নি। সে বহ্নিতে কারও নিস্তার ছিল না। আমি যখন জন্মালাম, তখন তিনি মায়ের কোল থেকে আমাকে নিয়ে পালন করতে আরম্ভ করলেন এবং জীবনের উত্তাপও ক'মে আসতে আরম্ভ হ'ল। আমারও পিসিমার কোলের কাছটি ছাড়া ঘুম আসত না। কিন্তু তিনি মাত্র একটি গল্প জানতেন। কাজেই আমার গল্প না-শোনা-পর্যন্ত তাঁকে ব'সে ঢুলতে হ'ত। ঢুলতেন আর গোঁসাই বাবাকে তিরস্কার করতেন।

গোসাই বাবার এ সব তিরস্কার কানে ঢুকত না। তিনি গল্প বলতেন, দনা-ন-ন্-নন দনা-ন-ন-নন।

৮

গল্প শুধু আমিই শুনতাম না, ছেলেরাই শুনত না, সব থেকে বড়দের আসরেও গল্প হ'ত। বাবার বৈঠকখানাই ছিল গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে জমজমাট আসর। সকাল থেকে গ্রামের ভদ্রলোকদের আসা শুরু হ'ত। সকালবেলা আটটা নাগাদ চায়ের আসর জ'মে উঠত, তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ভদ্রলোক এসে ব'সে যেতেন। বাবার খাস খানসামা ছিল আমার অনন্তদা। গ্রামেরই বৈষ্ণবঘরের ছেলে। ছেলে বয়স থেকে আছে, বাবা নিজে কাজ শিখিয়েছিলেন। কাপড় কোঁচানো, চা তৈরী, গা-হাত টেপা ইত্যাদি তারিবতের কাজে অনন্ত দাদার মত নিপুণ শিল্পী সচরাচর দেখা যায় না। অনন্তদা ভোরবেলা উঠে চায়ের সরঞ্জাম, তামাকের সরঞ্জাম তৈরি ক'রে অপেক্ষা করত। একটা স্বতন্ত্র ঘরই ছিল চা এবং তামাকের। বেলা একটা পর্যন্ত চলত মজলিস, তারপর আবার মজলিস বসত সন্ধ্যা আটটা থেকে; রাত্রি বারোটা

বাজতই, কোনো-কোনোদিন রাত্রি দেড়টা-দুটোও বাজত। সেদিন খাওয়া-দাওযার আসরও ব'সে যেত। গ্রামে জামাই বেয়াই কুটুম্ব যার বাড়ীতেই যিনি আসতেন তিনিই আসতেন এই মজলিসে। কয়েকজন—সাত-আটজন ছিলেন আসরের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মানুষ। এঁদের মধ্যে গ্রামের ঘরজামাই দু-তিনজন। বাকি গ্রামের ভদ্রজন। তুমুল উত্তেজিত আলোচনা চলত। বৈষয়িক তর্ক, সামাজিক বিচারের তর্ক। আবার উঠত হাস্য-পরিহাসে হাস্যবোল। সে কী হাসি! রাত্রির অন্ধকার শিউরে উঠত। একালে সেকালের মানুষের সে-স্বাস্থ্যও নাই, সে-কণ্ঠস্বরও নাই, তেমন ক'রে প্রাণ খুলে হাসবার প্রবৃত্তিও নাই; একালে সে-হাসি আর নাই। এক সময় মনে হ ত হয়তো-বা সভ্যতাই সে হাসির উৎসমুখে অনুশাসনের পাথর চাপা দিয়েছে, উচ্ছ্বাস আর সেই স্বচ্ছন্দ বেগবতী ধারায় নির্গমন-পথ পায় না। কিন্তু একদিন বোধ করি ১৯২২।২৩ সালে সে ভ্রম আমার গিয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় ভবানীপুর বেলতলা রোডে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ীর ঠিক পিছনের দিকের বাড়ীতে থাকি। আমি যে ঘরটিতে থাকতাম, স ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা থেকে দাশ মহাশয়ের বাড়ীর দোতলার ঘরের কিছুটা দেখা যায়। বাড়ীর বিস্তীর্ণ হাতার সবটা তো দেখা যেতই। তখন প্রথম বাসায় এসেছি। সেই বাড়ীর নিচের তলায় সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে ব'সে আছি, হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল। সে কী কোলাহল. কোথায় যেন অকস্মাৎ অভাবনীয় কিছু ঘ'টে গেল। তখন ভবানীপুর এ-ভবানীপুর ছিল না, দেশবন্ধুর বাড়ীর সামনে রসা রোডের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড মাঠ প'ড়ে ছিল, পূর্ণ থিয়েটারও তখন হয় নি। ওদিকটা সবই তখন হয় মাঠ, নয় বস্তি। কোলাহল শুনে প্রায় সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় যখন বেরুলাম তখন আর কোলাহল নাই। কি হ'ল? দুর্ঘটনার কোলাহল কি এইভাবে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়? দেশবন্ধুর বাড়ীর পূর্ব দিকের ছোট ফটকে ব'সে ছিল একজন দ্বারপাল; সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের মনের জিজ্ঞাসা। সে হেসে

বলেছিল, যা ভেবেছেন বাবু, তা নয়, হয় নি কিছু, সাহেবরা হাসছেন। হাঁ, হাসি বটে! সেদিনও মনে প'ড়েছিল বাবার মজলিসের হাসি। একালের দোষ নাই, পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। আজ স্বাচ্ছন্দ্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, কাজেই প্রাণশক্তি অপূর্ণাঙ্গ শিশুর মত দুর্বল রুগ্ণ; সে-হাসি হাসবে কি ক'রে মানুষ?

বাবার মজলিসে গল্প হ'ত।

গল্প বেশির ভাগ বলতেন গোঁসাই বাবা।

বাবাও বলতেন। তিনি কথাবার্তা খুব ভাল বলতেন। বক্তা ছিলেন ভাল, কথায় জোর ছিল, কিন্তু গল্প-কথক ভাল ছিলেন না। তিনি বেশির ভাগ গল্প বলতেন বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প বা ওই ধরনের গল্প। গল্পের শেষে প্রশ্ন থাকত। প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রে বলতেন, বল, কার কি উত্তর। সব শেষে তিনি বলতেন গল্পের উত্তর।

একটা গল্প—চার বন্ধু—একজন কাষ্ঠশিল্পী, একজন চিত্রশিল্পী, একজন বস্ত্র ও ভূষণশিল্পী, একজন মন্ত্রসিদ্ধ তাপসপুত্র—একদিন বনের মধ্যে রাত্রে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। কথা হ'ল, গভীর বন—এই বনে এক-একজন এক-এক প্রহর জেগে পাহারা দেবেন। প্রথম প্রহরে প্রহরার ভার পড়ল কাষ্ঠশিল্পীর উপর। বন্ধুরা ঘুমুচ্ছে, তিনি একা ব'সে আছেন, সামনে জ্বলছে এক অগ্নিকুণ্ড, পাশে কিছু শুকনো কাঠ। একা, নিতান্ত খেয়ালবশেই তিনি নিজের যন্ত্র বের ক'রে কাঠ থেকে গড়লেন এক অপূর্ব নারীমূর্তি। মূর্তিটিও শেষ হ'ল, প্রথম প্রহর শেষের ঘোষণাও বেজে উঠল, কাষ্ঠশিল্পী ডেকে দিলেন চিত্র-শিল্পীকে। নিজে শুয়ে পড়লেন। চিত্রশিল্পীর চোখে পড়ল সেই কাঠের নারীমূর্তি। বুঝলেন, বন্ধুর কাজ এটি। তিনি এবার নিজের সরঞ্জাম বের ক'রে তাতে রঙ দিলেন। গোলাপ ফুলের মত দেহবর্ণে উজ্জ্বল ক'রে দিলেন, চোখ আঁকলেন, ভুরু আঁকলেন। গাছের বাকল থেকে আঁশ বের ক'রে এক রাশি কালো রঙ দিয়ে চুল ক'রে দিলেন,

নথ আঁকলেন, গালে একটি ছোট তিল—তাও দিতে ভুললেন না। শেষ করলেন, বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন, মনোমত হ'লে তুলি রেখে বসলেন। এমন সময় দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা ক'রে যামঘোষকেরা কোলাহল ক'রে। চিত্রশিল্পী মূর্তিটিকে একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে সরঞ্জাম গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন, ডেকে দিলেন বস্ত্র ও ভূষণশিল্পীকে। তিনি উঠে আগুনটাকে জোর ক'রে দিয়ে বসলেন, মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠলেন, এই নগ্না সুন্দরী নারী—এ কে? কোন বনদেবী? না, দেবী এমন লজ্জাহীনা নগ্না হবে কেন? তবে কি মায়াবিনী? না, তাও তো নয়। মায়াবিনী এমন নিস্পন্দ স্থির কেন, তার হাবভাব ছলাকলা কই? ভাল ক'রে চোখ রগড়ালেন; এবার বুঝলেন, দুই বন্ধুর কীর্তি এটি। হাসলেন, এবং পরক্ষণেই নিজের ব্যবসায়ের কাপড় এবং আভরণের বোঁচকা পেটিকা খুলে বসলেন। বেছে মানানসই রঙের পট্টবস্ত্র বের করলেন, আভরণ বের করলেন, পুতুলটিকে মনের মত ক'রে সাজালেন। তারপর তৃতীয় প্রহর শেষ হতেই মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্রকে জাগিয়ে নিজে শুলেন। ব্রাহ্মণপুত্র কিন্তু প্রতারিত হলেন না, তিনি এই অনুপম রূপলাবণ্যময়ী পুতুলটিকে দেখবামাত্র বুঝলেন যে, এটি প্রাণহীন পুত্তলিকা মাত্র এবং তিন বন্ধুর তিন প্রহরের আপন-আপন গুণপনার ফল এই মূর্তিটিকে দেখে খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে, তাঁর গুণপরিচয় এর সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়াই তাঁর কর্তব্য। তা হ'লেই চার বন্ধুর এই রাত্রিযাপনটি পরম সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্র পুতুলটিকে অগ্নিকুণ্ডের সামনে এনে রাখলেন, কুণ্ডের অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা সঞ্জীবনী অগ্নিতে পরিণত করলেন, তারপর মন্ত্রজপে বসলেন। মন্ত্রজপ শেষ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তারই তিলক এবং উত্তাপে অভিষেক করতেই পুত্তলিকা জীবন লাভ ক'রে চঞ্চল বিস্ময়ে চারিদিক তাকিয়ে বললে—তুমি কে? আমিই বা কে?

এমন সময় ভোর হ'ল। পাখীরা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত তিন বন্ধু জেগে উঠে বসলেন, এবং এই অপূর্ব নারীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে

গেলেন। বিস্ময় কাটতে কিন্তু সূত্রপাত হ'ল কলহের। চারজনেই বললেন, এ আমার সৃষ্টি —এ হবে আমার পত্নী।
এখন কে বিচার করছে—এ নারী কার প্রাপ্য ?
প্রশ্ন হ'ল—বল, তোমরা বল। কে পাবে এই নারীকে ?
গল্প থেকে বিতর্ক উপস্থিত হ'ত। যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে বিতর্ক এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি। সকলের শেষে বাবা বলতেন গল্পের মীমাংসা। এ গল্পের মীমাংসা, ওই নারীকে পত্নীরূপে পাবেন ওই বস্ত্র এবং আভরণশিল্পী। প্রাণদাতা ব্রাহ্মণপুত্র পিতার কাজ করেছেন—তিনি দিয়েছেন প্রাণশক্তি; চিত্রশিল্পী ও কাষ্ঠশিল্পী তাঁরা মায়ের কাজ করেছেন, দিয়েছেন অস্থি মেদ মজ্জা মাংস রক্ত অবয়ব। ওই বস্ত্র এবং আভরণশিল্পী সদাগরপুত্র বস্ত্র এবং আভরণ দিয়ে ভর্তার কাজ করেছেন। তিনিই তার ভর্তা অর্থাৎ স্বামী।
কখনও কখনও পুরাণের গল্প হ'ত। তা থেকে চ'লে যেতেন শাস্ত্র আলোচনায়। কখনও কখনও হ'ত দেশ-বিদেশের গল্প, কেউ আগন্তুক অথবা বিদেশবাসী গ্রামে ফিরলে সে গল্প হ'ত।—সে তোমাদের কত বলব বাপু! সে-দেশ আচ্ছা দেশ! আচ্ছা দেশ! যত মাছ—তত দুধ, সে-দুধে ঘি কত হে! হাতে লাগলে ছাড়তে চায় না। পদ্মার ধার—বুয়েচ না—এই পদ্মা—একুল-ওকুল নজর চলে না—বর্ষার সময় সাক্ষাৎ ভৈরবী—সে বাবা দেখেই আমার হৃৎকম্প! কালী কালী বল মন, রাত্রে শুয়ে ঘুম হ'ত না। ভাবতাম ঘুমোব, কখন ধ্বস ছাড়বে—অকূলে ভাসব! আঃ, হায় হায়-হায়, জপের মালাটা নিতে সময় পাব না রে বাবা! ভুক ক'রে ডুবব, আর উঠব না। একেবারে সাগরসঙ্গমের তলদেশে মাটিচাপা। নয়তো হাঙ্গর-কুম্ভীরের গর্ভে। বর্ষা পার হ'লেই বাস্। রাজশাহী তো রাজসাহী রে বাবা!
এর পর চুপি চুপি বলতেন—গাঁজার এক-একটা জটা কী! এ-ই এতখানি লম্বা আর ইয়া পুরু। বুয়েচ না ভাই, রসও কী তেমনি! দু' টিপ দিয়েছ তো আঠা একেবারে চট চট ক'রে উঠল। তেজও কী তেমনি রে বাবা! বুয়েচ হরাই ভাই, প্রথম গিয়েছি—এত তো

জানি না—মেরেছি জোরে টান। বাস্‌, গল-গল ক'রে সেই যে ধোঁয়া বেরিয়ে চোখের সামনেটা ঝাপসা করে দিল—তিন দিন সে-ঝাপসা কাটে না চোখের। পোষ্টাপিসের কাজ, চোখে ঝাপসা দেখি, মাথা ভোঁ-ভোঁ করে—তিন আর চারে সাত লিখতে গিয়ে ভাবি, ঠিক হ'ল তো, তিন আর চারে পাঁচ নয় তো? সে এক বিপদ! কালী কালী বল—তারা তারা বল—শিব শিব বল। হরি বোল—হরি বোল।

ইনি ছিলেন আমার ব্রজজ্যাঠা। এমন সদানন্দময় পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, পোষ্টাপিসে কাজ করতেন, সরকার-বংশের সন্তান, লাভপুরে এঁদের বাড়ীরই দৌহিত্র আমরা। অপরূপ মানুষ ছিলেন ব্রজজ্যাঠা।

ব্রজজ্যাঠার কথা মনে পড়লে—কত বিচিত্র কাহিনী যেন মনে পড়ে! ব্রজজ্যাঠা সেকালে ফ্রেঞ্চ-ছাঁট দাড়ি-গোঁফ রাখতেন, দেখতে ছিলেন সুশ্রী মানুষ, কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট। গান গাইতে পারতেন। ছুটিছাটায় বাড়ী এসে গ্রামের পথে বেরিয়েই গান ধরতেন—"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।" গান শেষ করতেন আমাদের বৈঠকখানার দরজায়। ঘরে ঢুকেই ডাকতেন—ভাই কানাই! ভাই হরাই! আমার বাবার নাম ছিল—হরিদাস, তাঁকে আদর ক'রে ডাকতেন—হরাই।

বিচিত্র মানুষ। পেন্সন নেবার পর একবার বর্ধমান গিয়েছিলেন বর্ধমানে মেডিকেল স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। পেন্সন বিক্রীর অভিপ্রায় ছিল। গিয়ে উঠেছিলেন আমাদেরই গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায়। তিনি ছিলেন তখন বর্ধমানের পুলিশ কর্মচারী। নিত্যগোপালবাবুর কথা পরে বলব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে, এই মানুষটি ছিলেন যেমন রূপবান, তেমনই সুকণ্ঠ গায়ক; যেমন উঁচু-মেজাজের লোক, তেমনই ছিলেন জনপ্রিয়। ব্রজবাবুকে পেয়ে নিত্যগোপালবাবু কৃতার্থ হয়ে দু-একদিনের বেশী রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রজজ্যাঠা কিন্তু কিছুতেই থাকবেন না। রসিক

মানুষ, শেষ পর্যন্ত বললেন—গোপাল, আমি তা হ'লে ক্ষেপে যাব। বাড়ীতে বুড়ী আছে, তার জন্য আমার মন কেমন করছে। আমি কি আর থাকতে পারি? ধরে রাখলে গো-বধ ব্রহ্ম-বধ হবে রে ছোঁড়া। তার পাপ তোকে অর্সাবে।

অবশেষে নিত্যগোপালবাবু কৌশল অবলম্বন করলেন। ব্রজজ্যাঠার জুতো-জোড়াটি সরিয়ে রাখলেন। ব্রজজ্যাঠা জুতো না পেয়ে শেষে ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমার সর্বনাশ হ'ল রে গোপাল, আমার সর্বনাশ হ'ল!

নিত্যগোপালবাবু বললেন, এক জোড়া জুতোতে আপনার সর্বনাশ হ'ল?

—ওরে ভাই, তুই জানিস না। জুতো-জোড়া আমার নয়—শম্ভুর জুতো আমি চেয়ে নিয়ে এসেছি ভাই। আঃ, শেষ পর্যন্ত ললাটে কি আছে তা বুঝতে পারছি না আমি। হায়-হায়-হায়! আমি এখন করব কি!

—কি করবেন? আমার বাড়ী থেকে জুতো গিয়েছে—আমি কিনে দেব।

—ওরে, শম্ভুকে জানিস না রে, শম্ভুকে জানিস না তুই।

শম্ভু সরকার দুর্দান্ত ক্রোধী লোক, নিত্যগোপালবাবুরই বয়সী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই—প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষ, তার উপর দুর্দান্ত ক্রোধী—নিত্যগোপালবাবুর বয়সী এবং বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীনকালের তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ ভক্ত; গ্রামের লোকে তার ভয়ে ত্রস্ত।

গোপালবাবু হেসে বললেন—আমি সে-জোড়ার চেয়ে দামী ভাল জুতো কিনে দেব দাদা।

এবার ব্রজজ্যাঠা কেঁদে ফেলে বললেন, ওরে, শম্ভুকে তুই জানিস না গোপাল, সে যদি বলে—আমার সেই জোড়াটির চেয়ে ভাল জুতো আর হয় না, আমার সেই জোড়াটিই চাই?

তৎক্ষণাৎ নিত্যগোপালবাবুকে জুতো বের ক'রে দিতে হ'ল।

এর অনেক দিন পরে—আর একটি ঘটনা বলি। ব্রজজ্যাঠার তখন শরীর ভেঙেছে, আমার বাবার অনেক দিন আগেই মৃত্যু

হয়েছে। আড্ডা নাই। ব্রজজ্যাঠা তাঁর পাড়ার কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসেন। লোকজন থাকলেও বসেন, কেউ না-থাকলেও এসে বারান্দায় বেঞ্চে ব'সে থাকেন। যাঁর বৈঠকখানা তিনি জীবনে কৃতী ব্যক্তি, ধনী মানুষ। কিন্তু আকস্মিক পত্নী-বিয়োগে অহরহ মদ্যপান ক'রে—হয় প'ড়ে থাকেন, নয় প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সঙ্গে বৈষয়িক কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড কলহ করেন। ছেলে কলেজে তখন বি. এ. পড়ে। ঘটনার দিন সকালবেলা থেকেই পিতাপুত্রে বাদানুবাদ চলছিল। সকালে পিতা অনেকখানি প্রকৃতিস্থ ছিলেন, ছেলের প্রতিবাদের উত্তরে যুক্তিপূর্ণ কিছু বলতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। ছেলে বেঞ্চে ব'সেই রইল। তারপর সেও উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান ক'রে বাপ ফিরে এলেন। দেখলেন, বেঞ্চে ছেলে ব'সে রয়েছে। তিনি কিন্তু ছেলে নন, তিনি আমার ব্রজজ্যাঠা। ভদ্রলোকের ছেলে উঠে যাবার পর তিনি এসে চুপ ক'রে একলাটিই ব'সে আছেন। ক্রোধে মদ্যপানে আত্মহারা ভদ্রলোক একেবারে জুতো খুলেই ছেলেভ্রমে ব্রজজ্যাঠাকেই প্রহার করতে শুরু করলেন, তবে রে ব্যাটা হারামজাদা, তবে রে নচ্ছার—ব্রজজ্যাঠা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন. তারপর হাত তুলে নিজের দাড়ি দেখিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, ও অমুক, আমি—ওরে, আমার পাকাদাড়ি ! ওরে, তোর অপরাধ হবে !

ভদ্রলোক দাড়ি দেখেই থেমেছিলেন। তার পরই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রজজ্যাঠা তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোকের মৃতা পত্নীর নাম ধ'রে—আঃ, তুই এ কী ক'রে গেলি মা! হায়-হায়-হায়! সোনার মানুষ, এ কী হয়ে গেল তোর বিহনে !

বজ্রজ্যাঠা বাংলা দেশের পোষ্টাপিসের কাজে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প বলতেন। মানকরের কদমা, দুবরাজপুরের বাতাসা, সিউড়ির মোরব্বা, কাঁদির মনোহরা, জয়নগরের মোয়া, গুপ্তিপাড়ার মণ্ডার গল্প ছেলেবেলায় ব্রজজ্যাঠার মুখেই

শুনেছিলাম। দুধ দই ঘি মাছ মাংস ইত্যাদির দর পর্যন্ত মুখস্থ ছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন সাধুর কত বড় জটা দেখেছেন, কোন মিঞা সাহেবের কত লম্বা দাড়ি দেখেছেন, কোন জমিদারের বাড়ীতে কত বড় ও কত ভয়ালদর্শন কুকুর দেখেছেন, সেগুলি নিখুঁত-ভাবে বর্ণনা করতেন।

কেদার চাটুজ্জে গল্প বলতেন। ইনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাই। ঘরজামাই ছিলেন না, তবে তাব নিজের পৈতৃক ভিটা গুপ্তিপাড়ার সঙ্গেও সম্ভবত বিশেষ সংশ্রব ছিল না। ইংরাজী-জানা মানুষ, সরকারী আবগারী বিভাগের সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং নিজেও ছিলেন আবগারী বিভাগের একজন সত্যকার পৃষ্ঠপোষক। অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই মধ্যে মধ্যে সাস্পেণ্ড হ'তেন। সস্পেণ্ড হ'লেই লাভপুরে এসে উঠতেন। শ্বশুরও ছিলেন সেকালের তান্ত্রিক। ঝাকড়া চুল, ঝাকড়া দাড়ি-গোঁফ; মুখে বিচিত্র শব্দ করতে পারতেন—বাঁশীর শব্দ, জন্তু-জানোয়ারের শব্দ, মন্ত্রতন্ত্র জানতেন, কুকুর কামড়ালে বিষ ঝাড়তেন, সাপের বিষের মন্ত্র জানতেন, চব্বিশ ঘণ্টাই না.কর একটা রন্ধ্রে একটা পাথর রেখে এক রন্ধ্রেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতেন। সমস্ত দিনই প্রায় একটা গাইয়ের দড়ি ধ'রে তাকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। জামাইয়ের সঙ্গে খুব বনাবনতি হ'ত না শ্বশুরের। উভয়ে প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। জামাই এসে শ্বশুরবাড়ীতে উঠলেও খাওয়ার সময় এবং শোবার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টা থাকতেন আমার বাবার আড্ডায়। তাঁর ছিল বড় বড় গল্প। রাজা-উজীর আমীর-ওমরার কথা। লোকে বিরক্ত হ'লেও কিছু বলত না। অমুক দাদা কি অমুক কাকার জামাই, তাকে কি কখনও কিছু বলা যায়! সেকালের সমাজের এই ছিল প্রথা। জামাই, বিশেষ করে কুলীন-ঘরের জামাই, তার সব দোষ শত ঔদ্ধত্যও ছিল মার্জনীয়।

আর প্রায়ই আসতেন সাধু সন্ন্যাসীর দল। গ্রামে আমাদের একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ ব'লে খ্যাত ফুল্লরা দেবীর স্থান

পবিত্র তীর্থ, শাক্ত সাধু-সন্ন্যাসী প্রতিদিনই দু-চারজন আসতেন যেতেন।

দু-একজন কিছু দিন ধ'রেই থাকতেন। কেউ সাধনা করতেন, কেউ দিন গুজরান করতেন দেবস্থলের প্রসাদান্নে। এঁদের মধ্যে আসতেন পর্যটক সাধুর দল। ফুল্লরা মহাপীঠে তাঁরা এলে আমাদের তারা-মায়ের আশ্রমে রামজী বাবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ত। বাবারও খ্যাতি ছিল সাধুপ্রীতির এবং শাস্ত্র-আলোচনার, সেই হেতু তাঁরা আসতেন আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা সাধু-ভোজন করাতেন। পশ্চিম-দেশীয় সাধুরা আমাদের বাড়ীর আতিথ্যে সত্য-সত্যই পরম পরিতৃপ্ত হতেন। তার কারণ পশ্চিম-প্রবাসী বাড়ীর কন্যা আমার মা তাঁদের ছাতুভরা রুটি তৈরি ক'রে অতিথি-সৎকার করতেন। পরম উপাদেয় খাদ্য; ছাতুখোর ব'লে যাঁরা পশ্চিম-দেশীয়দের ব্যঙ্গ করতেন সেকালে তাঁরাও এই ছাতুভরা রুটি খেয়ে বলতেন—ভাই হরিবাবু, আর একদিন ছাতুভরা রুটি খাওয়াতে হবে।

এই সাধুরা করতেন দুর্গম তীর্থস্থলের গল্প।

তাঁদের মুখেই ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, লছমন ঝোলাব দড়ির সাঁকোর কথা। মনে আছে,. শিশু-কল্পনাতেই দেখেছিলাম দু'দিকে খাড়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, দুই খাড়া পাহাড়েব মধ্যে অনেক নীচে গঙ্গা ব'য়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, সেই প্রচণ্ড বেগে—যে বেগে ইন্দ্রের ঐরাবত গিয়েছিল ভেসে। আর তার উপরে দড়ির পুল, দু'খানা পাশাপাশি দড়িতে কাঠের টুকরো লাগানো, মাথার উপরে আরো দুটো দড়ি, দড়ি ধরে দড়িতে বাঁধা কাঠে পা দিয়ে চলতে গেলে: দোলে, মানুষের মাথা ঘোরে। হাতের মুঠি খুলে গেলে পা ফস্‌কে গেল; মানুষ পড়ছে মাথা নিচু ক'রে নিচে, নিচে—আরও নিচে, তারপর আর দেখা গেল না। শরীর শিউরে উঠল। বলতেন, বদরী-. নারায়ণের কথা, কেদারমঠের ও যোশামঠের কথা, মানস-সরোবরের কথা, জ্বালামুখী কামাখ্যা-তীর্থের কথা।

পূজোর পর মাস-দুয়েকের মধ্যে আসতেন অনেক গায়ক। কাপড়ের

খোলে সযত্নে ঢাকা তানপুরা বগলে নিয়ে এসে উঠতেন। তাঁদের কারুর কাছে শুনেছিলাম তানসেনের গল্প। শুনেছিলাম, আকবরশাহ একদা তানসেনের প্রতিপক্ষের মুখে দীপকরাগ শুনে চমৎকৃত হলেন —গানের মহিমায় সমাদান-ঝাড়ে বাতি জ্ব'লে উঠল। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে বললেন—তানসেন যদি দীপক গায়, তবে আগুন জ্ব'লে উঠবে দাউ দাউ ক'রে। বাদশা ধরলেন তানসেনকে। তানসেন প্রথমে রাজী হন নি, অবশেষে বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। গাইলেন দীপক এবং আগুন জ্বলল, তাতেই তিনি পুড়ে গেলেন। যাঁদের মল্লার গেয়ে মেঘ এনে বর্ষণ করাবার কথা ছিল, তাঁরা তো তানসেনের মত সঙ্গীতসিদ্ধ ছিলেন না—কাজেই তাঁরা পারলেন না মেঘ এনে তাকে গলিয়ে বর্ষণ নামাতে। যে গায়কেরা আসতেন, গ্রামের প্রতিষ্ঠাবানদের বাড়ীতে তাঁদের বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। কোথাও এক টাকা, কোথাও দু'টাকা, কোথাও বা চার টাকা। অনেক বিভক্ত প্রতিষ্ঠাবান বংশের ঘরে—চার আনা আট আনা হিসাবে বৃত্তি পেতেন। গান শোনাতেন, গল্প শোনাতেন। পুরানো কালের গায়কদের গল্প, নূতন কালের গায়কদের গল্প। সেতারী আসতেন। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষী আসতেন। দেশের জ্যোতিষী, বিদেশের অপরিচিত জ্যোতিষী। এঁদের কাছেও গল্প শুনেছি। দুটো একটা গল্প মনে রয়েছে।

এক ছিলেন অভ্রান্ত জ্যোতিষী। তাঁর যেমন সূক্ষ্ম গণনা, তেমনই ছিল নির্ভুল বিচার। তাঁর এক কন্যা হ'ল পরমাসুন্দরী। কন্যার অদৃষ্ট গণনা ক'রে দেখলেন—অদৃষ্টে রয়েছে বাসর-বৈধব্যের যোগ। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অনেক ভেবে কঠিন সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটি যুগের ক্ষণ-লগ্ন গণনা ক'রে এমনই একটি দিন ও লগ্ন আবিষ্কার করলেন, যে লগ্নের এক অতি দুর্লভ গ্রহ-সমাবেশের ফলে এক অমৃতময় বিবাহযোগের সৃষ্টি হয়েছে। এমন পুণ্য লগ্ন বহু বর্ষ পরে আসে। যুগে একবার আসে। এ লগ্নে বিবাহ হ'লে বৈধব্য হতে পারে না। তিনি সেই লগ্নে কন্যার বিবাহ দিয়ে বিধিলিপি

খণ্ডন করবেন স্থির করলেন। নিজে বালিঘড়ি ধ'রে লগ্ননির্ণয়ের জন্য বসলেন। ক্ষণ গণনা ক'রে চলেছেন, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা কন্যা; মধ্যে মধ্যে নূতন আভরণগুলি নাড়ছেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী, তাঁর কন্যার বিবাহ; কত রাজা কত ধনী কত মহাজন আভরণ যৌতুক দিয়েছেন, মণি-মুক্তার আভরণ, তাতে বিভূষিতা হয়ে মেয়েটির আনন্দ হয়েছে প্রচুর, সেকথা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ মেয়েটি চকিত হয়ে ব'লে উঠল—যাঃ! তার গলার একটি মালা ছিঁড়ে গেছে! ঝরঝর ক'রে খ'সে প'ড়ে গেল মুক্তাগুলি। জ্যোতিষী চকিতের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। বালির পাত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। ঝুরঝুর ক'রে বালি ঝ'রে পড়ছে। তিনি বললেন, যাক। যেতে দাও। লগ্ন এল, বিবাহ আরম্ভ হ'ল।

জ্যোতিষী কঠিন হেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিধাতাকে বলতে চাইলেন, তোমার বিধান লঙ্ঘিত হবে, এর জন্য অপরাধী আমাকে ক'রো না। অপরাধ আমার নয়। যে বিদ্যা তোমার মানস-কন্যা, অপরাধ যদি হয়—অপরাধ তার। এ তারই প্রসাদ।

কিন্তু ওকথা বলা শেষ হয়-না তাঁর। আকাশের দিকে তাকিয়েই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একি! আকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র ঝলমল করছে, তারই মধ্যে তাঁর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে গ্রহ নক্ষত্র সংস্থানের অবস্থা; যেমন নাকি সমুদ্রতটের অসংখ্য শুক্তির মধ্যে মণিকার চিনতে পারে কোনটি কোনটি মুক্তাগর্ভ শুক্তি। ওই বৃষ, ওই মিথুন। কিন্তু যে-লগ্ন তিনি গণনা করেছেন তাতে চন্দ্রের তো এই রাশিতে অবস্থানের কথা নয়। এ সংস্থান তো সে-লগ্নের পরবর্তী কালের অবস্থান। পাগলের মত তিনি ছুটে গেলেন বালিঘড়ির কাছে। কি হ'ল! দেখলেন, বালু নির্গমনের নালিকার মধ্যে আশ্চর্যভাবে তখনও একটি মুক্তার অর্ধাংশ আটকে রয়েছে। বুঝলেন, তিনি যে মুহূর্তে চকিতের জন্য ফিরে তাকিয়েছিলেন—সেই মুহূর্তে একটি মুক্তা ভেঙে তারই আধখানা লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে ওই

নালিকার মধ্যে এবং আংশিকভাবে পথ রুদ্ধ ক'রে আটকে রয়েছে। তারই ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরিমিত বালুটুকু শেষ হতে অনেক বেশী সময় লেগেছে। লগ্ন সেই অবসরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাঁকে উপহাস ক'রে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পণ্ডিত প্রণাম করলেন নিয়তিকে। মনে মনে বললেন—আমার দম্ভকে ক্ষমা ক'রো। তুমি মহাশক্তি, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্য তুমি দশমহাবিদ্যার রূপ ধ'রে দেবাদিদেব মহাদেব মহাকালকে পরাভূত ক'রে আপনার পথে চ'লে যাও। মনে ছিল না আমার। ক্ষমা ক'রো আমাকে।

আর একটা গল্প—

এমনই আর এক জ্যোতিষী ছিলেন।

একদা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এক কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ। বললেন—শুনেছি নাকি তোমার গণনা অভ্রান্ত। তোমার দৃষ্টিতে সম্মুখে অহরহ নাকি গ্রহসংস্থান দৃশ্যমান রয়েছে। কোনো গ্রহেরই নাকি সাধ্য নাই তোমার দৃষ্টির বাইরে যেতে।

জ্যোতিষী হাসলেন—বললেন—গুরুর প্রসাদ এবং দেবী সরস্বতীর বর। কৃতিত্ব আমার নয়।

- ভালো। আমিও সামান্য চর্চা করি এই বিদ্যার। কিন্তু আমি কোনো-মতেই আজই ছায়াগর্ভসম্ভূত সূর্যতনয় মহাগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে পারছি না। বল তো পণ্ডিত, শনিগ্রহের অবস্থিতি এখন কোথায়?

পণ্ডিত খড়ি তুলে নিয়ে ছক এঁকে সামান্য গণনা ক'রেই পিছন ফিরে আগন্তুকের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে বললেন—এইখানে তাঁর অবস্থিতি।

মুহূর্তে তাঁর তর্জনীটি জ্ব'লে উঠে ভস্ম হয়ে প'ড়ে গেল। অট্টহাস্যে সাধুবাদ উঠল, সাধু—সাধু—সাধু! আগন্তুক কৃষ্ণ বিদ্যুতের মত দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আর-একবার এক জ্যোতিষী এসেছিলেন। বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল জ্যোতিষী। এসেই গ্রাম তোলপাড় ক'রে দিলেন। যিনি এলেন

তাঁকেই তাঁর নাম ধ'রে ডাকলেন, এস অমুকবাবু, কি অমুকচন্দ্র এস বাবা। তারপর বলতে গেলেন তাঁর জীবনকথা। যেন গড় গড় করে পড়ে যাচ্ছেন তার জীবনের খাতা। তিনি প্রথমে এসে উঠেছিলেন যাদবলালবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে। এক বেলার পর আমার বাবার সঙ্গে আলাপ হতেই এসে উঠলেন আমাদের বাড়ী। আমার বাবাকে বললেন—তুমি আমার পূর্বজন্মের পিতা। তারপর আমাদের বৈঠকখানা একেবারে জনসমাগমে ভরে গেল। অদ্ভুত জ্যোতিষী। যে-কোনো আগন্তুক এলেন—তাঁর অভ্রান্ত পরিচয় এবং জীবনকথা বলে গেলেন। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী। কারও অম্লশূলের ব্যাধি, তাকে বললেন—তোমার পেটে তিনটি বিচিত্র অন্ন আছে—একটির বর্ণ লাল, একটির নীল, অপটির কালো। মাদুলি দিলেন। সবশেষে যাদবলাল বাবুর বড় দৌহিত্র সম্পর্কে বললেন—সামনে কঠিন ফাঁড়া, মৃত্যুযোগ। শান্তির ব্যবস্থা হল, তন্ত্রমতে কালীপূজা ক'রে শনিগ্রহের শান্তি। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ গাইয়ের দুধের ঘি, এ ছাড়া নীলা স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি অনেক আয়োজন। গভীর রাত্রে পূজার ব্যবস্থা গ্রামপ্রান্তে নির্জনে। পূজা আরম্ভ হ'ল। শুধু দেবী এবং সাধক ছাড়া কেউ রইল না। রাত্রির শেষ প্রহরে দেখা গেল মাটির দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, আয়োজন সহ সাধক অন্তর্হিত। এ সত্ত্বেও সেকালের অনেকে বলেছিল—পূজা শেষ ক'রে সাধক স্বস্থানে চ'লে গেছেন। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ছাগটা চীৎকার করে বললে—উঁ-হুঁ উঁ-হুঁ।

আরও আসত লাঠিয়াল। প্রকাশ্য পেশায় লাঠিয়াল, গোপন পেশায় ডাকাত। এরাও বৃত্তি পেত, বৃত্তি ছাড়াও মধ্যে মধ্যে আসত, অভাব-অভিযোগ থাকলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসত পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল, পুলিশের অভিযোগ সত্য হ'লে সে-ক্ষেত্রে তারা আসত না। যে-ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা, সে-ক্ষেত্রেই তারা আসত। বলত—মিছে লাঞ্ছনা হবে হুজুর!

আবার নিজেদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকলে এদের ডাকা হ'ত। এরা

আসত কাপড় গামছা লাঠি নিয়ে। কাজ ক'রে বকশীশ নিয়ে চ'লে যেত।

এরই মধ্যে গল্প করত। ডাকাতির গল্প, দাঙ্গার গল্প। শিউরে উঠত মানুষ সে-সব গল্প শুনে। আমার রাত্রে ঘুম হ'ত না আতঙ্কে, তবু শুনতাম সেই গল্প। মনে আছে পোড়া শেখের ডাকাতির সব গল্প। পোড়া শেখ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল, তেমনি প্রকৃতিতেও ছিল নিষ্ঠুর। ও-অঞ্চলে তার জুড়ি ছিল না। ময়ূরাক্ষীর ওপারে অবশ্য ভল্লারা ছিল। তারা আজও আছে, এই অর্ধাহার অনাহারের দিনেও তাদের মধ্যে বীর্যবান আছে। জাতিতে অবশ্য ভল্লা নয়—তারাচরণ হাড়ি আজও আছে, ওই ওদেরই অঞ্চলের ওদেরই শিক্ষায় সে গ'ড়ে উঠেছে; তারাচরণ—বীর তারাচরণ। অল্পদিন আগেই ১৯৫০ সালেই আমাদের ও-অঞ্চলে একটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেছে। দোষ কার—সে সঠিক জানি না, তবে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানেরাই। অঞ্চলও মুসলমানপ্রধান। বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ওই সীমান্তটিতে মুসলমান প্রায় শতকরা সত্তরের বেশীই হবে—কম হবে না। হিন্দুদের গ্রামে তখন খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আক্রমণ সেই অবস্থায়। তারাচরণ ছিল সে-দিন সে-গ্রামে, একা তারাচরণই দাঁড়িয়েছিল লাঠি হাতে। ক্রমে পাশে অবশ্য লোক জমল কিছু। কিন্তু সে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক কম। তবুও তারাচরণ তাদের গ্রামে প্রবেশ করতে দেয়নি। তারাচরণের কথা থাক। পোড়া শেখের কথা বলি। পোড়া শেখ দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছিল। গিয়ে পড়েছিল এমন অঞ্চলে, যে-অঞ্চলে পাঞ্জাবী ডাকাতের প্রাদুর্ভাব এবং সাহেব-সুবার কুঠি ছিল। আজ মনে হয় রাণীগঞ্জের কলিয়ারী অঞ্চল হবে। পোড়া শেখ নাকি (পোড়াকে আমি দেখি নি) সেই পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মিশে সাহেবদের কুঠি লুঠতে গিয়েছিল। সে বলত—হ্যাঁ, মরদ বটে! সাহস বটে পাঞ্জাবীদের! আমি তাদের ফুঁয়ে উড়ে যাবার যুগ্যি। তবু আমার খেলা দেখে তারা সঙ্গে নিয়েছিল। বলত—

অন্ধকার রাত্রি, দু'পহর পার হয়েছে—আকাশে মেঘ। আ—আ—আ শব্দ ক'রে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল সব—বাঘের মত। ওদিকে কুঠির বারান্দা থেকে ছুটতে লাগল গুলি। হামাগুঁড়ি দিয়ে চলল। চারিদিকের দরজায় কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল। ভাঙল দরজা। সাহেবের বন্দুক চলছে, মেম গুলি ভরছে। কিন্তু চারপাশের দরজা ভাঙলে সে কি করবে? সাহেবকে কেটেছিল তারা। পোড়া বলত —আমি ছিলাম বাইরে, ফাঁক পেয়ে গেলাম ভেতরে ছুটে। এক জায়গায় দেখলাম, ছোট একটা সাহেবের মেয়ে, কানে মাকড়ি, প'ড়ে আছে ভয়ে বেহুঁশ হয়ে। খুলে নিতে সময় লাগবে, নিলাম পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে।

অসংখ্য ডাকাতির গল্প।

মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে উনান জ্বেলে কড়া চড়িয়ে তেল গরম ক'রে সেই তেল গায়ে ঢেলে দিত। কত সময় মানুষকে বেঁধে সেই তপ্ত কড়ায় বসিয়ে দিত। জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটত। মানুষের গলা আধখানা বা দু'ফাঁক ক'রে দিয়ে যেত। শড়কিতে গেঁথে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিত।

কত রাত্রি বাল্যকালে আতঙ্কে বিনিদ্র কাটিয়েছি—তার হিসাব নাই। মধ্যে মধ্যে এক-একটা সময় আসত, যখন দু-তিন মাসের মধ্যে তিন-চার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত। শৈশবের একটা স্মৃতি মধ্যে মধ্যে আজও মনে পড়ে। অন্ধকার রাত্রি, কাঁচা ধানভরা মাঠ, আর সেই মাঠের মধ্যে সঞ্চরমাণ কয়েকটা আলো দেখলেই মনে প'ড়ে যায় সে স্মৃতি।

সম্ভবত আশ্বিন মাস। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, পিসিমা উঠে বসেছেন, জানালা খুলেছেন, সভয়ে ডাকছেন—বউ—বউ—বউ!

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ছাদে যাচ্ছি আমি।

আমি তখনও কিছু বুঝি নি। এই মুহূর্তে একটা তীব্র আর্তকণ্ঠের চীৎকার কানে এসে ঢুকল। উঃ, সে কী চীৎকার! বজ্রপাতের চীৎকারে স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে যায় মানুষ, মরবার হ'লে ম'রে যায়

এক মুহূর্তে; কিন্তু এ চীৎকার যেন মানুষের শ্বাস রোধ ক'রে দেয় নিদারুণ আতঙ্কে। আকাশ চিরে গেল, বাতাসের পাথারে মাথা কুটে আছড়ে পড়ল সে চীৎকার। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। সে চীৎকারে ভয়ে কেঁদে উঠেছিলাম আমি। আমাদের বাড়ীর জানালা দিয়ে তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, গ্রামের দক্ষিণ মাঠ নিম্চের জোল। সেই জোলের উপরে জমাট অন্ধকার থর থর ক'রে কাঁপছে। আলো—অনেক আলোয় ভ'রে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন আলো সব ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর উঠল চীৎকার। মানুষের এমন প্রাণ-ফাটানো আর্তস্বর আর শুনি নাই। পরে শুনেছি সে চীৎকারে ভাষা ছিল —জান বাঁচাও! জান বাঁ-চা-ও!

আমাদের গ্রামের সিকি মাইল দক্ষিণে সিউড়ি থেকে কাটোয়া যাবার পাকা সড়ক চ'লে গেছে, সেই সড়ক দিয়ে- ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চ'লে গেল সেই আর্তনাদ। জান বাঁ-চা-ও! বিপন্ন প্রাণের সেই ভয়—সেই আকুতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে যে, ঘরে ঘরে মানুষ থর থর ক'রে কাঁপল। বুকের ভিতরটা চড় চড় ক'রে উঠল, গলা শুকিয়ে গেল। আবার তার জান বাচাবার জন্য মানুষ দলে দলে আলো হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি তখন গ্রামের পক্ষে বেশী হ'লেও আমাদের গ্রামের পক্ষে, বিশেষ ক'রে আমাদের বাড়ীর পক্ষে, বেশী নয়। রাত্রি এগারোটা সবে বেজেছে। বাবার মজলিস পুরোদমে চলছে। মা তখনও জেগে।

ছুটল মানুষ। কিন্তু দিগ্বিদিকহীন ভয়ার্ত হতভাগ্য সামনের পাকা রাস্তা ধ'রেই ছুটে চলেছে—ছুটেই চলেছে। নিতান্ত হতভাগ্য, গ্রাম ঠাওর করতে পারে নি। পাশের দু চারটে ঘন জঙ্গল গেছে, আশ্রয় নিতে সাহস করে নি। সামনেই ছুটে চলেছে। পিছনে তার ছুটে আসছে মৃত্যুদূতের মত পরস্বাপহারী ঠ্যাঙাড়ে; আমরা বলি 'মান্‌ষুড়ে'। আজ মনে হয়, মানুষ বাঘের মুখে সাপের মুখে তত ভয় পায় না, যত ভয় পায় হত্যাভিপ্রায়ে হিংস্র মানুষকে দেখে।

তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বোধ হয় মৃত্যুর ভয়ালতম রূপ। আক্রান্ত মানুষটির পিছনে ছিল ওই ভয়ালতম রূপ; তাই উন্মাদের মতই সে সামনে ছুটে চলেছিল। হতভাগ্য ভাবতে পারে নি, নিয়তি নদীর রূপ নিয়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে। সামনে ছিল নদী। আমাদের গ্রামের দেড় মাইল দূরে কুয়ে নদীর ঘাট—সেই ঘাটে সড়কে ছেদ পড়েছে। দিনে খেয়া চলে, রাত্রে জনহীন ঘাট। সেই ঘাটের উপরে উঠল আর-একটা মর্মান্তিক চীৎকার। তারপর সব স্তব্ধ। সকলে ছুটে গেল—ভয় নাই—ভয় নাই! গিয়ে দেখলে, জনহীন ঘাট, ঘাটের উপরে খানিকটা রক্তচিহ্ন। আর কিছু নাই। অনেক খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। শুধু দূরে ধানভরা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সঞ্চরমাণ ছায়ামূর্তির মত কয়েকটি কিছু যেন কেউ কেউ দেখেছিল। কিন্তু তারা ভয়ার্ত নয়, আলোর আশ্বাস তারা চায় না, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কোথায় সেই বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে, খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিন পাওয়া গেল—নদীর ঘাটের খানিকটা পাশে—দহের বুকে ঝুঁকে-পড়া একটা শ্যাওড়া গাছের মধ্যে একটি বিদেশী মুসলমানের মৃতদেহ।

পরে প্রকাশ পেল ঘটনাটি।

'বাম্‌নিগ্রাম' বহুকাল থেকে একদল 'মানুষুড়ে' মুসলমানদের জন্য কুখ্যাত। এ কাণ্ড তাদেরই। বিদেশী মুসলমানটি গরু বা মহিষ কিনতে এসেছিল পাঁচুন্দির হাটে। কাটোয়ার কাছে পাঁচুন্দি, কিন্তু তখন ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া-বারহারোয়া লাইন হয় নি। পাঁচুন্দি যাবার রাস্তা ছিল—লুপলাইনের আমেদপুর স্টেশনে নেমে ওই পাকা সড়ক। এই পাকা সড়কে আমেদপুর ও লাভপুরের মধ্যে এই বাম্‌নিগ্রাম। আমেদপুর হয়ে আগয়া নদীর ব্রীজ থেকে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী প্রান্তর। মধ্যস্থলে সুঁদীপুরের বটতলা, ঝুরি-নামা শিকড়ে বিশ-পঁচিশটি কাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, সে এক ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঠাঁই। দিনে সূর্যের আলো পড়ত না। সুঁদীপুরের বটতলার উল্লেখ আমার রচনায় আছে, "ডাকহরকরা" গল্পে "হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়"

'তামস-তপস্যা'য় আছে মনে পড়ছে। এই বটতলায় তারা রাত্রে পথিকের প্রতীক্ষা করত। বাঁশের খাটো লাঠি—মাটি ঘেঁষে সুকৌশল নিক্ষেপে প্রচণ্ড বেগে ছুটে পথিকের পায়ে আঘাত করত, পথিক প'ড়ে যেত। এরা ছুটে এসেই একটা লাঠি তার গলায় বা ঘাড়ে দিয়ে দুই প্রান্তে পা দিয়ে চেপে ধরত, অন্য একজন দু'জন পায়ে ধ'রে মানুষটাকে উল্টে দিত, মট্ শব্দ ক'রে ভেঙে যেত ঘাড়ের মেরুদণ্ডটা। তারপর অনুসন্ধান করত, তার কাছে কি আছে। এমনও শোনা গেছে যে, একজন মানুষকে হত্যা ক'রে পেয়েছে হয়তো চারটে পয়সা, আর তার পরনের জীর্ণ কাপড়খানা।

এই বিদেশী মুসলমানটিকে আমেদপুর থেকে—এই দলের একদল অপরাহ্নে ভুলিয়ে তার গাড়ীতে নিজের বাড়ী এনে তুলেছিল। স্বজাতি হিসাবে বিশ্বাস করেছিল সে। কিন্তু সন্ধ্যার পর লোকটি বুঝতে পেরেছিল এদের অভিপ্রায়। তাই এক সময়ে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে পথে প্রাণভয়ে ছুটেছিল। কিছুক্ষণ পর ষড়যন্ত্রীরা পালানোর কথা জানতে পেরে মুখের শিকার ফস্কানোয় হিংস্র পশুর মত ছুটেছিল তার পিছনে পিছনে। দুরন্ত মৃত্যুভয়ে হতভাগ্য সামনে দু'খানা গ্রাম পেয়েও তাতে ঢোকে নি। হয়তো গ্রাম ব'লে বুঝতে পারে নি। অথবা মানুষকেই আর বিশ্বাস করে নি। সে-দিন সে-মুহূর্তে কার উদ্দেশ্যে সে এমন ক'রে জান বাঁচানোর আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল—সে-ই জানে।

মানুষুড়ে মুসলমান দলটি আজ আর নাই। তাদের বংশই শেষ হয়ে গেছে। শুধু বামুনিগ্রামেরই নয়, আরও কয়েকখানা গ্রামের এই অপবাদ ছিল। আমাদের গ্রামের উত্তর-পূর্বে মাইল চারেক দূরে ধনডাঙার হিন্দুদের এ অপবাদ ছিল। মাইল আষ্টেক দূরে দাশকল গ্রামে হিন্দুদের এ দুর্নাম ছিল। শোনা যায়, এইখানে যে ছিল এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক, সে একদিন রাত্রে পথিকভ্রমে হত্যা করেছিল নিজের একমাত্র পুত্রকে। ছেলে চীৎকার ক'রে বলেছিল—বাবা, আমি, বাবা। . তার দেহখানা ঘুরিয়ে দিতে দিতে বাপ বলেছিল—

এ সময়ে সবাই বাবা বলে। আমার "আখড়াইয়ের দীঘি" গল্প এবং 'দ্বীপান্তর' নাটকের উদ্ভব এখান থেকেই। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদওয়ালা বাদশাহী সড়ক এখানেই; সেই সড়কের উপরে গাছতলায় ব'সে এক বৃদ্ধ বীরবংশীর মুখে এই পুত্রহত্যার কাহিনী শুনেছিলাম।

বজরহাট ব'লে একখানি গ্রাম আছে—মুসলমানের গ্রাম। ময়ূরাক্ষীর ওপারে। সেখানেও এই ব্যবসা ছিল। আমি নিজে একবার এই বজরহাট হয়ে যাচ্ছিলাম সাঁইথিয়া। সন্ধ্যার পর। পড়েছিলাম এদের হাতে। আমি ছিলাম বাইসিক্লের আরোহী, আর নিতান্তই ছিল পরমায়ু (এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা যায় না সে-দিনের সে বিচিত্র পরিত্রাণকে), তাই বেঁচেছিলাম। সে-কথা এখানে নয়।

লাঠিয়াল ডাকাত যারা, ঠিক এদের মত ছিল না। খুন তারা সহজে করত না। তারা এই মানুষ-মারাদের ঘৃণা করত। লাঠিয়ালের প্রকৃতি এবং মানুষুড়ের প্রকৃতিতেও প্রভেদ দেখেছি। লাঠিয়ালরা—ডাকাতরা অনেক ভালো। এদের কাছে গল্প শুনতাম। এমনি এদের কথা ভারি মিষ্টি। বলত - বুঝলেন বাবু, মদ খেছি গাঁয়ে মজলিস ক'রে; একজনা লোক, মাথায় গামছার পাগড়ি, হাতে আলানকাঠি, জাল বুনতে বুনতে এসে বসল। বললে—মদ দেবা খানিক? আমি ধীবর, যাব কুটুমবাড়ী, তা ভাই, মদ দেখে ভারি লোভ লেগেছে। তা বললাম—ব'স, খা। খেলে, আলাপ করলে, চ'লে গেল। দু'দিন পর এল পিঠে গামছায় বাঁধা পাঁচটা পাকী মদের বোতল আর এক বড় রুইমাছ নিয়ে। বললে—সেদিন তোমরা খাইয়েছ, আজ আমি খাওয়াই। বুয়েচেন না, ভারি খুশী হলাম। একদিন খেয়ে গিয়ে যেচে খাওয়াতে এসেছে লোকটা, খুশী হবারই কথা। তা আবার পাকী মদ। বুঝলাম, ধীবর মশায়ের পয়সা আছে। রাত-বিরেতে জাল ফেলে পরের পুকুরে রুই কাতলা ধরেন, পয়সার আর অভাব কি? ব'সে গেলাম খেতে। মাছ ভেজে বেশ আসর ক'রে বসলাম, সেও

বসল, কিন্তু নিজের কাজ ভুললে না। খেলে আর জাল বুনলে। গল্প করলে। আবার দিন-সাতেক পর এল। তা'পরে বলে—সোনা থাকে তো দাও, কিনব। মানে ডাকাতির মাল। আরও দুদিন এল। মদ, মাংস, গান খুব জ'মে গেল। তা'পরেতে কথাবার্তা। সোনা দোব ঠিক হ'ল। দিনও ঠিক হ'ল। ঠিক দিনে বুয়েচেন কিনা 'ক্যার্‌-ক্যার্‌' ক'রে গোটা গাঁ ঘেরাও। চারিদিকে লালপাগড়ি। আর সেই ধীবর মশায় ভোল পাল্টে গোয়েন্দা দারোগা। ও বাবা! এমন ধীবরের মত জাল বোনা, এমন ঢক ঢক ক'রে পচুই খাওয়া—এ দেখে কি ক'রে বুঝব বলুন যে, এ ধীবর নয়? তা আমরাও ঠকেছিলাম। তিনিও ঠকলেন। মাল কোথা পাবে—ঘরে কি থাকে? মাল পোঁতা আমাদের ময়রাক্ষীর ধারে, গাছের তলায়। তবু ছাড়ে না। নিয়ে গেল ধ'রে। মারপিঠ, নখে ছুঁচ ফুটানো, অনেক হ'ল। শেষে লোভ। অনেক ভাবলাম, তা'পরে বললাম—চল দেব দেখিয়ে। কিন্তু একা আমার সঙ্গে যেতে হবে। তাই রাজী। পিস্তল ঝুলিয়ে চলল। ময়ূরাক্ষীর বালিতে এনে এক জায়গা বেশ ক'রে খুঁড়লাম। বললাম—এইখানেই তো ছিল। কই? তা—। যা আচ করেছিলাম, ঠিক তাই হ'ল। দারোগা মনের আকুলিতে হেঁট হ'ল—"ছিল তো যাবে কোথায়?" ওই যেমন হেঁট হওয়া আর এক ঠেলা পেছন থেকে; মুখ থুবড়ে পড়ল সেই গর্তে। অমনি চাবুলে ধ'রে দিলাম বালি চাপিয়ে। পা দুটো থাকল বেরিয়ে। আমি টেনে দৌড়। তা বেটার ভাগ্যি, পরমায়ু্‌ আছে—একটা মেয়েছেলে দেখেছিল, নদীর ধারে ঘাস কাটছিল, সে ছুটে এসে বালি সরিয়ে ঠ্যাঙে ধ'রে টেনে বেটাকে বের করলে।

—তারপর?

—তা'পর আর কি! তা'পরে বছরখানেক পরে ধরা পড়লাম। ঠেলে দিলে চার বছর।

হা-হা ক'রে হাসত।

এই আমার কালের প্রথম জীবনের সেকাল। সেকালের—সেকালের এই রূপ। দেশে নূতন কাল তখন এসেছে, এসেছে কলকাতায়,

এসেছে তার আশেপাশের জেলায়, আমাদের জেলায় বোলপুরের প্রান্তে ভুবনডাঙায় শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সেখানে এসেছে, বোলপুরের পাশে বিখ্যাত লর্ড সিংহের রায়পুর, সেখানে এসেছে, কিন্তু সিংহবাড়ীর নূতন কালের মানুষেরা এ দেশ ছেড়ে কলকাতায় গেছেন। শান্তিনিকেতনের চারিপাশে তখন গণ্ডী টানা। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধের গণ্ডী টেনে এ দেশের লোক শান্তিনিকেতনকে পতিত ক'রে রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। প্রথম যেদিন সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়, যেদিন তিনি স্বর্ণ ডাইনির গল্প নিয়ে কথা বলেছিলেন সেই দিনেরই কথা।

ওই স্বর্ণের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধারা, কত বিচিত্র রীতিনীতি, কত বিচিত্র মানুষ, এঁরা তা দেখেন নি, দেখা দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারেন না। তুমি এদের দেখেছ। আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু দেখি নি। দেখবার সুযোগ পাই নি, দেখতে দাও নি তোমরা, আমাদের তোমরা পতিত ক'রে রেখেছিলে। পতিত শব্দটি তিনিও ব্যবহার করেছিলেন।

আবার এর একটি বিপরীত দিকও আছে। নূতন কালের মানুষেরা পুরানো কালের মানুষদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

এক দিকে ছিল ক্ষোভ থেকে অদ্ভুত উপেক্ষা।

অন্য দিকে ছিল পীড়িতচক্ষু মানুষের আলোক-ভীতির মত বেদনা-দায়ক বর্জন-প্রবৃত্তি।

একটা নদীরই মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চড়া, চড়ার দুধারে ব'য়ে যাচ্ছে দুটি স্রোত। একটির সম্মুখে পথের সন্ধান নাই, অপরের সম্মুখে পথের সন্ধান এবং জীবনের গতি। কিন্তু দুটি একত্রিত না হ'লে জলস্রোত সে-বেগ সঞ্চারিত হবে না, যে-বেগে সম্মুখের যে-ভূমিতলে পথের দিশা আছে, সে-ভূমিতলকে কেটে আপন গর্ভপথে পরিণত ক'রে তারই বুক বেয়ে ধেয়ে যেতে পারবে জীবনস্রোত সাগরাভিমুখে।

না। সেকালের সেকাল আরও আছে। আছে অবশ্য অনেক কিন্তু যেটুকুর কথা মনে পড়ে গেল, সেটুকু না বললে সেকালের অনেকটাই অপ্রকাশ থেকে যাবে।

আগে কিছুটা বলেছি। বলেছি, বাখারে গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে বড় বড় বলদ ছিল, দুধালো গাই ছিল, গ্রামে বড় বড় পুকুর ছিল—পুকুরের গভীরতা ছিল, জল ছিল অথৈ, সে অথৈ জলে পুকুরভরা মাছ ছিল, বাড়ীর ক্ষেতে-খামারে শাক ছিল, সব্জি ছিল, ঘরে কাঁসা-পিতলের বাসন ছিল, রূপার বাসনও ছিল দু'দশ জনের ঘরে। আরও ছিল—আকাশে মেঘ ছিল, সে-মেঘে জল ছিল। অনাবৃষ্টি তখন কম হ'ত। তখন বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত। আমার মনে আছে, ১৩১৩ সালে আমাদের অঞ্চলে 'আকাড়া' অর্থাৎ অনটন হয়েছিল। টাকায় তেরো সের চাল হয়েছিল; কাঁচি ৬০-এর ওজনের তেরো সের আজকের ৮০-র ওজনের দশ সের তিন পোয়া। আজকের ওজনের এক সের চালের দাম হয়েছিল ছ পয়সা। পরবর্তী কালে জেলার বৃষ্টিপাতের খতিয়ান দেখেছিলাম, তাতে দেখেছি সে-বার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৪০ ইঞ্চির কিছু বেশী। আজ সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয়েছে ৩০ ইঞ্চি থেকে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত, যে বৎসর খুব বেশী বর্ষা হয়, সে-বার হয়তো ৪৫ ইঞ্চিতে পৌঁছোয়। তাই বলছি, আকাশে মেঘ ছিল, মেঘে জল ছিল। আমার 'গণদেবতা' বইয়ে আমি লিখেছি, গ্রাম্য বৃদ্ধ দ্বারিকা চৌধুরী গ্রামে আটকবন্দী যতীনের সঙ্গে আলাপ করতে এলে যতীন তাকে বলেছিল—"সেকালের গল্প বলুন আপনাদের।"

—গল্প? হ্যাঁ, সেকালের কথা একালে গল্প বইকি। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি তাই বলব, সেও তাঁদের কাছে হবে গল্প। সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, ক্রিয়াকর্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, পথের ধারে মাঠের মধ্যে পথিকের ছায়ার

জন্যে, চাষীর ছায়ার জন্যে গাছ প্রতিষ্ঠে করতাম; মানুষে, জীব-জন্তুতে জল খাবে ব'লে পুকুর প্রতিষ্ঠে করতাম, সরোবর দীঘি কাটাতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে করতাম, তাঁর প্রসাদে ঘরে নিত্য অতিথিসৎকার হ'ত। মহাপুরুষদের ঈশ্বরদর্শন হ'ত। তাঁদের আশীর্বাদ পেতাম। এই আমাদের সেকাল।

সে তো আজ আপনাদের কাছে গল্প মনে হবে গো!

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরী মশায়?

—আমার ভাগ্য ভাঙা বাবা। ভাঙা ভাগ্যের ঝুড়ি ভাঙা, কোদাল ভাঙা, মাটি কাটা যায় না, কোনোমতে খুঁড়লেও ভাঙা ঝুড়িতে তুলে ফেলা যায় না। তবে আমার বাবা দীঘি কাটিয়েছিলেন; তখন আমি ছোট, আমার মনে আছে। এক ঝুড়ি মাটি কাটত একজন, বইত একজন। দশ কড়া কড়ি ছিল দাম। মানে আধ পয়সা। একজন লোক ব'সে ব'সে ঝুড়ি গুণত, কড়ি দিত। বিকেলে কড়ি দিয়ে পয়সা নিয়ে যেত।

- আধ পয়সা ঝুড়ি?

এ আমি কল্পনা ক'রে লিখি নি। এই সেকালের কথা। আধ পয়সা ঝুড়ি মজুরি, ওদিকে দু'টাকা মণ চাল। টাকায় চব্বিশ সেরও দেখেছি আমি। দুধের সের ছিল দু'পয়সা। হিসেব ছিল "পাই" অর্থাৎ আধ সেরের—এক পয়সায় এক পাই দুধ মিলত।

মায়েরা ছেলেদের চাঁদ ধ'রে দেবার জন্যে চাঁদকে লোভ দেখিয়ে ডাকতেন—

"আয় চাঁদ আয় আয়
বাটি ভ'রে দুধ দোব
রূপোর থালায় ভাত দোব
রুই মাছের মুড়ো দোব
সুখশয্যে পেতে দোব
চাঁদ তুই সুখে নিদ্রা যাবি—
আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে
ছায়ায় ছায়ায় যাবি।"

ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসীকে ডেকে বলতেন –

"ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যাও।
বাটা ভ'রে পান দেব গাল পুরে খাও॥"

আবার ছেলে ভুলাবার, ছেলে ঘুম পাড়াবার অন্য ছড়াও আছে, সে ছড়া সম্ভবত সেকালের হরিজন সম্প্রদায়ের মায়ের রচিত—

'আয় রে ঘুন যায় রে ঘুম বাউরীপাড়া দিযে
বাউরীদের ছেলে ঘুমালো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।"

ঘুম যদি জেলেপাড়া দিয়ে যেত, তবে ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুমাত। যদি যেত ডোমপাড়া দিয়ে তবে ঘুমাত টোকা বা ঝুড়ি মুড়ি দিয়ে। দরিদ্র ছিল। এখনকার তুলনায় ঘর-দুয়ারে, অবস্থায়, পরিচ্ছদের ব্যবস্থায়, আভরণের ব্যাপারে সেকালের দারিদ্রকে অতি নিষ্ঠুর মনে হবে। আজ আমাদের হরিজনদের ঘর-দুয়ার অনেক ভালো, দরজা-জানালা আছে, অনেকে মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতলা করেছে, বাইরে বারান্দায় কলি ফেরানো অর্থাৎ চুন দেওয়া হয়েছে, দরজায় আলকাতরা মাখানো হয়েছে। সেকালে ঘর ছিল খুপচি, হয়তো চার কোণে মানুষের মাথায় চাল ঠেকত; জানালা দূরে থাক, দরজাও সর্বক্ষেত্রে থাকত না, থাকত আগড়। একখানিই ঘর, তাব এক দিকে হেঁসেল, এক দিকে হাঁস-মুবগী, মাঝখানে শু'ত মানুষ। আজ মুরগী হাঁস আলাদা থাকে, রান্না বাথবার জায়গা আলাদা, মানুষেরা শোয় অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ার তক্তাপোশে, বিছানাও তাদেব ভালো। সেকালে দরিদ্র পুরুষেরা সাত হাত কাপড় পরে নগ্নপ্রায় হয়ে বেড়াত, মেয়েরাও পরত তাঁতের খাটো সাড়ে আট হাত শাড়ি। আজ দশ হাত শাড়ি জামা সেমিজ পরে। যুদ্ধের পরে হাফপ্যাণ্ট যথেষ্ট আমদানি হয়েছে। সেকালে মেয়েদের আভরণ ছিল রূপাদস্তার বালাকাটা ব'লে একটা গয়না। কারুর গলায় পিতলের 'মুড়কিমালা' —মোটা কস্তায় মাদুলি গেঁথে তারই মালা; আর কারও কারও থাকত সরষের মত গোল একদানা সোনার নাকছবি। আজ মেয়েরা রূপোর গয়না তো পরেই, অধিকাংশেরই হাতে তামার উপর

সোনার পাত মোড়া শাঁখাবাঁধা আছে। সোনার বেশ মানানসই নাকছবি সকলের নাকেই আছে—কারও নাকে হরতন, কারুর চিড়িতন, কারও একটা ইংরাজী অক্ষর, কারুর কারুর সোনার নাকছবিতে ওপেল পাথর কি ছোট কবির টুকরো দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মাথায় রূপোর কাঁটা, কানে সোনার টাপ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। সেকালে রাত্রে অধিকাংশ ঘরেই আলো জ্বলত না। কেরাচিনি (কেরোসিন) তেলের একটি ডিবে আর একটি 'খরবাকৃসো' বা 'জেশলাই অর্থাৎ ফায়ার বক্‌স বা দেশলাই থাকত বিপদ-আপদের জন্য, তাতে অন্তত একটা মাস চ'লে যেত। তাদের কেউ কেউ নিমের ফল কুড়িয়ে জড়ো করত। জেলেদের পাড়ায় এটি ছিল প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। নিমের ফল কুড়িয়ে ঘানিতে পিষিয়ে তেল তৈরি ক বে সেই তেলে প্রদীপ জ্বালানো হ'ত। আজ প্রত্যেক ঘরেই হ্যারিকেন হয়েছে, ডিবেও আছে, আলো নিয়তই জ্বলে। নিমফল অবশ্য ছেলেরা এখনও কুড়িয়ে তেল পিষিয়ে নেয়। সমস্ত দিন জলে কাজ ক'রে এসে এই নিমতেল তারা গায়ে মাখে চর্মরোগ নিবারণের জন্য। তুলনায় সেকালের দারিদ্র শোচনীয় ছিল মানুষের কিন্তু তবুও সেকালে অনাহার, অর্ধাহার ছিল না, একালে অবস্থার এই উন্নতি সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে তাদের অনাহার ঘটে। সেকালের ব্যবস্থায় এদের সঙ্গে মধ্যবিত্তদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ এবং অন্তরঙ্গতা ছিল। বিচিত্র এবং মধুর সে-যোগ ও অন্তরঙ্গতা। এক-একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের সঙ্গে কয়েকটি ক'রে দরিদ্র পরিবারের এই সম্পর্ক ছিল। প্রায় পুরুষানুক্রমিক যোগ।

আমাদের বাড়ীর সঙ্গেও এমনি যোগ ছিল গুটি কয়েক পরিবারের। তাদের মধ্যে 'ধাত্রী দেবতা'র শিবুর অনুচর শম্ভু বাউরীদের বাড়ীই প্রধান। শম্ভুর পিতামহ থেকে তারা আমাদেব বাড়ীতেই কাজকর্ম করে। শম্ভুর পিতামহকে আমি দেখি নি। তার পিতামহী মোনা—নাম ছিল মনোমোহিনী—তাকে আমি দেখেছি। ভোর-না-হতেই মোনা এসে হাজির হ'ত। এসেই ঘর-দুয়ার উঠান থেকে চারিপাশ

সাফ করত, জল দিয়ে ধুয়ে দিত। কালো পোকা-খেগো চেহারার মত বুড়া মোনা এসেই প্রথম বকত বাড়ীর ঝিকে। তারপর চাকরকে, তারপর রাঁধুনীকে, তারপর কখনও কখনও আমার মাকে। শুধু বকতে সাহস করত না আমার পিসীকে। বকত বাড়ীর বিশৃঙ্খলার জন্য, অব্যবস্থার জন্য।

বলত—হা টে, (অর্থাৎ হ্যাঁ লা) টুকুচি শাসন করতে লারিস (পারিস না) ওই ঝিচাকরগুলানকে? অমুনি অব্যবস্থা! দেখ্ দেখ্, তোর কটা কটা চোখ দুটো তো খুব ঝকমকে, বলি আপচোটা (অপচয়) একবার দেখ্। জিনিস ফেলেছে দেখ্।

মা হাসতেন। মোনা বা তার সম্প্রদায়ের সকলেই 'আপনি' ব'লে কথা বলতে জানে না, এ কথা নয়। বাবা যদি ডাকতেন, মোনা! তৎক্ষণাৎ মোনা হাত জোড় ক'রে উত্তর দিত—আজ্ঞে বাবা, আজ্ঞা করুন।

মোনা আমাদের শাসন করত। আমাকে কম। কিন্তু আমার মেজ ভাই আমার বোনকে শাসন তো করতই, প্রহারও করত।

ছেলেবেলায় চার-পাঁচ-বছর পর্যন্ত আমাদের এদের বাড়ীতেই কাটত। এরাই মানুষ করত। সকালবেলায় নিয়ে যেত, এগারোটা নাগাদ ফিরিয়ে আনত, তারপর নিয়ে যেত আবার বেলা তিনটেতে। সন্ধ্যো হ'লে বাড়ী দিয়ে যেত। ওদের অন্ন-ব্যঞ্জন অনেক পেটে আছে আমাদের।

মোনার একটা কথা ভারি কৌতুককর। সে ব্যাঙকে ভয় করত যমের মত। তার ধারণা ছিল ব্যাঙের বিষেই সে মরবে। ব্যাঙ দেখলে মোনা ভয়ে আতঙ্কে বু-বু তি-তি শব্দ ক'রে লাফাতে আরম্ভ করত। অকস্মাৎ বড় ব্যাঙের সামনে পড়লে তার চোখের দিকে চেয়ে যেন আতঙ্কে জ'মে পাথর হয়ে যেত।

মোনার ছেলে গোষ্ঠ আমাদের বাড়ীতেই গরুর পরিচর্যা করত। সে মারা গেলে তার তিন ছেলে সতীশ, মতিলাল, শম্ভু—সকলেই প্রথমে রাখাল, তারপর মাহিন্দার, তারপর কৃষাণ ও ভাগ জোতদারের কাজ করেছে। সতীশের পুত্র 'লেড়ো', সেও কাজ করেছে।

মোনা মারা গেল। তারপর মোনার পুত্রবধূ তার কাজ করতে লাগল। সতীশের মাকে আমরা 'সতের মা' বলতাম। সতের মা সে-দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। শেষ বয়সে কাজ করতে পারত না, তার পুত্রবধূ 'সতের বউ' তখন কাজ করত।

সতীশের মায়ের কী অধিকার আমাদের উপর! তার সে-অধিকার অনস্বীকার্য। অকপটে বলছি, সে-অধিকার স্বীকার করতে কোনো-দিন একবিন্দু গ্লানি অনুভব করি নি। এসে দাঁড়াত সতের মা, বলত—বলি হাঁগো, তুই ইসব কি করছিস? লোকে বলছে—তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে? সাহেবদের সঙ্গে ল্যাই (কলহ) করছিস! একজনা বললে—জ্যালে ভ'রে তো দেবেই, গুলি ক'রে না দেয় তো ভালো।

ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল সতের মা।

ইদানীং যখনই কলকাতা থেকে বাড়ী যেতাম তখনই স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত সতের মা, বলত, বাবা এলি? অঃ, আচ্ছা পাষাণ বটিস বাবা। আঃ, মুখ মনে পড়ে না রে! দাঁড়া খানিক দেখি।

আমি জেলে থাকতে শম্ভু মধ্যে মধ্যে রওনা হ'ত সিউড়ি, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা সে করবেই। কিন্তু খানিকটা পথ যেতে যেতে তার সাহস চ'লে যেত, পুলিশ এবং সাহেবদের ভয়টা উঠত বড় হয়ে, ভগ্নমনে বাড়ী ফিরে কাঁদতে বসত।

অন্য দিক দিয়ে আমাদের বাড়ীতে তাদের অখণ্ড অধিকার ছিল, অংশীদার বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিপদে, রোগে, দুর্ভিক্ষে, শ্মশানে পর্যন্ত পরস্পরের সহযোগিতা ও আত্মীয়তা ছিল প্রসারিত। আমাদের খড় তাদের ঘর ছাওয়াতে দিতে হ'ত, তাদের জ্বালানি—সেও আমাদের বাড়ী থেকে যেত; আমাদের পুকুরের মাছ তারা নিত্য ধরত, আমাদের ডাক্তার তাদের দেখত। বাড়ীতে মাছ এলে তাদের ঘরে যেত। আমাদের পুরানো জামা-কাপড় পছন্দ ক'রে নিয়ে যেত।

শুধু সংযুক্ত হরিজন পরিবারটিই নয়—গোটা পল্লীর ভারই সমগ্রভাবে মধ্যবিত্তদের উপর ন্যস্ত ছিল, অবশ্য কর্তব্যরূপে সে-ভার তাঁরা বহন করতেন।

কোনো হরিজন পরিবার অনশনে থাকত না। সেকালের গৃহিণীরা বেলা তিনটে নাগাদ বের হতেন এই পল্লী-ভ্রমণে। দেখতেন সকলের চালের দিকে চেয়ে, কার চালের উপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, কার চালের উপর ধোঁয়া নাই। ঘরের ভিতর উনোন জ্বললে, চালের খড়ের উপর দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। যার ঘরের চালের উপর ধোঁয়া উঠছে না, তার উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতেন—কি, তোর আজ আখা (উনান) জ্বলে নাই কেন রে?

সঙ্গে সঙ্গেই কারণের প্রতিবিধান হ'ত। পুরুষ অসুখে পড়েছে, ঘরে চাল নাই—ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে, চাল দেওয়া হয়েছে। মেয়ের অসুখ হয়েছে, রাঁধবার লোক নাই, ঘরে পুরুষ নাই, ছেলেরা ছোট—সে ক্ষেত্রে ছোট ছেলেদের ডেকে ভাত দেওয়া হয়েছে। দুধ গিয়েছে, তৈরী সাগু গিয়েছে।

বেলা দুটোর পরই ওদের মেয়েরা নেমে যেত পুকুরে, মাছ ধরত—শোল মাছ, ল্যাটা মাছ। বিনা মাছে তারা ভাত খেত না। মধ্যবিত্তের বাগানে শুকনা কাঠ আহরণ করতে বের হ'ত প্রত্যহ সকালে। কাঠ ভেঙে আনত প্রচুর পরিমাণে। এ সব ছিল তাদের জীবনের অধিকারভুক্ত।

তাল গাছের পাতা এবং ফল—এতে ছিল ওদের অধিকার। গ্রামের ভিতরের গাছের তাল কেটে খাওয়া সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ ছিল। এই তাল পাকলে ওরা কুড়িয়ে খেত, পেড়ে খেত।

ওরা অস্পৃশ্য ছিল, তবু মানুষের হৃদয়ে ওদের প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ। আমার মেয়ে বুলু যেদিন মারা যায়, সেদিন সতীশের মা আমার স্ত্রীকে আমাকে যে অসঙ্কোচ অধিকারে স্পর্শ করেছে সে-কথা স্মরণ ক'রে এ-কথা লিখতে আমার দ্বিধা হচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে এদের দৃষ্টিতেই সেদিন দেবতার ভোগ নষ্ট

হ'ত, এদের সঙ্গে একটা লম্বা খড় কি দড়ির সংস্পর্শে স্পর্শদোষ হ'লে প্রাপ্তবয়স্কেরা স্নান করেছেন। এদের বাস্তুতে এরা শুধু বাস করবারই অধিকারী ছিল, ভূমিতে কোনো অধিকারই ছিল না। এরা সে বাস্তুর উঠানে গাছ লাগাত, বাড়ীর পিছনে বাঁশ লাগাত, সে গাছ, সে বাঁশঝাড় আমার হয়েছে। একটি ডাল কি একটি বাঁশের প্রয়োজনে আমার কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াত। ওরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে হীনকুলে জন্মাপরাধে ওরা সত্যই অস্পৃশ্য। পরবর্তীকালে যখন সমাজসেবার ব্রত নিয়ে ওদের বুঝাতে চেয়েছি যে, অস্পৃশ্যতা মানুষের সৃষ্টি, বিধাতার নয়—তখন ওরা শিউরে উঠেছে, আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছে। উপরের কথাগুলির সঙ্গে মনে পড়ছে—সেকালের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক যত ক্লেদ সমস্ত নিক্ষেপ করেছে তারা ওদেরই জীবন-পাত্রে, সে জীবন-পাত্র বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে। ওদের যুবতী বধূ-কন্যাদের প্রলুব্ধ ক'রে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যে—চার আনা আট আনার বিনিময়ে ভ্রষ্ট করেছে—ভোগ করেছে। এমনও হয়েছে যে, গভীর রাত্রে নেশার তাড়নায় কামোন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জ হল্লা ক'রে ওদের পল্লীতে প্রবেশ করেছে, লাথি মেরে ঘরের আগড় বা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে, ভীত স্বামী বা পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, বাড়ীর গৃহিণী কর্তার পৌরুষের লজ্জাকে ঢেকে নিজের নারীজনোচিত লজ্জার মাথা খেয়ে সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে বা বিনা দক্ষিণাতেই বধূ বা কন্যাকে সমর্পণ করেছে ভদ্রজনের হাতে। কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছে, তবে শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিযোগকারীকেই ঘৃণাভরে কঠিন শাসন ক'রে উত্তর করেছেন—নিজের ঘর শাসন কর হারামজাদা। আর কারও ঘরে না গিয়ে তোর ঘরেই গেল কেন? আমরাই এদের সমগ্র নারী-সমাজকে এমন ক'রে তুলেছি যে, এরা ক্রমে হয়ে উঠেছে জন্মগত স্বৈরিণী। চারিদিকের সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যাধিগ্রস্ত

ক’রে তুলেছে। বছর কয়েক আগে আমি হিসাব ক’রে দেখেছি, এদের শতকরা ষাটটি বাড়ী আজ সন্তানহীন। আলো বেশী কি অন্ধকার বেশী বিচার করতে চাচ্ছি না। শুধু স্মরণই করছি সেকালকে।

এদের বিপদে সেকালে সাহায্য করেছি, রোগে ডাক্তার দেখিয়েছি, অভাবে দান করেছি, ওরাও নিয়েছে—এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, স্বল্প অপরাধ ওদের ক্ষমা করলেও কি কঠিন শাসনই না সেকালে ক’রেছি আমরা! সে শাসন নয়, নির্যাতন।

প্রথমেই আমার বাবার কথাই বলি। পিতামহের শ্রাদ্ধে মাছ ধরানো হ’ল আমাদের পুকুরে। এক একটি মাছ পনরো সের থেকে বিশ সের চব্বিশ সের। জেলেরা টানা জালে মাছ ধরলে। মাছ তুললে কিন্তু একখানা মাছশুদ্ধ জাল জলে ফেলে রেখে এল সকলের অজ্ঞাতসারে। তার মধ্যে রইল একটা আঠারো সের মাছ। বাকি মাছ বাড়ী এল, জেলেরা সকলেই বাড়ী চ’লে গেল। বাড়ীতে ক্রিয়ার আয়োজন চলেছে, এমন সময় একজন চুপিচুপি খবর দিয়ে গেল, জেলেরা মাছ চুরি করেছে এবং সেই মাছ এনে কাটাকুটির আয়োজন করছে। হাটকুড়া জেলে এর পাণ্ডা, কীর্তি তারই। বাবা অগ্নিমূর্তি হয়ে বেত হাতে বেরিয়ে গেলেন একটা জনবিরল পথ ধ’রে, তার খানিকটা অতিক্রম করলেন একটা পুকুরের জলহীন অংশ ধ’রে। অকস্মাৎ গিয়ে উঠলেন হাটকুড়ার উঠানে। জেলেরা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। বাবা হাটকুড়াকে বেতের আঘাতে জর্জরিত ক’রে দিলেন। মাছ উঠিয়ে আনা হ’ল। বাবার শেষে খানিকটা অনুতাপ হ’ল, তিনি হাটকুড়াকে ডেকে এক টাকা বকশীশ দিলেন। এ আমার শোনা গল্প। আমার জীবনে আমি বাবাকে প্রহার করতে দেখি নি। তখন তাঁর ঘোর পরিবর্তন হয়েছে।

চোখে দেখেছি কত শাসন, আমাদের বাড়ীতে না হলেও আশেপাশে মাসে দুটো-একটা এ শাসন চলত। একবার দেখেছিলাম এক শাসন। স্মরণ ক’রেও শিউরে উঠি আজ।

হঠাৎ চামড়ার দর চ'ড়ে গেল। সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়ে উঠল চামড়ার ব্যবসাদারেরা। এরা সকলেই মুসলমান। চামড়া সংগ্রহ ক'রে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে হিন্দু সমাজের চর্মকারেরা বিক্রি করে। এরা চামড়া ছাড়িয়ে আনে ভাগাড়ে-ফেলে-দেওয়া মৃত জন্তুর দেহ থেকে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে আমাদের দেশে গরুই প্রধান।

হঠাৎ গরু মরতে শুরু হ'ল। গরুর পাল চারণভূমে যায়, ফিরে আসে—হঠাৎ অবস্থা দাঁড়ায় কলেরা-রোগাক্রান্ত মানুষের মত, ওষুধ খাটে না, ভাল চিকিৎসকও নাই—ম'রে যায়। বৈদ্যরা বললেন, বিষকাঁড় করেছে মশায়। অর্থাৎ বিষপ্রয়োগ করেছে, ঘাসের পাতায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

গরুর চারণভূমে যাওয়া বন্ধ হ'ল, কিন্তু তবু গো হত্যা বন্ধ হ ল না। চামড়ার ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রলুব্ধ দরিদ্র চর্মকারেরা তখন টাকার নেশায় পড়েছে। আবার ভয়েও বটে—ব্যবসায়ীরা ভয়ও দেখিয়েছে—এখন নিরস্ত হ'লে তারাই প্রকাশ ক'রে দেবে এ অপকর্মের কথা। তারা গ্রামের মানুষ, পথ দিয়ে যায় আসে; শাক তুলতে, কাঠ ভাঙতে কি কোনো অজুহাতে গ্রামের লোকের বাড়ীতেও ঢোকে, সুযোগ বুঝে গরুর খাবার জাবের মধ্যে বিষ মাখানো পাতা রেখে যায়, গরু খায়, মরে। আমাদের কয়েকটা গাই ম'রে গেল। সব চেয়ে ক্ষতি হ'ল আর একজন জমিদারের। তিনি তখনও প্রবল প্রতাপশালী জমিদারদের মধ্যে। দুর্দান্ত লোক। তাঁর বড় বড় হেলে বলদ ম'রে গেল, কয়েকটা গাইও গেল। বলদগুলি ছিল তাঁর শখের জিনিস। তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ধ'রে আনলেন চর্মকারদের। আমরা শুনলাম, তাদের শাসন করা হচ্ছে। দেখতে গেলাম লুকিয়ে। সে দৃশ্য ভুলব না। কয়েকজন বাঁধা রয়েছে গাছে। দু'জনকে হাতে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হনহন ক'রে এসে ঢুকলেন বৈঠকখানায়, আবার বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গীদের কেউ বললে—মদ খেয়ে তেজী ক'রে নিলে মন। দেখলাম, তিনি গেলেন, বেত

হাতে নিলেন, প্রহার শুরু করলেন। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম।

অথচ এই জমিদারটির মত এই সম্প্রদায়ের হিতৈষী রক্ষাকর্তা আর কেউ ছিল না। গ্রামে প্রবল মহামারী চলেছে, ভদ্রজনেরা সকলে গ্রামান্তরে স্থানান্তরে গেলেন। ইনি যান নি, এই হরিজন-পল্লীতে কলেরা চলেছে—তাদের জন্যই যান নি। ওদের দেখবে কে? কলেরার চিকিৎসা সেকালে ছিল না, ডাক্তারেরাও যেত না, তবু ওদের চাল দিতে হবে, অন্ন চাই; সব চেয়ে বড় কথা—সাহস দিতে হবে, তার লোক চাই। তিনি থাকতেন। একবার এমনি মহামারীতে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তিনি বললেন কি করব? ওদের ছেড়ে যাব কি ক'রে? তা কি হয়! শুধু ওই হরিজন সম্প্রদায়ই নয়—এ শাসন বিস্তৃত ছিল সমস্ত মজুরশ্রেণীর উপর, সমস্ত কৃষকশ্রেণীর উপর। আমাদের ওই অঞ্চলে মুসলমানেরা অধিক অবস্থায় পেশায় কৃষকশ্রেণীভুক্ত। তাদের উপর ঠিক এতখানি না চললেও কিছুটা চলত। আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুরপাড়া। তারপর পশ্চিমপাড়া। তার ওদিকে ব্যাপারীপাড়া। ব্যাপারী-পাড়ার পাশে ছোট গোগা, শেখপাড়া, একখানা গ্রাম পার হয়ে পুরানো মহুগ্রাম, কামারমাঠ, কলগ্রাম। এগুলি সব মুসলমানের বসতি। এক কালে ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান, তাই লোকে বলত—ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলে ভূমির অধিপতিই ছিলেন না, মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের আমার ছাড়পত্র আজও এঁদের বাড়ীতে আছে। নানকার নিষ্কর জমির ছাড়পত্র। মূল বংশের আর কেউ আজ নাই। আমার বাল্যকালেও কয়েকজনকে দেখেছি। মাথায় সাদা টুপি, সৌম্যদর্শন মুসলমান। কী মধুর ব্যবহার, কী মিষ্ট কথা! নিজেদের দলিজায় তক্তাপোশের উপর ব'সে থাকতেন, এক প্রসন্ন উদাস দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকতেন। কোথাও যেতেন না।

অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান-ক'রে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোনো মতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় অপর কোনো ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিল।

থাক সে-কথা।

মুসলমানেরা কিন্তু হরিজন কৃষক-মজুরদের মত এত নত ছিল না। থাকবার কথাও নয়। ইসলামের ওই গুণটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। চোখে দেখেছি যে, হরিজন কোনো কারণে ইসলাম অবলম্বন করলে কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিবর্তন ঘটে, সে মাথা উঁচু ক'রে চলতে শেখে।

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আধিপত্য ছিল জমিদার হিরণ্যভূষণবাবুর। তারপর সে-আধিপত্য আয়ত্ত করলেন নবোদিত ধনী যাদবলালবাবু। এই আয়ত্তে আনার উদ্যোগপর্বে ওই সব গ্রামের জমিদারির অংশ কিনলেন তিনি। তাদের প্রচুর কাজ দিলেন। বড় বড় ইমারত তৈরীর কাজে, দীঘি কাটার, জমি তৈরীর কাজে তাদেরই তিনি ডাক দিলেন। তারা এল এগিয়ে। তবুও তারা হিরণ্যবাবুকে ত্যাগ করলে না। তখন যাদবলালবাবুর বড় ছেলে এদের শাসন করবার জন্য উদ্যত হলেন। বেত হাতে নিলেন। ফলে একদা গুজব রটল, মুসলমানেরা এক হয়ে এর প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হয়েছে। তারা স্থির করেছে, অত্যাচারীকে হত্যা ক'রে ফেলবে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবু উপেক্ষা করলেন না গুজব, তিনি পুত্রকে সংযত করলেন, মুসলমানদের ডেকে সান্ত্বনাবাক্য ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এ অত্যাচার তিনি কোনোমতেই হতে দেবেন না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা নিয়েও কোনো বিরোধ সেদিন অনুভব করি নি। শুদ্ধাচারী হিন্দু-মুসলমানকে স্পর্শ ক'রে কাপড় ছাড়তেন। এ মুসলমানেরা জানতেন। তাঁরাও কোনোদিন হিন্দুর বাড়ীতে অন্নজাতীয় আহার্য গ্রহণ করতেন না। মধ্যে মধ্যে

সামাজিক নিমন্ত্রণে সিধা এবং ফল-মিষ্টান্নের আদান-প্রদান চলত।

তবু এ কথা বলব যে, বাহ্যিক প্রশান্ত প্রসন্ন এই সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন ছিল একটি ভেদ এবং বিরোধের সুর।

মনে পড়ছে এবারত হাজী এবং আব্বাস হাজীকে।

এবারত হাজী ভীমের মত বিশালকায় মানুষ। দুই ভাই প্রথম জীবনে মাটি কাটার কাজ করতেন। শুধু দেহের শক্তিবলেই বিস্তীর্ণ ভূমিলক্ষ্মীর অধিকারী হয়েছিলেন। শুনেছি, দুই ভাই পতিত জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেরা কোদালে কেটে মরা পুকুরের পাঁক ব'য়ে তাতে দিয়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। দুনিয়া সুদ্ধ লোকের চাচা ছিলেন। হজ ক'রে এসেছিলেন। মাথায় টুপি প'রে লুঙ্গির মত কাপড় প'রে, গায়ে চাদর দিয়ে আসতেন, আমাদের বাড়ীতে আসতেন, বাড়ীর ভিতর আসতেন—কই, পিসীমা কই?

আমরা ডাকতাম—চাচা।

উত্তর দিতেন—বাপ। ঘুরে তাকিয়ে বলতেন, আরে বাপ রে, বাপজান! ছোট হুজুর!

বলতাম, চাচা, সেইটি বল।

হা-হা ক'রে হেসে চারদিক চঞ্চল ক'রে তুলে বলতেন—খুব উঁচু গলায় লম্বা উচ্চারণে বলতেন, আমরা মু-স-ল-মা-ন, আমরা এ-তো ব-ড়ো—। নিজের হাতটা যতখানি ওঠে তুলে এবং নিজে খুঁড়িয়ে উঠে আরও খানিকটা উঁচু ক'রে দেখাতেন কত বড়। তারপর মিহিগলায় হাতের দুটি আঙুল জুড়ে একটি মটর বা সরষের আকার দেখিয়ে বলতেন—তোমরা হিন্দু এতটুকু। কথাগুলি দ্রুত উচ্চারণে ব'লে যেতেন।

এটুকু অবচেতন বিরোধের প্রকাশ। সমাজগতভাবে বিরোধ উপস্থিত হ'লে এর প্রকাশ্য প্রকাশ হ'ত। সেকালে কদাচিৎ হ'ত। তবু ছিল। এই আমার সেকালের সেকাল।

আমার কালের সেকালের আর একটি স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল

হয়ে রয়েছে। এর আগে তার দোষ বলেছি, গুণ বলেছি, যেমন চিনেছি তেমন বলেছি। এবার যেটি বলব সেটি সুন্দরের স্মৃতির শোভা। সেকালের ঘর দুয়ারের ছিল পরিচ্ছন্ন শ্রী। অপরূপ শ্রী ছিল। স্বাচ্ছন্দ্য সেকালে ছিল। কিন্তু একালে স্বাচ্ছন্দ্য অনেক স্থলে অনেক বেশীই আছে, সমারোহ একালে সর্বত্রই বেশী। কিন্তু স্বল্প আয়োজনে যে পরিচ্ছন্ন শ্রী সেকালে দেখেছি সে একালে নাই। নিকানো মাটির মেঝে—খড়ি রঙের আলপনা, নিকানো উঠান, নিকানো খামার, সবুজ সব্জিক্ষেত, ঘরের এক পাশে কিছু ফুলের গাছ—এই আয়োজনের সে শ্রী অপরূপ। আজ দালান হয়েছে, পাকা মেঝে হয়েছে, চেয়ার-টেবিল আসবাব হয়েছে, ফোটোগ্রাফে ছবিতে দেওয়ালে সাজানো হয়েছে; কিন্তু সে পরিচ্ছন্নতা নাই—সে নয়নমনোরম শ্রী নাই।

ফুলের বাগান—অন্ততপক্ষে কয়েকটি ফুলের গাছ সব বাড়ীতেই ছিল। রুচিবানদের বাড়ীতে বাগান ছিল। আমার বাবার বাগান ছিল বিখ্যাত। সকালবেলাতেই দেবস্থলের পূজারীতে, ইষ্টভক্ত প্রবীণ-প্রবীণা, পূজার্থীতে, ব্রতপরায়ণা কুমারীর দলে ভ'রে যেত সে বাগানের চিহ্ন আজও আছে দু-একটি পুরানো গাছে আর ইটের কেয়ারীতে। মাঝখানে ছিল একটি বাধানো বেদী। সেটিও আছে। বেদীর কোল ঘেঁসে সোজা একটি রাস্তা—তার দুধারে বাগান। বাগানের পশ্চিমদিকে গ্রামের রাস্তা, বাগানের দুই প্রান্তে বাড়ী ঢুকবার দুটি দুয়ার—এক দুয়ারের মাথায় মাধবীলতা, অন্যটির মাথায় ছিল মালতীলতা। বর্ষার শেষে শরতের প্রারম্ভে সাদা ফুলের অজস্রসম্ভারভরা মালতীলতাটি আর নীল আকাশের টুকরা টুকরা সাদা মেঘ—মনকে অপরূপ প্রসন্ন মাধুর্যে ভ'রে দিত। আর তেমনি উঠত নাতিমদির মৃদু মধুর গন্ধ। মালতীর মালা গেঁথে—কোনোদিন আমার গলায় পরার অথবা প্রিয়ার কবরী ভূষিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগে নি। ফুল তুলে দেবস্থলে পাঠিয়েছি। বসন্তে ফুটত মাধবী, অপরূপ কারু তার গঠনে—মর্মস্থলে বাসন্তী রঙের

ছোপ, থোকা থোকা ফুলে থাকত হরিদ্রাভ-মর্ম রত্নগুচ্ছের মত। তেমনি মধুর গন্ধ। এ ফুলে মালা গাঁথা যায় না, আমি গাঁথতে পারি নি, গুচ্ছ গুচ্ছ তুলে দেবতাকে পাঠিয়েছি, বিছানায় ছড়িয়েছি। বসন্তে আরও ফুটত বেল ফুল, রজনীগন্ধা। বেল ফুল ফুটত প্রত্যহ এক ঝুড়ি। বসন্তে শুরু হ'ত—চলত বর্ষার শেষ পর্যন্ত। বর্ষায় আরও ফুটত জুঁই। লতানে জুঁই নয়, ঝাড় জুঁই, এ ঝাড় ছুটির গোড়া খড়ের দড়িতে বেঁধে বাবা তাকে এক বড় তোড়ার মত আকার দিয়েছিলেন। রাশি রাশি জুঁই ফুটত। মালা গাঁথা হ'ত, দেবতা পরতেন—মানুষ পরত। আর ছিল কামিনী। করবী টগর, জবা, এরা ছিল বারো মাস ফুল দিত, কামিনী দিত কিছুদিন পরে পরে—ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল, সমস্ত রাত্রিটা মদির ক'রে রাখত বায়ু-পরিমণ্ডল সকাল থেকে তার ঝরা শুরু হ'ত। শরতে শিউলি ফুটত, মেয়েরা ফুল কুড়িয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে শুকিয়ে কাপড় রাঙাত। আমরা কাগজে দেওয়ালে কাঁচা বোঁটা ঘষে হলুদ রঙের দাগ টানতাম। ম্যাপে দিয়েছি শিউলি-বোঁটার হলুদ রঙ। ধারে ধারে ছিল ফলের গাছ, নারকেল গাছ ছিল কাঁঠাল গাছ ছিল, লেবু ছিল, সুপারি ছিল আর ছিল আমাদের শিশুজিহ্বা-মনোহর পেয়ারা গাছ একটু দূরে ছিল একটি আম গাছ, আমার শৈশবের কত দ্বিপ্রহর সেই গাছে কেটেছে, পেয়ারা গাছে আমার কত কাপড় ছিঁড়েছে তার হিসেব নাই, কিন্তু মনে আছে। এই সব ফুলের শোভার মধ্যে আমাদের বাড়ীতে মধ্যমণির মত ছিল একটি গোলাপ গাছ। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপের গাছ। গাঢ় কালচে লাল, ভেলভেটের মত একটি কোমল লাবণ্য ভরা সে ফুল আজও আমার মনের মাঝখানে যেন ফুটে রয়েছে। ঘন সবুজ ডাঁটার সর্বাঙ্গে কাঁটা—অগ্রভাগ ঈষৎ রক্তাভ, তারই প্রান্তে বড় আকারের ফুলটি বাতাসে দুলত, —লাল মানিকের মত ফুটে থাকত। একটি ফুলই মনে পড়ে। কবে যে ফুটে আমার মনোহরণ করেছিল, সে দিন ক্ষণ মনে নাই, ফুলটি অক্ষয় আছে মনে—কোনো দিন ঝরল না, শুকাল না।

ফুল জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক দেখব, কিন্তু, আজ বার বার মনে হয়—তেমন গোলাপ আর কোথাও ফুটবে না; তেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স আর দেখব না। সেই বোধ হয় প্রকৃতির রূপের সঙ্গে আমার শিশুচিত্তের প্রথম প্রেম—শুভদৃষ্টি।

নীল আকাশের তলে বৈঠকখানার সাদা দেওয়ালের পটভূমিকে পিছনে রেখে গাঢ় কালচে লাল-ব্ল্যাকপ্রিন্স দুলত। লম্বা সবুজ ডাঁটিটি পর্যন্ত মনে রয়েছে। ছোট আমি—আমার চেয়ে খানিকটা বড়ই ছিল স্মৃতির সেই ডালটি, তারই মাথায় সেই গাঢ় লাল কোমল ফুলটি;—তুলতে বারণ ছিল, কিন্তু লোভ ছিল, নুইয়ে শুঁকতে চেষ্টা করেছি, স্পর্শ করতে চেয়েছি, পারি নি, কাঁটা ফুটেছে হাতে, লাল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়েছে। রক্তের ফোঁটায় ব্ল্যাকপ্রিন্স ফুটত।

সে গাঢ় কালচে লাল মস্ত বড় গোলাপ ফুল—একালে আর কোথাও ফুটল না। তাই বলছিলাম—আমার সেকালের পুষ্পশোভা আর এই লাল গোলাপ ফুল, একালের সকল দীপ্তির মধ্যেও অম্লান-দীপ্তিতে ফুটে আছে। ঘন লাল কালচে লাল ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ সে বোধ হয় আমার কাছে ছিল ব্ল্যাকপ্রিন্সেস।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়—জীবন ও স্মৃতি যদি এমন জীর্ণই হয়ে আসে যে, সকল কিছু সুন্দরের মুখ কুহেলিকায় ঢেকে আছন্ন হয়ে আসবে, তবে শেষ ঢাকা পড়বে ওই লাল ফুলটি। ওই যেন আমার সকল সুন্দরের কেন্দ্রে বিরাজিত রয়েছে। মৃত্যুকে বলি—মৃত্যু, তুমি যদি সুন্দর হও, তবে তোমায় নিশ্চয় দেখব ওই স্মৃতির গাঢ় লাল গোলাপের ছবিতে, জীবনের দৃষ্টিগণ্ডী ক্রমসঙ্কুচিত বলয়রেখার মত ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসবে, আকাশ পৃথিবীর মানুষ সবই বলয়গণ্ডীর বাইরে প'ড়ে যাবে, শেষ থাকবে ওই ফুলটি। ফুলটি যখন থাকবে না, তখন চোখের দৃষ্টি মুছে যাবে। আমার ব্ল্যাকপ্রিন্সেস। গাঢ় কালচে লাল—ভেলভেটের মত গোলাপ ফুল আমার কালের সেকালের এবং সকল কালের মনোহারিণী।

দোষে গুণে সেকালে এক জীর্ণমূল বনস্পতির মত। বিস্তীর্ণ

শাখায় শাখায় ঘন পত্রপল্লবে পল্লবে ছায়া বিস্তার ক'রে সে বিরাজিত ছিল। তার সর্ব অঙ্গে জীর্ণতা—বহু বজ্রপাতে বহু কোটরের সৃষ্টি হয়েছে, বহু শাখা ভেঙে গেছে, ভগ্ন শাখার চিহ্নগুলি মহাযোদ্ধার অঙ্গের ক্ষতচিহ্নের মত সম্ভ্রম জাগাত। তার তলায় চলেছে সাধুর সাধনা, পথিক পেয়েছে বিশ্রাম, রাখাল গিয়েছে নিদ্রা, সরীসৃপ তার কোটরে গর্জন করেছে, মাথায় শকুন বসেছে, ডালে শুক বাসা বেঁধেছে, রাত্রের অন্ধকারে ব্যভিচার চলেছে। তার তলায় ডাকাতেরা, চোরেরা, ঠ্যাঙাড়েরা এসে মজলিস করেছে, মন্ত্রণা করেছে, লুঠের মাল ভাগ করেছে। তার ডালে দড়ি বেঁধে গলায জড়িয়ে কেউ আত্মহত্যা করেছে। কোনো অমাবস্যার রাত্রে তারই তলে শবাসনে ব'সে তান্ত্রিক তপস্যা করেছেন। আর জীর্ণমূল বনস্পতি ঝড়ের অপেক্ষা করেছে আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে। কখন আসবে ঝড়? ভেঙে পড়বে সে, তার আত্মা সেই ঝড়ে উড়ে মহাকালের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মাটির তলায় নূতন কালের বীজ তখন ফেটেছে, অঙ্কুর উঠেছে। ওই বনস্পতিরই ঝরে পড়া বীজের অঙ্কুর, তারই গোড়ায় সে জন্মাচ্ছে। ঝড়ে চারিদিক বিপর্যস্ত হবে, বর্ষণে মাটি নরম হবে, অতীত কালের বনস্পতি ধরাশায়ী হযে আকাশপথ করবে উন্মুক্ত, সেই পথে নূতন কালের অঙ্কুরের আলোক সাধনা হবে শুরু। কখন আসবে ঝড়?

মানুষও তখন বলতে শুরু করেছে—এর শেষ কর! আর সয় না। কবে আসবে নূতন দিন?

১০

এল ঝড়। এল নূতন কাল। এল আমার কালের নূতন কাল। ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন।

বাঙালীর জীবনে—ভারতবর্ষের জীবনে সে একটি মহামহিময় দিন। এমন দিন জাতির জীবনে, দেশের ইতিহাসে বহু শত বৎসরে একবার আসে।

সূর্যোদয় হয় নিত্য, পাখীরা কলরব করে, ফুল ফোটে, কীটপতঙ্গেরা পাখা মেলে ভেসে পড়ে, গুঞ্জনধ্বনি তোলে, মানুষ জেগে ওঠে— তাদের বাঁধাধরা কাজ-কর্মের বোঝা কাঁধে নিযে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানকে বহন ক'রে নিয়ে চলে প্রত্যাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে, কালকে নিয়ে চলে কালান্তরের সন্ধিক্ষণের পানে। চলে—চলে—চলে। দিনের পর দিন চ'লে যায, এক পুরুষের বোঝা অপর পুরুষের ঘাড়ে চাপিযে দিযে তারা অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যায এই ব'লে যে, 'পুরুষান্তর হ'ল, তবু সেই সন্ধিক্ষণ এল না, বহুকামনাব কালান্তর হ'ল না।' কামনা ক'রে যায, 'যেন তার পরবর্তী পুরুষের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ আসে।'

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন সেই সন্ধিক্ষণ এল, ঘোষণা ক'রে বললে—আমি এলাম।

সেই তিরিশে আশ্বিন সূর্যোদযের সঙ্গে সঙ্গে সে দিন দেশ যে জেগে উঠল—সে জেগে ওঠার তুলনা নাই। সেদিন পাখীরা যেন কলরব ক'রে গেয়ে উঠল—

ভেঙেছে দুযাব এসেছে জ্যোতির্মঘ
তোমারি হউক জয়।"

ফুলেরা ফুটল, তাদের বর্ণে গন্ধে বাণী ফুটে উঠল—
"তিমির বিদার উদার অভ্যুদয
তোমারি হউক জয।"

কীট-পতঙ্গের পক্ষগুঞ্জনে উঠল তারই প্রতিধ্বনি। মানুষেরা জেগে উঠল, সূর্যপ্রণাম ক'রে বললে—

"হে বিজযী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয।"

মহাকবির কাব্যকে আশ্রয় না-ক'রে তার মহিমা প্রকাশ করা যায় না।

আমার জন্ম ১৮৯৮ সালের আগষ্ট মাসে। ১৯০৯ সালের অক্টোবরে আমার বয়স সাত বছর দু মাস। আমার চোখে সে-দিনের সে-জাগরণের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ছে ভোর হতে-না-হতে গ্রামের তরুণ দলের সাড়া জেগে উঠল। এ ওকে ডাকছে, ও তাকে ডাকছে—

নির্মল।

—কে? গোপাল?

—হ্যাঁ। উঠে আয়।

—আসছি।

—আয়। আমরা আর সবকে ডাকতে যাচ্ছি।

—ষষ্ঠী। ষষ্ঠী!

—ষষ্ঠী তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফাড়নকে ডাকতে গিয়েছে।

—গাবু। গাবু।

—যাচ্ছি।

—ধীরেন উঠেছে?

—উঠেছি। আমি ছোটকাকা একসঙ্গে যাচ্ছি।

—সুবীর! সুবীর।

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ীতে।

—রজনী! রজনী।

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ী গেল সুধীরের সঙ্গে।

—কালীকিঙ্কর।

—যাচ্ছি আমরা।

ডাক চলেছে এপাড়া থেকে ওপাড়া। সেখান থেকে বাজারপাড়া। ওদিকে ইস্কুল-বোর্ডিং থেকে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ভেসে আসছে—বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!

আমার বাবা উঠতেন একটু দেরিতে। আগেই বলেছি তাঁর

বৈঠকখানায় একটা বড় মজলিস বসত। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের অন্তত অর্ধেক প্রধানেরা এসে সমবেত হতেন। সে মজলিস চলত রাত্রি বারোটা পর্যন্ত। তারপর বাড়ী এসে মুখ হাত ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ইষ্টস্মরণ সেরে শুতে প্রায় একটা বাজত। কোনো কোনো দিন মজলিস ভাঙতে আরও দেরি হ'ত। কাজেই ভোরে তিনি উঠতে পারতেন না। সেদিন কিন্তু ভোরবেলা উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ডায়েরীতে সে কথার উল্লেখ রয়েছে। আমার মনে আছে - তিনি আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। তিনি গল্প বড় একটা বলতেন না। সেদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন সুলতান মামুদের সোমনাথ-মন্দির ধ্বংসের গল্প। একটা কথা তার মধ্যে আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। বলেছিলেন—"সোমনাথ শিবলিঙ্গকে উপড়ে নিয়ে গেল সুলতান মামুদ। সোমনাথ আপত্তি করলেন না, রুদ্রমূর্তিতে জেগে উঠলেন না, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হিন্দুর অধঃপতন দেখে। দেবতা প্রসন্ন থাকেন, সাহায্য করেন, পরিত্রাণ করেন সাধুকে। সাধু কে? না, যিনি সৎ, যিনি পবিত্রাত্মা, তিনি। হিন্দু জাতি তখন অধঃপতিত, তাদের সততা নাই, অন্তরের পবিত্রতা নাই, তাই দেবতা তখন তাব প্রতি বিমুখ। দেবাদিদেব বহুপূর্বেই ওই পাথরের গড়া লিঙ্গমূর্তির ভিতর থেকে চ'লে গিয়েছেন স্বস্থানে। মন্দিরের পাণ্ডারা, পূজকেরা ওই লিঙ্গমূর্তির নিচে একটা গহ্বর তৈরি ক'রে তাতে লুকিয়ে রাখত ধন-সম্পদ—কোটী কোটী টাকা মূল্যের সোনা মণি-মাণিক্য। দেবাদিদেব শিব পরম বৈরাগী, শ্মশানের ছাই তাঁর অঙ্গভূষণ, মড়ার হাড় তাঁর আভরণ, পশুচর্ম তাঁর বসন। সম্পদ সোনা রূপা হীরা মণি-মাণিক্যের স্পর্শে তাঁর শরীরে যন্ত্রণা হয়। ঘর দোর তিনি তৈরি করেন না, তিনি ঘুরে বেড়ান শ্মশানে, বাস করেন হিমালয়শিখরে কৈলাসে। তিনি লোভী পূজক আর অধঃপতিত, অপবিত্র-আত্মা, মানুষের পূজা নেবেন কি ক'রে? তাই চ'লে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই দেবতা-পরিত্যক্ত পুণ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুরা হ'ল পরাজিত। অনায়াসে সুলতান মামুদ জয় করলেন সোমনাথের মন্দির, ভেঙে

ফেললেন পাথরের শিবমূর্তি। পেলেন রাশি রাশি ধন। সেই ধন-সম্পদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন শিবমূর্তি। হাহাকার উঠল দেশে—সমস্ত ভারতবর্ষে। অরক্ষিত হ'ল ভারতবর্ষ। তখন স্বপ্নাদেশ দিলেন পরমেশ্বর। স্বপ্নে বললেন--অধঃপতনের এ হ'ল প্রায়শ্চিত্ত। এ প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে, যে দিন সমস্ত জাতি অনুতপ্ত হয়ে আবার পুণ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে, পুণ্য যেদিন সঞ্চিত হবে সেই দিন। এমনি পুণ্যবান যদি কেউ আমার বেদীতে বা ওই বিদেশে গিয়ে আমার ভগ্নমূর্তির উপর এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল আর একটি মাত্র বিল্বপত্র নিয়ে 'নমঃ শিবায়' ব'লে দিতে পারে—তবে সেই মুহূর্তে আমি আবার আবির্ভূত হব।" গল্পটি শেষ ক'রে বলেছিলেন, 'জান বাবা, আজ যে এই দিন—এ বোধ হয় সেই দিন। আজ বোধ হয়, আমাদের চৈতন্যোদয় হ'ল। আজ বোধ হয় শুরু হ'ল পুণ্য সাধনার।' চোখ তাঁর ছলছল ক'রে উঠেছিল।

পুণ্য সাধনার যে সূত্রপাত হ'ল, এ যেন সে দিন চোখে দেখা গিয়েছিল। বেলা দশটা নাগাদ গ্রামের রাস্তায় বের হ'ল প্রকাণ্ড মিছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, ঘরের অল্পবয়সী ছেলেরা, বোডঙের ছেলেরা খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দলের পুরোভাগে ছিলেন কে কে – সকলকে স্মরণ করতে পারি না। তবে তিন জনকে মনে আছে। আমাদের গ্রামের শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত-দেহ গোপালবাবু আমার চোখে সেদিনের লাভপুরের নব অভ্যুদয়ের অগ্রদূত। সৃষ্টিকর্তা দুর্লভ মূলধন দিয়ে তাকে যেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মত রূপ, দুর্লভ সুকণ্ঠ, জন্মগত সঙ্গীতপ্রতিভা, তেমনি প্রতিভা ছিল সাহিত্যে; বুদ্ধি ছিল শাণিত তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপার। তিনিই ছিলেন সেদিন গানের দলের অগ্রগায়ক অধিনায়ক। তাঁর পাশে আরও দু'জন ছিলেন—একজন স্বর্গগত নির্মলশিববাবু, অপরজন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বর্গগত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অল্পবিস্তর পরিচিত।

বিশেষ ক'রে তাঁর 'রাতকানা' প্রহসনটি বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের প্রহসন বিভাগে স্থায়ী আসন পেয়েছে। তিনি আমাদের গ্রামের আকাশের নবোদিত ভাস্করতুল্য—নবীন ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা যাদবলালবাবুকে করস্পর্শ দিয়ে সম্মানিত করেছে, নিজের সামনে চেয়ার দিয়ে বসবার অধিকার দিয়েছে, কানে কানে ভাবীকালে খেতাবের কথাও বলেছে। বলেছে, তোমরাই হ'লে আইন ও ন্যায়াধিকারে প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। তুমি দেখবে যাদবলালবাবু, এখানে যেন ওই সব বাজে হুজুগ—That Suren Banerjee's wretched Bandemataram movement, কাপড় পোড়ানো, এ সব না হয়। কিন্তু নির্মলশিববাবু সে দিন ছিলেন তরুণ। সে দিন তিনিও সাড়া না-দিয়ে পারেন নি। তিনি ছিলেন পুরোভাগে, তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। আর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন—আমাদের নূতন হাই ইস্কুলের থার্ড মাস্টার। তেজস্বী দীপ্তিমান মানুষ। খড়্গের মত নাক, চোখ দুটি ছিল অদ্ভুত ছোট, কিন্তু তাতে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল অকুতোভয়তা। আর ছিলেন তিনি সুবক্তা, সুবক্তা বললেও ঠিক বলা হ'ল না—তাঁর মধ্যে বাগ্মিতার বীজ ছিল।

আজ এই তিন জন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথাই তিন জন-সম্পর্কে মনে হচ্ছে। তিন জনেই জীবনে সার্থক হতে পারেন নি। গভীর বেদনা অনুভব করি তিন জন সম্পর্কে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, কেন পারলেন না? অথচ উপাদান ছিল প্রচুর।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর কারণ জানি। ধনসম্পদ এবং ইংরেজ সরকারের রাজপুরুষদের মোহে প'ড়ে তিনি তাঁর সাধনমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। সুখ তাঁকে নষ্ট করেছিল। তিনি যদি রায় বাহাদুর উপাধি না পেতেন, তবে শেষ জীবন এমন সকরুণভাবে নিষ্ফল ব্যর্থ হ'ত না। তাঁর জীবনে ছিল সুদুর্লভ একটি গুণ, বহু তপস্যা না ক'রে এ গুণ আয়ত্ত করা যায় না। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না,

সে জন্মায় জীবরূপ নিয়ে, তার স্বাভাবিক ধর্ম হ'ল ক্রোধ হিংসা লোভ। নির্মলশিববাবু জন্মেছিলেন যেন অক্রোধ নিয়ে। ওটি যেন ছিল তাঁর জন্মগত গুণ-সম্পদ। শেষ-বয়সে উপাধি এবং সম্পদ তাঁরঃ দেবদুর্লভ গুণকেও বহুলাংশে নষ্ট করেছিল। বাইরের যাঁরা, তাঁর হয়তো এর আঁচ পান নি। আর যারা লাভপুরের নিকটের মানুষ তারা এ আঁচ পেয়েছিল। আর ছিল প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, অভিনয় প্রীতি ও প্রতিভা। এমন অভিনয়-প্রতিভা ও প্রীত দুর্লভ। জীবনের প্রথমাংশে এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যকারের সাধক। তার সাধনার ফল গোটা গ্রামকে ধন্য ও সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে-সাধনাতেও তাঁর ছেদ টেনে দিলে ইংরেজ রাজসরকারের তুচ্ছ প্রসাদ প্রলোভন।

নিত্যগোপালবাবুকে নষ্ট করেছে, তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করেছে, ঠিক তার উল্টো দিকের আঘাত। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, বাড়ীতে শাসন ছিল অতিমাত্রায় কঠোর, আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাকার হাতের বেত্রাঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবুও হার মানেন নি। হার মানতে হ'ল নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে প'ড়ে। আদর্শানুরাগী তরুণ, কন্যাদায়গ্রস্ত শিক্ষককে তাঁর অন্তিমশয্যায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবেন। শিক্ষক তাকে আশীর্বাদ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোপালবাবু গোপনে শিক্ষক-কন্যাকে বিবাহ ক'রে প্রতিশ্রুতি রাখলেন। কিন্তু বিবাহের সন্ধ্যাতেই কথাটা প্রকাশ পেয়ে গেল। বেত্রপাণি খুল্লতাত লোক নিয়ে ছুটে গেলেন, বিবাহ বন্ধ করবেন। কিন্তু তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বর্জিত হলেন সংসার থেকে গোপালবাবু। বয়স তখন ১৯২০, আরম্ভ হ'ল দুঃখের পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আশ্রয় নাই. অন্নসংগ্রহের সাধ্য নাই; কি করবেন? ওই অবস্থাতেই অগ্রসর হতে না-পেরে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হ'ল, তারও বেশী— নিতে হ'ল তাঁকে পুলিশের চাকরি। জীবনাদর্শের সব শেষ হয়ে

গেল। নইলে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন আমাদের গ্রামে বিবেকানন্দের ভাবধারাকে বহন ক'রে। সাহিত্য-সাধনার একটি ধারাকে শঙ্খ বাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এবং নির্মলশিববাবু, তাঁরাই এ ক্ষেত্রে ছিলেন যুগ্ম ভগীরথ। সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। এমন সতেজ এবং সুডৌল মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর বোধ হয় আমার জীবনে আমি শুনি নি। সে স্বরমাধুর্য আজও কানে লেগে রয়েছে। শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টকং, রবীন্দ্রনাথের 'কে হে মম মন্দিরে' এ গান দু'খানি ছেলেবেলায় শুনেছি, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

থাক সে-সব কথা।

মিছিলের কথা বলি।

সেদিন মিছিল চলল করতাল বাজিয়ে, দেশের বন্দনা গান গেয়ে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে এসে উপনীত হ'ল আমাদের গ্রামের মহাপীঠে। সেখানে স্নান করলেন সকলে।

'ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই' ব'লে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে হলুদ রঙের রাখী বাঁধলেন পরস্পরের হাতে। শপথ নিলেন—এ শপথ সকলে নিলেন নিজের কাছে নিজে। শপথ নিলেন—'সকল দুর্বলতাকে করব পরিহার, আত্মনিয়োগ করব পুণ্যের তপস্যায়। সকল কালিমাকে করব মার্জনা, করব ধৌত, করব মুক্ত। অন্তরকে করব শুভ্র, করব নির্মল সুপরিচ্ছন্ন সুপবিত্র।'

আশ্চর্যের কথা, তরুণেরা যারা ইতিমধ্যেই জমিদার ও তান্ত্রিক-প্রধান গ্রাম্য-সমাজের প্রভাবে মদ্যপান শুরু করেছিল, কলকাতা-ফেরত যারা কলকাতার ফ্যাশন ও বিলাসলালসায় মদ্যপান শুরু করেছিল—দুই দলই শপথ করলে, ছাড়ব।

এরা বললে—মদ খাব না।

ওরা বললে—Drink করব না।

এরা খেত—দেশী মদ।

ওরা খেত—হুইস্কী।

সত্যিই সেদিন এল নবযুগ। নূতন সূর্যোদয়। জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব যেন প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম।

আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন আমার মা।

আমার বড় মামা তখন লাভপুরে ছিলেন। তাঁরও থাকা উচিত ছিল মিছিলের পুরোভাগে। কিন্তু তিনি তা থাকেন নি। ছিলেন পিছনে। তাঁর সঙ্গে তখন বিপ্লবী দলের ক্ষীণ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। মুরারী-পুকুর বাগানের বোমাকে দলের সঙ্গে পাটনার কিছু লোক সংস্রবে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি মিছিল থেকে ফিরে মায়ের হাতে রাখী বাঁধলেন। মা একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেধে দিলেন।

মনে আছে আমার। স্পষ্ট মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে—গোপালবাবু কবিতা রচনা ক'রে হাতে লিখে নাটমন্দিরের দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। শুনলাম ওটা নাকি রাজদ্রোহমূলক কবিতা। বয়স তখন আমার সাত পূর্ণ হয়েছে। রাজদ্রোহ কাকে বলে ঠিক বুঝি না। তবে কবিতাটিতে যে একটি ঝাজ ছিল, সে অনুভব করবার মত আমার মনের স্পর্শশক্তি তখন হয়েছে। সে কবিতাটির একটা লাইন আজও মনে আছে। ভাবটা গোটাই মনে রয়েছে। কবি বলছেন মহাশক্তিকে—মা, তুমি জাগো · মা, তুমি জাগো। যে লাইনটি মনে আছে, সেটি হচ্ছে এই—

"দেবাসুর-সংগ্রামের এই তো সময় !"

মনে হয়েছিল···অসুর ওই ইংরাজেরা। স্পষ্ট মনে আছে।

১১

কয়েক বৎসর আগে হ'লে ও-লাইনের অর্থ হ'ত অন্যরূপ। বুঝতাম, অসুর মানে তারাই যারা সোমনাথ ভেঙেছে, বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙে মসজিদ তুলেছে, যারা বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভেঙেছে; কিন্তু উনিশশো পাঁচ সাল নূতন কাল নিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আনলে নূতন ব্যাখ্যা নূতন ব্যঞ্জনা। এ ছাড়াও অনেক কিছু নিয়ে এল।

বিচিত্র আবির্ভাব! কেমনভাবে সে যে এল তা ব'লেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। গাজনে মহাকালের পূজা হয়, ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে ভক্তবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে কালাধিপতি মহাকালের নাম ঘোষণা ক'রে বলে, বলো—শিবো কালরুদ্র। নূতন বৎসর আসে, নিয়ে আসে নূতন জীবন। এও ঠিক তেমনি। বন্দেমাতরম্!

উনিশশো পাঁচ সালের পর নূতন জীবন আত্মপ্রকাশ করল।

আগে বলেছি, এর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ছিল পুরানো কালের মানুষদের অসহায় মনের ধর্মবিশ্বাস অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। আর একদিকে ছিল নূতন কালের ইংরাজী সভ্যতার ফেনা অর্থাৎ ফ্যাশন। নিছক ফ্যাশন। যাকে আমি তুলনা করি সে-কালের প্রচলিত— O H. M S Whisky-র সঙ্গে। ইংরেজ জাতির অধিপতির প্রতি আনুগত্য সঞ্চার করা এই ফ্যাশনের একটি স্বভাবধর্ম ছিল। সেই হিসাবে O H. M. S. নামটি সার্থক।

হঠাৎ Whisky পরিণত হ'ল সঞ্জীবনী রসে।

নেশার উত্তেজনায় কৃত্রিম জীবনোচ্ছ্বাস নয়, এ যেন স্বতোৎসারিত ভোগবতী ধারার আত্ম প্রকাশ। চোখের সামনে সে দেখা গেল আমাদের বীরভূমের বৈশাখের তৃণহীন গৈরিক প্রান্তরের বুকে—নববর্ষণে শ্যামলশোভা জেগে-ওঠা তৃণাঙ্কুর প্রকাশের মত। বিস্ময় লাগে। প্রশ্ন জাগে, লালমাটির রুক্ষ রসহীন বুকের মধ্যে এই পৃথিবী-দগ্ধ-করা রৌদ্র সহ্য ক'রে এই তৃণবীজগুলি বেঁচে ছিল কেমন ক'রে? মনে মনে অনুভব করতে পারি—জীবন অবিনশ্বর। সেদিনও মনে হয়েছিল জীবনমহিমা—মানবসাধনা অবিনশ্বর।

শুধু তৃণাঙ্কুরই জাগল না, কিছুদিনের মধ্যেই ফুল ধরল ঘাসগুলির ডগায়। উনিশশো পাঁচ সালেই 'বন্দেমাতরম্' নাম ললাটে ধারণ করে জেগে উঠল দুটি প্রতিষ্ঠান। আরও একটি প্রতিষ্ঠান জাগল, যার নাম বন্দেমাতরম্ না থাকলেও বন্দেমাতরমের প্রত্যক্ষ প্রাণধর্ম ছিল সেই প্রতিষ্ঠানটিতেই।

'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'। থিয়েটার শব্দটিকে বাংলা ভাষায়

রূপান্তরিত করবার মত মনোভাব তখনও হয় নি। আর হল বন্দেমাতরম্ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা।

আর প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'। এর প্রতিষ্ঠাতা নিত্যগোপালবাবু, তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবুদের প্রতিষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারবংশের সন্তান।

বন্দেমাতরম্ থিয়েটার, বন্দেমাতরম্ লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী ছিলেন স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিত্যগোপালবাবু, দ্বিজেনবাবু। থিয়েটারের মধ্যে ছিলেন আর একজন। তিনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাতা, গৃহজামাতা—স্বর্গীয় শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শশাঙ্কবাবুর প্রাণ ছিল এই থিয়েটার। আরও একজন ছিলেন প্রথম দিকে, তাঁর নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন গৃহজামাতা। শশাঙ্কবাবুর কথা একটি গল্পে আমি বলেছি, 'চন্দ্র জামাইয়ের জীবন-কথা'য়। শেষের দিকটা কল্পনা। অবশ্য পুরো কল্পনা নয়, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর আকর্ষণ তখন জেগেছিল। আমাকে গোপনে বলেছিলেন—আর বয়স নাই তারাশঙ্কর! সাহস পাই না। ভরসা হয় না।

থাক সে-সব কথা। থিয়েটারের কথা বলি। থিয়েটার আমাদের গ্রাম্য সমাজে অনেক রস পরিবেশন করেছে। ভালমন্দ অনেক দিয়েছে। নূতন যুগের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় আমাদের এই নাট্য-আন্দোলন যতখানি করিয়ে দিয়েছে, ততখানি আর কিছুতে হয় নি। নির্মলশিববাবু, নিত্যগোপালবাবু আগেই সাহিত্যের অমৃতরসের সন্ধান পেয়েছেন। সাহিত্যরস-পিপাসার সঙ্গে এই নাট্য আন্দোলনের সমন্বয় ঘটল। তারা নাটক লিখেছেন—অভিনয় হয়েছে। হয়তো নাট্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না-হ'লেও তারা সাহিত্য-চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়া গ্রামের যুবক সম্প্রদায় ছিল, তারাই অনেকখানি রক্ষা পেল নাট্য-আন্দোলনের প্রভাবে। কয়েক জনের কথা বলি। নির্মল-শিববাবুদের সমবয়সী বন্ধু ছিলেন দু'জন—একজন ষষ্ঠী, অপরজন সীতাংশু, ডাকনাম ফোড়ন। ষষ্ঠী ফোড়ন তখনও পড়ে। পড়ে

নামমাত্র। অধঃপতনের সকল আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ষষ্ঠী টেরি কাটে—ডাইনে বাঁয়ে দু'দিকে সামনের চুল কপালের উপর গুটিয়ে গোল হয়ে উঠে থাকে, লম্বা ফুলে-ফেঁপে থাকে, ষষ্ঠী তারই মধ্যে গুঁজে রাখে আস্ত তিনটি-চারটি সিগারেট। এবং সেই নিয়েই ইস্কুলে যায়। বাড়ী ফেরে। বাড়ীতে গ্রাজুয়েট প্রাইভেট মাস্টার রেখেছিলেন বাপ। মাস্টার বই খুলে ব'সে থাকেন, ষষ্ঠী বাঁয়া তবলা নিয়ে সঙ্গীতচর্চা করে। ফোড়ন সঙ্গে থাকে। এমনি ফোড়ন এবং ষষ্ঠী অনেক তখন। এরা স্বাভাবিকভাবে পরিণত হ'ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বিকৃত তান্ত্রিক কি শৈব কি বৈষ্ণবে। কিন্তু এই নাট্য-আন্দোলন এঁদের নূতন কালের ভাবের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলে।
এই প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম ছিল দু'কড়ি চক্রবর্তী। বর্ণ-ব্রাহ্মণের ছেলে, সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, তার উপর গিয়েছে দৃষ্টিশক্তি, প্রায় অন্ধ বললেই হয়। দিনের আলোয় মানুষকে দেখে সে আবছা আবছা। রাস্তার ধারে বাড়া—দাওয়ার উপরটিতে ব'সে থাকে রাস্তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে। মানুষ যায় আসে—সে দেখে কিছু যেন নড়েছে, কিছু যেন চলছে। হঠাৎ কোনো পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কানে এলে মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে ডাকে—কে, মরিরাম? শোন—শোন।
মরিরামের দৃষ্টি আছে, কাজ আছে, সে চ'লে যায়—দুকড়ির মুখের আলো নিভে যায়।
দুকড়ি বাঁচল থিয়েটারে যোগ দিয়ে। সুন্দর চেহারা ছিল, অভিনয় করবার শক্তিও ছিল। আর একটা শক্তি ছিল, দৃষ্টিশক্তি ছিল না কিন্তু কানে শুনে সে পার্ট মুখস্থ করে ফেলত অল্প সময়ের মধ্যে।
শশাঙ্কবাবু এসে ডাকতেন—দোকন?
—জামাইবাবু!
—এস।
শশাঙ্কবাবু হাত ধ'রে তাকে নিয়ে যেতেন, দোকন যেত—মহলার মজলিসে বসত। রাত্রে শশাঙ্কবাবুই তাকে পৌঁছে দিতেন। দোকন

সকাল থেকে দাওয়ায় বসে পার্ট আওড়াত আপন মনেই। ক্রমে সে পেলে অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা। তখন তার সঙ্গীর অভাব হ'ত না। বেকার যুবকেরা তার কাছে বসে আড্ডা জমাত। তার সুপারিশ নিয়ে তারাও ঢুকবে থিয়েটারে। তা ছাড়া লাইব্রেরি থেকে দোকন নাটক আনত। ওরাই তাকে প'ড়ে শোনাত। দোকন সুর ক'রে বক্তৃতা ক'রে যেত –

'উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিল নর্মদা।
ভীষণা রাক্ষসী-মুখে তুলিয়া হুঙ্কার –
কার লোভে ছুটিযাছ পুনঃ উন্মাদিনী।"

অদ্ভুত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। যে-ভূমিকায় সে একবার অভিনয় করেছে সে-ভূমিকার অংশ কোনোদিন ভোলে নি। উলুপী নাটকে সে গঙ্গার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, সে ছবি আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

নাট্য-আন্দোলন আর একটি সুমহৎ কাজ করেছিল। গ্রামের সকল স্তরের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অতি মধুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সেকালের গ্রাম্য সমাজ, গ্রামটি জমিদার-প্রধান, জমিদারেরা সকলেই ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণ সমাজের যুবকেরা অপর সকল স্তরের যুবকদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেন। চলায়-ফেরায় ওঠায়-বসায় অহেতুক অশোভন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলতেন। এক দাওয়ায় এক বিছানায় বসতেন না, এমন কি কোনো সাধারণ কর্মে গ্রামের তরফ থেকে সম্প্রদায়নির্বিশেষে কোথাও যেতে হ'লে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পথ চলতেন। মেলায় যাত্রা-কীর্তনের আসরে বাবুদের ছেলেরা বসত যেখানে, সেখান থেকে খানিকটা স'রে বসতেন অন্য সম্প্রদায়ের যুবকেরা। নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে—সেই বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাট্যসম্প্রদায়ের মহলার আসরে সকলেই বসতেন এক ঘরে এক বিছানায়, সরস হাস্যপরিহাসে সকলেই যোগ দিতেন, সকলেই হাসতেন সমান প্রাণ খুলে, সমান উচ্চ কণ্ঠে।

শুধু তাই নয় - এই সর্বস্তরের যুবকদের এমনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে—জীবনে, আচার আচরণে ও ব্যবহারের মধ্যে দেখা দিল উদ্ধত আভিজাত্যের পরিবর্তে উদার মাধুর্য, সস্নেহ আত্মীয়তা; অন্য দিকে সভয় সঙ্কোচ এবং গোপন হিংসার পরিবর্তে অসঙ্কোচ প্রসন্নতা, শ্রদ্ধান্বিত গুণমুগ্ধতা।

এর জন্য সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য দুটি লোকের। প্রথম, এ যজ্ঞের যাঁকে যজ্ঞেশ্বর বলা যায় তিনি, স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে—তাঁর ধাতুর মধ্যে ছিল অপরূপ মাধুর্য। প্রথম যৌবনে মানুষকে কাছে টানবার, মানুষকে স্বীকার করবার, মানুষকে মানুষ ব'লে বুকে গ্রহণ করবার এই সহজাত মাধুর্য এবং ঔদার্যের তুলনা সংসারে বিরল—অতি বিরল। দ্বিতীয় জন—এই শশাঙ্কবাবু, হাত ধ'রে এদের নিয়ে আসতেন, নির্মলশিববাবু পরমস্নেহে গ্রহণ করতেন সকলকে। শশাঙ্কবাবু ছিলেন ঘরজামাই। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি ঘরজামাই। যাঁরা চিরকাল বসবাসের সংসারেও জামাই সেজে থাকতেন, এক মুহূর্ত ভুলতেন না জামাইয়ের মর্যাদা—তিনি তাঁদের একজন। আমাদের গ্রামে তিনিই বোধ হয় শেষ খাঁটি ঘরজামাই। ভোরবেলা উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে দস্তুরমত বেশভূষা ক'রে নীচে নামতেন, সামান্য জলযোগ ক'রে ছড়ি, থিয়েটারের বই এবং পার্ট লেখার কাগজপত্র বগলে নিয়ে বের হতেন। এসে বসতেন—দোকানের দাওয়ায় অথবা গোপাল স্বর্ণকারের দাওয়ায়। তারা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে মোড়া বা চৌকি পেতে দিত। তামাক সেজে হুঁকাটি হাতে দিত। তিনি তামাক খেতেন, পার্ট লিখতেন, আর খোঁজ নিতেন—পাড়ার কোন কোন তরুণের থিয়েটারে যোগ দেবার অভিপ্রায় আছে, যোগ্যতা আছে। তাদের ডাকতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, নিমন্ত্রণ করতেন মহলার আসরে যাবার জন্য। সন্ধ্যার ঠিক আগে এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেন, এস, আমার সঙ্গে এস। তিনি জানতেন যে, সঙ্গে না-নিয়ে গেলে ইচ্ছা সত্ত্বেও

ওরা যেতে পারবে না। গিয়েও হয়তো দরজার মুখ থেকে ফিরে আসবে। সঙ্গে নিয়ে হাসিমুখে শশাঙ্কবাবু আসরে ঢুকে বলতেন, একে নিয়ে এলাম। বেশ ছেলে—ভাল ছেলে।

নির্মলবাবু সহজাত মিষ্ট হাসি হেসে বলতেন, ব'স ব'স। তুমি তো—এর ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এত দূরে—এমনভাবে এক পাশে স'রে বসলে কেন? ভাল ক'রে উঠে ব'স। গান গাইতে জান?

—আজ্ঞে না।

—বাজাতে?

এবার চুপ ক'রে থাকত সে।

—বাজাতে পার তা হ'লে। কই, তবলাটা বাঁধ দেখি!

এগিয়ে দিতেন তবলাটা।

মজলিস চলত। গানে বাজনায়, সরস সর্বজনীনতার মহিমায়, উদার রসিকতায়, প্রসন্ন হাস্যের মধ্যে কেমনভাবে যে সে একদিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত, সে-কথা কেউই বুঝতে পারত না।

মজলিস শেষে শশাঙ্কবাবু জ্বালতেন তাঁর হ্যারিকেন লণ্ঠনটি। একেবারে আসল ডিট্জ লণ্ঠন। তেমনি ঝকঝকে, ঠিক যেন নতুনটি। কাচটি তেমনি পরিষ্কার। সপ্তাহে কাচটি একদিন ক'রে চুন মাখিয়ে সাফ করতেন। তেমনি আধখানা চাদের মত ক'রে কাটা পলতেটি। আলোটি জ্বেলে বলতেন, এস।

ডাকতেন তিনি—দোকনকে, ছবি স্বর্ণকারকে, পঞ্চানন সাহাকে, ক্ষুদিরাম সাহাকে। প্রত্যেককে পৌঁছে দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন। এর মধ্যেও কিন্তু শশাঙ্কবাবু ছিলেন—বিশ্বামিত্র। দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। সে ক্রোধ হ'ত তার অভিনয়ের সময়ে বা অভিনয়ের পথে ত্রুটিতে কি বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে। সুরেন গড়াঞীকে দেওয়া হয়েছিল একটি পরিচারকের ভূমিকা। রাজবাড়ীর পরিচারক। রাজবাড়ী আক্রান্ত হয়েছে, নিরুপায় অসহায় বৃদ্ধ রাজার পরিত্রাণের

কোনো পথ নেই। রাজা ডাকছেন—ওরে, কে আছিস—আমার জপের মালা। ওরে—মালা আন, আমার জপের মালা। ওরে, কে আছিস—

শশাঙ্কবাবু তিন মাস প্রত্যহ সুরেনকে তালিম দিয়েছেন—মালাগাছি হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে—রাজাকে প্রথম প্রণাম করবে, তারপর মালাগাছি রাজার হাতে দেবে, তারপর আবার একটি প্রণাম ক'রে চ'লে আসবে। সুরেন প্রতিদিন মহলার সময় ঠিক ঠিক নির্দেশ পালন ক'রে এসেছে। অভিনয়ের দিন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে সুরেন, শশাঙ্কবাবু মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা ডাকছেন। ঠিক সময়টিতে মালা সুরেনের হাতে দিয়ে—রেসের ঘোড়াকে জকির ইঙ্গিতের মত ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সুরেন প্রবেশ করলে রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে দর্শকভরা আসরের দিকে তাকিয়ে তার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে প্রণাম করলে, তারপর মালাখানি রাজার হাতে না দিয়ে নিজের গলায় পরলে, তারপর আবার প্রণামটি ক'রে ফিরে এল। এক-গা ঘেমে সে তখন যেন নেয়ে উঠেছে। ওদিকে দর্শকের আসরে হাসির অট্টরোল উঠেছে তখন। শশাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছে, সমস্ত অভিনয়ের উপর বজ্রাঘাত হয়ে গেল। মাথায় তাঁর আগুন জ্ব'লে গেল। সুরেন উইংসের ফাঁক থেকে পা বের করবামাত্র তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

সুরেন জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল সেইখানে।

শশাঙ্কবাবুর দৃক্‌পাত নেই, তিনি তাঁর গলা থেকে মালাখানি খুলে নিয়ে নিজেই গিয়ে দিয়ে এলেন রাজার হাতে।

দোকনদের দল বলত, বাপরে—জামাইবাবু সাক্ষাৎ বাঘ!

আবার বলত, এমন মানুষ আর হয় না।

সুরেনও বলত।

পরের দিনই শশাঙ্কবাবু নিজে গিয়েছিলেন সুরেনের বাড়ী।

—সুরেন! সুরেন!

—কে?

—আমি হে। শশাঙ্কবাবু। জামাইবাবু। শোন। বাইরে এস।
—আজ্ঞে জামাইবাবু!
—কাল মেরেছি। বড লেগেছিল তোমার। তোমার—
'তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি,' বলতে পারেন না। মুখে বাধে, কিন্তু সুরেন বুঝে নেয়। সে পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—আজ্ঞে না। লাগে নাই বেশী।
—আজ যেন ঠিক সময়ে যেয়ো। ঠিক আটটায় প্লে আরম্ভ হবে।
যাব আজ্ঞে।
অভিনয়ের ত্রুটির জন্য শুধু যে সুরেন গড়াঞ্চীরাই মার খেয়েছে শশাঙ্কবাবুর হাতে তা নয়। রথী মহারথীরাও মার খেয়েছে, তিরস্কৃত হয়েছে। স্বয়ং নির্মলশিববাবুও একবার চড় খেয়েছিলেন। নির্মলশিব ছিলেন প্রৌঢ় চড় খেয়ে হেসে বলেছিলেন, বড জোর হয়ে গেছে হে শশাঙ্ক।
নির্মলশিববাবু পার্ট মুখস্থ করেন নি। নিজে ছিলেন নাট্যকার, পার্ট আটকায় নি. তিনি নিজেই গ'ড়ে ব'লে চালিয়ে এসেছিলেন।
আর একবার নির্মলশিববাবু রঙ্গমঞ্চে হেসে ফেলেছিলেন। তার জন্যও শাস্তি দিয়েছিলেন শশাঙ্কবাবু। পরবর্তী অভিনয়ে তাকে সামান্য দূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।
আর একবার, ইন্দুবাবু নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক অভিনয় করবেন। অভিনয়ও হচ্ছে বিদেশে। লাভপুর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে—সুপ্রাচীন জমিদার-প্রধান গ্রাম এড়োয়ালীতে। কাঁদীর কাছাকাছি। রেল-ষ্টেশন থেকে পনরো মাইল পথ। গরুর গাড়ী ছাড়া যান নাই। অভিনয়ের দিন সকালবেলা ইন্দুবাবুর আসার কথা। কিন্তু গাড়ী ফিরে এল, ইন্দুবাবু এলেন না। সমস্ত দিন শশাঙ্কবাবু গ্রামের বাইরে পথের ধারে একটা গাছতলায় ব'সে রইলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, ইন্দুবাবু এলেন না। ওদিকে ডুপ্লিকেটের ব্যবস্থা হচ্ছে। অভিনয় শুরু হবে। হঠাৎ ইন্দুবাবু এসে হাজির হলেন অশ্বপৃষ্ঠে। মুখে রঙ, হাতে একগাছা মালা। ভদ্রলোক

ধানবাদের ওদিকে কোথায় অভিনয় করছিলেন গত রাত্রে। অভিনয় শেষ হতে বিলম্ব হওয়ায় যে ট্রেন ধরবার, সে ট্রেন ফেল ক'রেছিলেন; পরের ট্রেনে এসে অপরাহ্নে নেমেছেন। গরুর গাড়ীতে মাইল পাঁচেক এসে এক মিঞাসাহেবের কাছে অনেক কাকুতি ক'রে ভাড়া দিয়ে অশ্বটি সংগ্রহ ক'রে এসে পৌঁচেছেন। শশাঙ্কবাবু চপেটাঘাতের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু বিবরণ শুনে ক্ষান্ত হন।

ইন্দুবাবুর কথায় নাট্য-আন্দোলনের আর একটি মহৎ কল্যাণের কথা মনে পড়ছে। সেটি হ'ল আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের যুবক সম্প্রদায়ের যোগাযোগ। এত বিদেশী ব্যক্তি, গণ্যমান্য রসিক জনের সঙ্গে আমাদের গ্রামের যোগাযোগ হয়েছিল যে, সে-কথা স্মরণ ক'রে আজও বিস্মিত হই।

কামদাবাবু, ইন্দুবাবু, ললিতবাবু, প্রফুল্লবাবু, হরিশবাবু, সোমনাথবাবু, ফণিবাবু, আরও কত জন—তুলসীবাবু, প্রমথ, বলাই।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চের রাধাচরণ ভট্‌চায দীর্ঘদিন লাভপুরে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প, স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতেন, মেয়েদেরও এত লাভ মানাত না নারী-ভূমিকায়। তেমনি ছিল সুকণ্ঠ।

ক্ষুদিরাম মালাকার। সে বোধ হয় পঁচিশ বৎসর অভিনয় করেছে লাভপুরে। আর্ট থিয়েটারের আমলে—তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র এঁরাও একবার লাভপুরে গিয়ে 'কর্ণার্জুন' নাটকে পরশুরাম ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ভূমিকায় স্বেচ্ছায় অভিনয় ক'রে এসেছেন।

আর যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ওখানে থাকতেন। নাটক লিখতেন। যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মন্মথমোহন বসু মহাশয় গিয়েছেন। রসরাজ স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু গিয়েছেন। তিনিই আমাদের নবপর্যায় নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করেছিলেন।

আমি বাল্যকালে এঁদের দূরে থেকে দেখতাম।
প্রথম যৌবনে ধন্য হয়েছি এঁদের কাছে এসে।

মনের আবেগে কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে—একসঙ্গে অনেক কালের কথা ব'লে ফেলেছি। উনিশশো পাঁচ সালে—আমাদের প্রথম রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হ'ল। আজও মনে পড়ছে। কী অপরূপ মায়ারাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'ল সেদিন! দৃশ্যপট—উজ্জ্বল আলো! অভিনয়ে নূতন সুর—নূতন ছন্দ! আমার শিশু-নয়নের নিদ্রা কোথায় গেল কে জানে, আমি বিনিদ্র হয়ে ব'সে অভিনয় দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র আর বিল্বমঙ্গল অভিনয় হ'ল প্রথম।

হরিশ্চন্দ্র ও বিল্বমঙ্গলবেশী নির্মলশিববাবুকে মনে পড়ছে। পাগলিনীবেশী নিত্যগোপালবাবুকে মনে পড়ছে। বিশ্বামিত্রবেশী শশাঙ্কবাবুকে মনে পড়ছে। চণ্ডালবেশী আমার মামাকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে—চিন্তামণি ও শৈব্যাবেশী এক কলকাতার কিশোরকে। তার নাম ছিল শিবচন্দ্র। আরও একজন এসেছিল, তার নাম জ্যোতির্ময়। সেও এসেছিল কলকাতা থেকে।

এর পরই হ'ল পাকা স্টেজ। নূতন ড্রপসিন আঁকানো হ'ল। মধ্যস্থলে ভারতমাতা, দুই পাশে—একদিকে হিন্দু, অপরদিকে মুসলমান; ভারতমাতা দু'জনের হাত ধ'রে মিলিয়ে দিচ্ছেন। উপরে লাল অক্ষরে লেখা বন্দেমাতরম্ থিয়েটার। ছবির নিচে লেখা—'হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দুই সন্তান'।

এসব নিয়ে এল ওই নূতন কাল।

* * *

এই যে এল নূতন কাল, সে অবশ্য এল আপন বেগে, কালবৈশাখী ঝড়ের মত এল। যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পথে দিলে বাধা, তাদের উড়িয়ে ভেঙে ফেলে ঢেলে দিলে বর্ষণ; আবর্জনার পুঞ্জ মাটির সঙ্গে মিশে পচল, উর্বর ক'রে তুলল দেশকে, নূতন সৃষ্টি-সমারোহে চঞ্চল হয়ে উঠল চারিদিক। ঋতুর পর অন্য ঋতুর মত কাল হতে কালান্তর আপনিই আসে। কিন্তু বসন্তশেষে গ্রীষ্মাবির্ভাবের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা করি গাজন। বৈশাখে বিষ্ণুদেবতার চন্দনযাত্রার অনুষ্ঠান ক'রে সচেতনভাবে কাল হতে কালান্তরে

মহাকালের পদচিহ্নে আলপনা এঁকে আমরা করি তার সূচনা। অনেক সময় ঋতু অথবা কাল পরিবর্তনের জন্য সাধকেরা সাধনা করে থাকেন। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। সে মহাযজ্ঞের প্রথম সমিধসংগ্রহ এবং অগ্নিপ্রজ্বলন হয়েছিল বাংলা দেশেই। ইতিহাসে সে-কথা লেখা হবে।

আমাদের গ্রামে সে যজ্ঞাগ্নির আলোর আভাস এল, তার উত্তাপও আমরা অনুভব করলাম। উচ্চারিত মন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার মনের তারে কম্পন তুললে।

এর জন্যও আয়োজনের প্রয়োজন হয়, সাধনার প্রয়োজন হয়। সে সাধনা আমাদের গ্রামে যারা করেছিলেন তাঁদের মনে পড়ছে।

স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর কথা আগেই বলেছি। তিনিই গ্রামে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বালিকা বিদ্যালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন তাঁকে কীর্তির নেশায় পেয়ে বসেছে। শ্মশানভূমির মত একটা পরিত্যক্ত প্রান্তর তার কীর্তিমালায় হেসে উঠেছে। তিনিই আমাদের গ্রামের সেই সাধক। মানুষও অকৃতজ্ঞ নয়, আজও লাভপুর বলতে আমরা যাদববাবুর লাভপুরকেই বুঝি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে পরবর্তীকালে গ্রামের সমস্ত লোকের বিরোধ বেধেছে। আসল বিরোধ সেই প্রতিষ্ঠার বিরোধ, সে বিরোধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু তবুও কেউ স্বর্গীয় যাদবলালবাবুকে ভুলে যায় নি, তাঁর স্মৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নি। যাদবলালবাবুর কীর্তি লাভপুরে অবিস্মরণীয়, তিনিই লাভপুরে নবযুগ-যজ্ঞ-প্রজ্বলনের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, বেদী রচনা করেছিলেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, নীলচক্ষু, হাস্যপ্রসন্ন মুখ, মিষ্ট কথা; এ মানুষকে লক্ষের মধ্যে চেনা যায়। আমরা ছেলেবেলায় আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে খেলা করতাম, তিনি তাঁর ভিতরবাড়ী থেকে তাঁর ঠাকুরবাড়ী, কাছারী-বাড়ীতে যেতেন ওই চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে; প্রতিটি ছেলের সঙ্গে কথা ব'লে যেতেন। তিনি

আমার কাছে অবিস্মরণীয়। তিনি লাভপুরে আবির্ভূত না হ'লে, এই বর্তমান রচনা কোনোদিনই রচিত হ'ত না। আমি লিখতেই হয়তো শিখতাম না। লাভপুর অন্তত বিশ ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে থাকত।

তাঁর সঙ্গে আর একজন এসেছিলেন লাভপুরের সৌভাগ্যক্রমে। তিনি স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবু তাঁর মেসোমশায় হতেন। দরিদ্রের সন্তান, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা দেখে যাদবলালবাবুই তাঁকে পড়তে সাহায্য করেছিলেন ; এম. এ. পাস ক'রে আগ্রা কলেজে অধ্যাপনা করতেন, যাদবলালবাবুর কীর্তি স্থাপনের প্রারম্ভেই তিনি লাভপুরে এলেন। নূতন কালের শিক্ষায় প্রদীপ্তদৃষ্টি শক্তিশালী মানুষ, নিষ্ঠাবান সাধক, জীবনে বিপুল আশা ও উৎসাহ। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রমে যাদবলালবাবুর সকল কীর্তিকে সার্থক ও পূর্ণ ক'রে তুললেন। পরবর্তী কালে সমগ্র বীরভূম তাঁর কর্মে কল্যাণ পেয়েছে। তার সে কর্মের সূত্রপাত লাভপুরে। তিনি বিবাহও করেছিলেন লাভপুরে।

আজও স্মরণ করতে পারি, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমার বুকের ভিতরটা যেন গুরু গুরু শব্দে ধ্বনি তুলত। যখনই কালপরিবর্তনের কথা স্মরণ করি, তখনই আমার কল্পনানেত্রে আমি দেখতে পাই, লাভপুরের পশ্চিমদিকে গেরুয়া রঙের প্রান্তরে বেদী বাঁধা হয়েছে, সমিধ সংগৃহীত হয়েছে, নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। স্বর্গীয় যাদবলাল-বাবু স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যজমান ; যজ্ঞস্থলে বেদীর উপর উত্তরসাধকের বেশে স্থান গ্রহণ করেছেন অবিনাশবাবু। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্করবাবুরা দল বেঁধে ; ও দের পিছনে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। স্বয়ং কাল-পুরোহিত।

যজ্ঞ প্রজ্বলিত হ'ল। ঘৃতগন্ধে আকাশ-বাতাস ভ'রে উঠল। মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। সব পাল্টে যেতে শুরু হ'ল। দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু হ'ল সব।

১২

আমার শৈশবকালের পটভূমিতে দেশের দ্রুত পরিবর্তন, সমাজের পটভূমিতে গ্রামের দ্রুত পরিবর্তনের উপরেও আমাদের পারিবারিক জীবনে এল এক মর্মান্তিক পরিবর্তন। আমার বয়স তখন আট বছর। সে-কথা বলবার আগে আমার ছেলেবেলার নিজের কথা কিছু বলে নেব। আমার মনে যে ঘটনাগুলি ছবি হয়ে রয়েছে সেইগুলির কথা। যে যে শৈশব-সাথীদের চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই তাদের কথা। আগে বলব ঘটনার কথা।

আমার জীবনে প্রথমে সঙ্গী আসে নি, বন্ধু আসে নি, এসেছিল সঙ্গিনী, বন্ধবী। তার কথা আগে বলেছি। চারু আমার সম্পর্কে ভাইঝি, আমার থেকে বছর দেড়েক বড। আমাদের বাড়ীতে কোনো শিশু ছিল না, আমাদের সঙ্গে এক দেওয়ালে বাড়ী আমার জ্যাঠামশায়ের বাডীতেও কোনো শিশু ছিল না। আমাদের বাড়ীর দৌহিত্র বংশের কন্যা চারুই ছিল আমাদের নিকটতম বাড়ীতে আমার একমাত্র সমবয়সী। তার মা—আমার বউদিদি আমার মার চেয়ে বয়সে ছিলেন অনেক বড়। তবুও সে-কালের প্রথা অনুযায়ী—বয়সে ছোট শাশুড়ীকে প্রণাম করতেন, ভক্তি করতেন। সে ভক্তি ছিল স্বতস্ফূর্ত। তার কারণ অবশ্য আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব এবং শক্তি। তাঁর কাছে আপনি মাথা নুয়ে পড়ত। তাঁরা সবাই ছিলেন আমার মায়ের গল্পের আসরের শ্রোতা।

চারু আমাকে পৃথিবীর অনেক কিছু চিনিয়েছে। বাড়ীর আশপাশ থেকে গাছ তুলে এনে সিমেণ্ট-বাঁধানো উঠানে বাগান করতাম, চারু আমায় গাছের নাম বলত। আমের আঁটি থেকে ভেঁপু তৈরী হয়, এ-কথা সে-ই আমাকে বলেছিল। কাগজের নৌকা করতে সে-ই আমাকে শিখিয়েছিল। পুতুল খেলতে শিখিয়েছিল।

চারু আমার অত্যাচার সহ্য করেছে অনেক। মেয়ে ব'লেই বোধ

হয় বয়সে বড় এবং দৈহিক শক্তি বেশী থাকা সত্ত্বেও সে আমার প্রহার সহ্যই করত, কখনও আমার গায়ে হাত তোলে নি। একবার তার উপর চরম অত্যাচার করেছিলাম। এর আগে দেওঘর যাওয়ার কথা বলেছি। চারুর মাও পুত্রসন্তান কামনায় আমাদের সঙ্গে দেওঘর গিয়েছিলেন, সঙ্গে চারুও গিয়েছিল। চারুর কাকা—আমার আশুদাদা—তিনি সঙ্গে গিয়েছিলেন—তাঁর ছিল অম্লশূলের ব্যাধি আশুদাদার স্ত্রী তাঁর জন্য ধর্না দিয়েছিলেন। আশুদাদা আমার প্রথম শিক্ষক। দেওঘরে হ'ল হাতেখড়ি; সেইখানেই তিনি শুরু করলেন আমাকে পড়ানো। আশুদাদা ছিলেন ছোটখাটো মানুষটি, মুখে ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সাধারণ লোকের কাছে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি বড় সুন্দর মানুষ। ছোটখাটো মানুষ আশুদাদার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আমার বাবা আমাদের অঞ্চলে ব্যক্তিত্বের জন্য, গম্ভীর প্রকৃতির জন্য খ্যাতনাম ছিলেন। আজও তাঁর নাম আমাদের গ্রামের আজকালকার প্রবীণেরা ক'রে থাকেন। আমার বাবার চেয়ে আশুদাদা বয়সে বড় থাকলেও সম্পর্কে ছিলেন ভাইপো, প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অনেক ছোট। কিন্তু আশুদাদা বাবাকে অনেক সময় তিরস্কার করতেন। বিশেষ করে, জমিদার বংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে মামলা-মকদ্দমা করার ক্ষেত্রে বলতেন—কেন? মামলা কেন? যদি আপসে কথা বললে মিটে যায়, তবে মামলা কেন? আরও তিরস্কার করতেন যখন মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দল এসে অতিথি হ'ত। বাবা হাসিমুখে সহ্য করতেন। আমার যত ভালবাসা ছিল এই মানুষটির উপর, তত ভয় ছিল। এই আশুদাদাও গিয়েছিলেন দেওঘরে। পাণ্ডাদের মহল্লায় বেশ একটা বড় বাড়ীতে বাসা হয়েছিল। কয়েকখানা ঘর প'ড়ে ছিল—তার মধ্যে একটাতে ছিল বোলতার চাক। একটা দ্বিপ্রহরে চারুর সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে দু'জনে বোলতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলাম। ছোট ছোট ঢেলা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলাম পূর্ব থেকেই। ঢেলা ছুঁড়তে শুরু করলাম।

ঢেলা লাগে না। তখন চারুই বললে—একটা লম্বা কিছু নিয়ে খোঁচা দিলে কি হয়?

কি যে হয় তা চারু কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপলব্ধি করলে। লম্বা একটা কিছু—বোধ হয় ঘর ঝাড়বার জন্য একটা বাখারি-জাতীয় কিছু—বাড়ীওয়ালারা বাড়ীতেই রাখত—সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলাম। বোলতারা ভোঁ-ভোঁ ক'রে উড়ল—উড়ে তেড়ে এল। আমি বুঝে নিলাম কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ-দৌড়—পিছনে অনুসরণ করছে বোলতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজাটা দিলাম টেনে। চারু চীৎকার করতে লাগল ঘরের মধ্যে। মর্মান্তিক আর্তনাদ। আর্তনাদ শুনে ওদিক থেকে আশুদাদা চীৎকার ক'রে শাসন করলেন চারুকে, আমি আর দরজা খুলতে সময় পেলাম না, পালিয়ে এসে ঢুকলাম বাবার বিছানায়। চারু বোলতার কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। তবু সে আমার উপর রাগ করে নি। তবে চারুটা ছিল বুদ্ধিহীন, আশুদাদা বলতেন—মাথামোটা। দুর্ভাগিনী চারু আজও বেঁচে আছে। ভাইদের সংসারে নিঃসন্তান চারু জীবনের ভার বহন ক'রে চলেছে। দুর্দান্ত মুখরা মেয়ে। আমি যখন দেশে যাই, তখন সর্বাগ্রে দেখা হয় চারুর সঙ্গে। চারুর ভাইয়েরা গ্রামের ভিতর থেকে স'রে এসে স্টেশনের ধারে বাড়ী করেছে। আগে থেকে খবর জানা থাকলে চারু পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। নইলে আমার সাড়ায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ছানিপড়া চোখের মোটা কাচের চশমা আমার মুখের উপর তুলে আমায় দেখে বলে, এলেন? ওরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে! এক যুগ পরে? ব'লে সেই পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।

আমি বলি—ভাল আছিস তুই?

—ভাল? ভাল কি ক'রে থাকব, বেঁচে রয়েছি যে! চারু হাসে।

চারুর পরে এল বন্ধুরা। প্রথম বন্ধু কে তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, দু'জন প্রায় একসঙ্গেই এসেছিল। একজন লক্ষ্মীনারায়ণ—অন্যজন প্রতুলকৃষ্ণ। ডাকনাম—নারাণ আর খোকা। শান্তশীল আর

অশান্তশীল। একজন যত শান্ত, যত মধুর প্রকৃতি, অপরজন তত অশান্ত তত বিচিত্র দুষ্টবুদ্ধি। নারায়ণ স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর মেজ বোনের ছেলে, যাদবলালবাবুর দৌহিত্র, তার মা গ্রামের মেয়ে, আমার মায়ের সমবয়সী, কিছু ছোট, সখী। তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে এলেন। নারাণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আমার ছিল বিখ্যাত কার্তিক-গড়িয়ে মতিলাল মিস্ত্রীর হাতের তৈরী দুটি কার্তিক ঠাকুর। একই হাতের তৈরী, কিন্তু একটি ছিল খারাপ। খুব তাড়াতাড়ি গড়া ব'লেই এমন হয়েছিল। মতি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে গড়েছিল। আমিই দুটির নামকরণ করেছিলাম—বাবু-কার্তিক আর পেয়াদা-কার্তিক। আমি ছিলাম দুই কার্তিকেরই মালিক সুতরাং আমি অনুগ্রহ ক'রে নিত্যই নারাণকে দিতাম পেয়াদা কার্তিক। কোনো-কোনোদিন জেদ ধরত, আজ বাবু-কার্তিক নেবেই সে। আমি তখন বলতাম—তবে আমি খেলবই না। তারপর জানালার গরাদ ধ'রে জানালায় উঠে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হাত পুরে বাইরে আনতাম আর আকাশে উড়িয়ে দিতাম কাল্পনিক পায়রা।

—এই - গিরে মদা—হুস—ধা!

গিরে মদা, অর্থাৎ গিরি নামক কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কেনা মদ্দাটা।

—এই—তিলে মাদী—হুস—ধা!

অর্থাৎ তিলের মত অজস্র কালো বিন্দু আছে গায়ে যে মাদী পায়রাটার—সেইটা।

এ সব নাম এবং এই পায়রা ওড়ানোর ভঙ্গি শিখেছিলাম আশুদাদার ভাইপো ষষ্ঠীর কাছে। সে ষষ্ঠী নির্মলশিববাবুর সমবয়সী, থিয়েটার-প্রসঙ্গে যার নাম এর আগে করেছি—তার কাছে।

নারাণ অবশেষে পেয়াদা কার্তিক নিয়েই খেলতে রাজী হ'ত। এর পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধারা পাল্টাল। নারাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হ'ল না। বোধ হয় তখন আট-দশ বছর বয়স, তখন থেকে একটা নূতন খেলা খেলতে শুরু করেছিলাম আমরা দু'জনে। রামায়ণ

খেলা। খেলাটা আমার আবিষ্কার। তখন রামায়ণ পড়েছি, তিন-চারবার তো নিশ্চয়। রামায়ণের কাহিনী কণ্ঠস্থ। এমন কি, বানর সেনাপতিদের সুগ্রীব-অঙ্গদ-নল-নীল-গয়–গবাক্ষ ক'রে সমস্ত নাম—মহাবীর হনুমান তো বটেই, ওদিকে রাক্ষস সেনাপতি খর, দূষণ, ভস্মলোচন, অতিকায়, তরণীসেন—সব নাম মুখস্থ। আমাদের দেশে গেরুয়া রঙের খোয়াইয়ের মধ্যে অজস্র বিচিত্র আকারের বিচিত্র বর্ণের—লাল নীল সবুজ নুড়ি ছড়ানো। সেই নুড়ি কুড়িয়ে আনতাম পকেট এবং আঁচল ভর্তি ক'রে। তার থেকে রঙ এবং আকার মিলিয়ে কোনোটিকে করতাম রাম, কোনোটিকে লক্ষ্মণ, কোনোটি হনুমান, কোনোটি রাবণ, কোনোটি কুম্ভকর্ণ, কোনোটি অতিকায়, কোনোটি মেঘনাদ। বারান্দায় খড়ি দিয়ে সেতুবন্ধ থেকে স্বর্ণলঙ্কা এঁকে দুইদিকে প্রস্তর বাহিনী সাজিয়ে—রামলীলা হ'ত। তালশিরের কাঠিতে সুতো বেঁধে হ'ত ধনুক এবং ঝুঁচকাটি ভেঙে করতাম তীর। সীতাহরণ থেকে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত এই খেলা চলত। বলা বাহুল্য, আমিই বেশির ভাগ নিতাম রামপক্ষ, নারাণকে নিতে হ'ত রাবণপক্ষ। তাই নিত নারাণ। নারাণের চরিত্রের মধ্যে ছিল নির্মলশিববাবুর ওই মহৎ গুণের প্রতিফলন—অক্রোধ-গুণ। আরও গুণ তার ছিল—সে ছিল সত্যকারের সমাজ-কর্মী। প্রথম যৌবনে—চরকা খদ্দর নিয়ে সংগঠনে সত্যকারের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ওই এক পথে, যে পথে নির্মলশিববাবু হয়েছেন সাধন-ভ্রষ্ট, সেই পথে নারাণও হ'ল সাধন-ভ্রষ্ট। সে-কথা থাক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দো-পনরো বছর বয়সে—আবার খেললাম নূতন খেলা। তখন আমরা দুই দলের দুই নেতা। আমরা যুদ্ধ করলাম। ওই যুদ্ধের খানিকটা ছাপ আছে 'ধাত্রী দেবতার' প্রথমে।

তারপর বয়স বাড়ল। বন্ধুত্ব বিচিত্রভাবে পরিণত হ'ল সম্পর্কে। সে হ'ল আমার ভগ্নীপতি—আমি হলাম তার ভগ্নীপতি। কিন্তু দু'জনের জীবনপথ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করছে তখন। বলতে ভুলেছি সাহিত্যচর্চা, তাও শুরু করেছিলাম দু'জনে একসঙ্গে।

নিত্যগোপালবাবুর কবিতা লেখা দেখে আমরাও কবিতা রচনা করলাম—

শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকদের আনন্দ বাড়িল।

আর এরই মধ্যে এল প্রতুলকৃষ্ণ—খোকা।

চারুর জ্ঞাতি-ভাই খোকা। নিত্যগোপালবাবুর আপন খুড়তুত ভাই। আমরা ইস্কুলে এক ক্লাসে ভর্তি হলাম। খোকা, আমি আর শিবকৃষ্ণ—তিনজন ছাত্র ক্লাসে। খোকা প্রথমবার হ'ল ফার্স্ট, হয়ে ডবল প্রমোশন নিলে। আমি সেকেণ্ড, ক্লাস প্রমোশন পেলাম। শিবকৃষ্ণ থার্ড, ফেল হ'ল। কিছুদিন পর খোকাকে একদা দেখলাম, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে ঘুরছে। আমাকে ডাকলে। আমি গেলাম। অনেক কথা হ'ল। সে সমস্তই হ'ল কেমন ক'রে নির্মলশিববাবু-নিত্যগোপালবাবুর মত ফ্যাশনেব্‌ল হওয়া যায়। খোকা বললে—ওরা দাড়ি কামায়। ওরা ছ' আনা দশ আনা চুল কাটে। তাই এমন সুন্দর দেখায়। সে বের করলে একটা কাঁচি, এবং প্রস্তাব করলে সে আমার চুল কাটবে—আমায় কামিয়ে দেবে, আমি করব তার ক্ষৌরকর্ম। সে প্রথমেই আমার মাথার পিছনে চালালে কাঁচি। তারপর বললে, ঠিক হয়েছে। এইবার দাড়ি। কিন্তু দাড়ি তো নেই, কি কামাবে? অথচ না কামালে চলবে না। অতএব ভুরুর উপর চালালে কাঁচি। তারপর আমি ধরলাম কাঁচি। কয়েক মহূর্ত পরে যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে তাকে ছেড়ে দিলাম।

মা পিসীমা মুখ দেখে অবাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

১৩

খোকার কথা অনেক।

আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়; হিলহিলে লম্বা। কথায় কথায় ফিক্-ফিক্ ক'রে হাসত। দারুণ দুঃখেও তার সে হাসি বন্ধ হ'ত না। মায়ের একমাত্র সন্তান। প্রকাণ্ড একটি পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে

উঠেছে। খোকার বাপ-খুড়োরা ছয় ভাই। সে-আমলের নিয়ম অনুযায়ী খোকার মা-খুড়ী-জ্যেঠীদের আসল নাম কেউ জানে না। বউরা বাড়ীতে পদার্পণ করবামাত্র নামকরণ হ'ত— মতি-বউ, যুঁই-বউ, বলি-বউ, শরৎ বউ, মানিক-বউ, রানী-বউ, সৌরভ-বউ ইত্যাদি। বউদের নামের মধ্যে মূল্য এবং সৌন্দর্য দুই বোধেরই পরিচয় চোখে পড়বে। সমাদর যেখানে বেশী সেখানে মানিক বউ নাম পেতেন বউ-মানিক, রানী বউ হতেন বউ-রানী। খোকার মায়ের নাম ছিল— যুঁই-বউ, লোকে ডাকতো যুহি-বউ বলে। অতি শান্ত সরল মিষ্ট প্রকৃতির ছোটখাটো মানুষ ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সে বৈধব্যের আঘাত যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড: ছোট দেওরের বিবাহে গেল তাঁর বড় ছেলে, খোকার দাদা অতুল, আর ফিরল না, কলেরায় মারা গেল। সেখান থেকে ফিরেই তিনদিন কি চারদিনের দিন মারা গেলেন স্বামী। কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়ীর আনন্দ আয়োজনের আসরে যুহি-বউদি একসঙ্গে হারালেন স্বামী পুত্র। যুহি-বউদি মারা গেছেন গত বৎসর ১৩৫৬ সালে। খোকার উপর তাঁর প্রত্যাশা কতখানি ছিল তা বুঝতে পারি নি, কখনও কোনো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখি নি। খোকা কলকাতাতেই থাকে। আমি কলকাতা থেকে গেলে বউদির সঙ্গে দেখা হ'ত; কিন্তু কখনও প্রশ্ন করেন নি —খোকার সঙ্গে দেখা-টেখা হয় নি ভাই? এর একটা কারণ আমার মনে হয়, এই সংসারটির সে-আমলের অস্বাভাবিক অতি কঠোর ব্যবস্থার ফল। এরই জন্যে খোকা জীবনে হয়েছে অকৃতকার্য— ব্যর্থ। নিত্যগোপালবাবুর নাম পূর্বে করেছি—তিনি এই বাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, ভগবানের অজস্র প্রসাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দুর্লভ রূপ, দুলভ মধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি; বলেছি তো অজস্র প্রসাদ। সংসারের এই কঠোর ব্যবস্থার ফল তাঁর জীবনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। অন্তঃপুরে খোকার কুণ্ডলিনী পিসীমা ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী, বাই'রে কর্তা ছিলেন ওঁদের সেজকাকা।

একজন জ্বলন্ত চুল্লী, অপরজন উত্তপ্ত কটাহ। ষোলো-সতেরো বয়স যখন নিত্যগোপালবাবুর—যখন তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবেন তখনও বেত্রাঘাতে তাঁর পিঠ জর্জরিত ক'রে দিয়েছেন সেজকাকা। তাঁর প্রচণ্ড শাসনের অন্তরালে ছিল—এমন উচ্চাশা, যা মানুষকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়। সম্ভবত, সম্ভবত কেন—নিশ্চয়ই, তার উগ্র উচ্চাশা ছিল এই যে, তাঁদের বাড়ীর ছেলেরা প্রত্যেকেই হবে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, মাইনরের পর থেকে এণ্ট্রান্স, এফ-এ, বি-এ, এম-এতে বৃত্তি পাবে, প্রথম হবে, পরিশেষে হবে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জজ। এই গ্রামের অপর যে সকল পরিবারের মাথা তাঁদের পরিবারের মাথা থেকে উঁচু হয়ে আছে, সেগুলিকে অবনত ক'রে দেবে। তাঁর সকল শাসন ছিল—গ্রাম্য ঈর্ষা-বিদ্বেষের উত্তাপে উত্তপ্ত। সে-আমল; দৃষ্টি একমাত্র আবদ্ধ ছিল সরকারী চাকরির প্রতি। নইলে নিত্যগোপাল-বাবুর প্রতিভার বিকাশে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারত। থাক। খোকার কথা বলি। খোকারও ছিল মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং তার বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ণ; সে আর কিছু পারুক না-পারুক, পরীক্ষা পাস ক'রে বি. এ ডিগ্রী নিয়ে কোনো বড় অপিসের হেডক্লার্কও হতে পারত। কিন্তু সেজকাকার শুভ কামনার উগ্রতা সে সহ্য করতে পারলে না। ক্লাসে সে ফার্স্ট হতেই সেজকাকা হেড মাস্টারকে ধ'রে তাকে ডবল প্রমোশন দেওয়ালেন। খোকা পড়ত আমার সঙ্গে, আমাকে পিছনে ফেলে উপরে চ'লে গেল—সেজকাকার উগ্র উচ্চাশা সেদিন পরিতৃপ্ত হয়েছিল সাময়িকভাবে। তারপর অন্তরালে যা ঘ'টে গেল—সে দেখবার দৃষ্টিও তাঁর ছিল না, অবকাশও ছিল না। বেচারা শিশু হাঁটুজলে সাঁতারে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে ব'লে তাকে অগাধ জলে ঠেলে দিয়ে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন—মধ্যসমুদ্র থেকে তুলে আনুক সহস্রদল পদ্মটি, যার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন কমলালয়া লক্ষ্মী। প্রথম ভাগ পড়ে (সত্যসত্যই প্রথম ভাগ, পাঠ্য-বইয়ের নাম ছিল শিশুপাঠ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সংক্ষিপ্ত ক'রে সে এক বিচিত্র বই) ফার্স্ট হয়েছে ব'লে খোকাকে ঠেলে

উঁচুতে তুলে দ্বিতীয় ভাগ বাদ দিয়ে—তার সামনে প্রায় ধ'রে দেওয়া হ'ল চারুপাঠ। খোকা বেচারা—চারুপাঠে ভীমভীষণ ঝঞ্ঝাতাড়িত 'উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ অর্ণববক্ষে' প'ড়ে গিয়ে ডুবে গেল অবর্ণতলে, অথবা উত্তাল তরঙ্গমালায় তাড়িত হয়ে ঊষর বালুবেলায় নিক্ষিপ্ত হ'ল; যে বেলাভূমে—মুক্তা তো দূরের কথা, ঝিনুক শামুকের একটা কুচি পর্যন্তও নাই। পালাতে লাগল খোকা। বাড়ীতে পড়তে ব'সে পালাতে লাগল, স্কুলে ক্লাস থেকে পালাতে লাগল, মিথ্যা কথা বলতে শিখলে বাধ্য হয়ে, ছেলেমানুষ অপটুভাবে মিথ্যে বলত। প্রথম প্রথম পালাবার স্থান আবিষ্কার করলে—'পেম্‌না' নামক এক গন্ধবণিকনন্দন বন্ধুর বাড়ীতে। ব'সে থাকত, তামাক খেত। ক্রমে সে স্থানের সন্ধান জানাজানি হতেই যত্র-তত্র ধাবমান হ'ল।

অনেক দিন পরের একটা ঘটনার কথা বলছি। তখন আমার ফার্স্ট ক্লাস। খোকা তখনও ফোর্থ ক্লাসে। সেই বোধ হয় স্কুলে শেষ বৎসর খোকার। আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছি; বড় হলের মধ্য দিয়ে পথ; হলে দু'টো ক্লাস বসে পাশাপাশি—ফোর্থ ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। ফোর্থ ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন আমাদের সেকেণ্ড মাষ্টার মশাই ননীবাবু, তিনি আমায় দেখেই হঠাৎ বললেন—এই হয়েছে। শোন তো তারাশঙ্কর।

দেখলাম, খোকা দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বইয়ের আড়াল দিয়ে অবশ্য। সেকেণ্ড মাষ্টার বললেন, শ্রীমান প্রতুলকৃষ্ণের বাড়ী তো তোমাদের পাশেই। এক খিড়কির ঘাটেই তো আচরণ তোমাদের। বলতে পার—শ্রীমান প্রতুলের মা নাকি কাল খিড়কির ঘাটে পা পিছলে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

কি বলব ভেবে পেলাম না। এমন কোনো সংবাদও শুনি নি, তার উপর আজই তাঁকে বকতে শুনেছি। খোকাকেই বকছিলেন।

আমি বিব্রত হলাম, কিন্তু খোকা হেসেই চলল সমানে।

মাষ্টার মশাই বললেন, অতঃপর আজ তোমাদের বাউরীপাড়ায় একটা নাকি দাঙ্গা হয়ে গেছে?

দাঙ্গা হয়েছে কি না জানি না, তবে বাউরীপাড়ায় ঝগড়া তো লেগেই থাকে, আজ সকালেও গোলমাল একটা শুনেছি। হঠাৎ প্রতুল ব'লে উঠল, এই ডাক্তারবাবুকে শুধান না স্যার। বাঁকা বাউরী আর নন্দ বাউরীর শালার মধ্যে ঝগড়ায় লাঠালাঠিতে নন্দর মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে কি না? বলুন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু স্কুলে কোনো প্রয়োজনে এসে হলে মাত্র প্রবেশ করেছেন। হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, দু'ফাঁক ঠিক নয়, তবে কেটে খানিকটা গিয়েছে। খোকাই নিয়ে এসেছিল তাকে ডাক্তারখানায়। কিন্তু সে-কথা এখানে কেন? কি ব্যাপার?

মাষ্টার বললেন, আমি পরশু শ্রীমান প্রতুলকে আলটিমেটাম দিয়েছি যে, বেতন নিয়মিত দিলেই যে তুমি এই ক্লাসের বেঞ্চিতে বসতে পাবে, তা পাবে না। হয় পড়াশুনা কর, নয় স্কুল ছাড়। পাকা উচ্ছেদের নোটিশ। কি প্রতুল, বল, কথা ঠিক কি না?

খোকার নাকের নীচের অংশটা খোলা বইটায় ঢাকা, উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছিল, সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, কথা ঠিক।

খোলা বইয়ের আড়ালের অন্ধকারে ঠোঁটের উপর মুচকি হাসি ঘন ঘন খেলে যাচ্ছিল, সে সত্য অন্ধকার ঘরে শব্দ তুলে ছোট্ট ইঁদুরের ছুটে বেড়ানোর মত শব্দের ইঙ্গিতেই আত্মপ্রকাশ করছিল। খোকার মুখের আ'ড়াল দেওয়া বইয়ের ভিতর থেকে শব্দ উঠছিল খুক্-খুক্-খুক্।

মাস্টার মশায় বললেন, কিন্তু কাল পড়া জিজ্ঞাসা করতেই, ঠিক এমনিভাবে বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়াল এবং কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বললে—কাল খিড়কির ঘাটে প'ড়ে গিয়ে ওর মা সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন—শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, তাঁর সেবা করতে গিয়ে পড়া করবার অবকাশ পায় নি। মাতৃভক্তি, মাতৃসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার কি ক'রে করি? কাল সন্তুষ্ট মনে মার্জনাই করেছিলাম। আজ জিজ্ঞাসা করলাম পড়া, আজও ঠিক কালকের অবস্থা—ওই দেখুন না, বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ বলছে বাউরীপাড়ায় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছিল

কোনো এক বাউরী-বধূকে নিয়ে; দুই বীরপুঙ্গবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সে যুদ্ধ থেকে কেউ তাদের নিবৃত্ত করতে পারে নি—অগত্যা ও:কেই যেতে হয়েছিল রণাঙ্গনে। যুধ্যমান দুই বীরের উদ্যত মহাস্ত্রের মধ্যস্থলে উপবীতধারী দেবতার মত দাঁড়িয়ে ওকে বলতে হয়েছে—ক্ষান্ত হও। নতুবা ভস্ম করে দেব। তবে তারা ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, বিচার করতে হয়েছে—ওই কন্যাটি কার প্রাপ্য—

খোকা বললে, তারপর নন্দার শালার মাথা ফেটেছিল, তাকে—

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে এনেছিল। একটু টিংচার আইডিন দিয়ে বেঁধে দিলাম।

মাস্টার মশায় বললেন, তবে আজও তোমার মার্জনা। জনসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার করব কি ক'রে? ব'স প্রতুলচন্দ্র।

যাক, আগে তার গোড়ার কথা বলি।

প্রতুল ডবল প্রমোশন নিয়ে—পরের বারে ফেল হ'ল পরীক্ষায়। প্রতুলের সেজকাকা যত চটলেন প্রতুলের উপর, তত চটলেন পরীক্ষকদের উপর। তিনি রেগে ইস্কুলে গেলেন এবং রাগারাগি ক'রে প্রতুলকে প্রমোশন দেওয়ালেন, এবং আমাদের বাড়ীতে আমার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু তখন তার শিশুমন অরণ্যবহ্নির উত্তাপে আতঙ্কিত কুরঙ্গশিশুর মত পলায়নপর জীবনে সে আতঙ্ক ব্যাধির মত পেয়ে বসেছে। সে একমাত্র পথ আবিষ্কার করেছে—পলায়ন। সে পালাতে চায়, ছুটে পালায়, জ্ঞানরাজ্য সমাদর ক'রে ডাকলেও সে কর্ণপাত করে না। নিত্য সন্ধ্যায় সে পড়তে আসত। আমার গৃহশিক্ষক ব্রজেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় দুর্বলদেহ মানুষ ছিলেন। তার উপর ছিল তাঁর নিতান্ত অল্পবয়স। অতি সৎপ্রকৃতির আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন, স্কুলে পড়াতেন কঠিন পরিশ্রম ক'রে। পড়ানোর সূচীর মধ্যে তাঁর কাজ ছিল—ড্রিল শেখানো। প্রায় দু' ঘণ্টা—দুটো থেকে চারটে—নিজে ড্রিল ক'রে দেখিয়ে ড্রিল শেখাতেন। স্কুল থেকে ফিরতেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে। সন্ধ্যায় পড়াতে ব'সে পড়াগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি

প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। যেমন তাঁর নাক ডাকা শুরু হ'ত, অমনি খোকা পড়া বন্ধ করত। দু' মিনিট—তিন মিনিট–পাঁচ মিনিট অন্তর পড়া বন্ধ করত, এক মিনিট দু' মিনিট তিন মিনিট নীরব থাকত আবার শুরু করত—মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড। তারপর হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরত; আমি মুখ তুলে চাইলেই ফিক্ ক'রে হেসে ফিসফিস'ক'রে বলত—আমি চললাম। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করতাম আমি—কোথায়? বা কেন?

সে বলত, বাড়ী।

আমি পড়তে পড়তেই আঙুল দেখিয়ে দিতাম মাস্টারের দিকে।

সে বলত, ব'লো তার মা ডাকছিল।

খোকাদের বাড়ী এবং আমাদের বৈঠকখানাবাড়ী সামনাসামনি, মাঝখানে হয়তো দশ ফুট চওড়া একটা গ্রাম্য রাস্তা। ওদের বাড়ীর কথাবার্তা আমাদের এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যেত। ওই কথা ব'লেই খোকা বই বগলে নিয়ে অন্ধকার রাস্তার আমাদের বৈঠকখানার উঁচু দাওয়া থেকে ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়ত। সিঁড়ি বেয়ে নামবার বিলম্ব তার সইত না। মিনিট দুয়েক পরেই শোনা যেত খোকার পিসীমার উচ্চ কণ্ঠের কথা—এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেল খোকা?

এর উত্তরে খোকা কি বলত শোনা যেত না। কিন্তু ওর পিসীমার কথা শোনা যেত—ভাত খেতে চ'লে গেল? এই তো সন্ধ্যে। এরই মধ্যে ভাত খেতে গেল?

এবার খোকার কথা শোনা যেত। সে এবার উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিত, না? গেল না? মাস্টার সন্ধ্যে বেলাতেই খেয়ে নেয়। ভূতের ভয় মাস্টারের। ওর নাম বু-বু মাস্টার, তা জান না—না কি? আমি হঠাৎ চমকে উঠতাম মাস্টার মশায়ের ডাকে—পড়্। তুই নিজে পড়্।

মাস্টার জেগে উঠেছেন ইতিমধ্যে। সম্ভবত খোকার পিসীমায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বরেই জেগে উঠতেন, এবং নিজের 'বু-বু মাস্টার' নাম শুনে লজ্জা পেতেন। তার প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ হতেন।

খোকার পিসীমা বলতেন, এই খানিকক্ষণ পড়ানোর জন্যে মাসে দু' দুটো টাকা ? বলছি আমি সাতনকে। এ যে গালে চড় মেরে টাকা নেওয়া !

তিনি ব'কেই যেতেন।

এদিকে ক্রোধ মাস্টারের মনে খোঁচা-খাওয়া সাপের গর্তে ঘুরপাক খাওয়ার মত ঘুরপাক খেত।

এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায় ! ছাত্রকে না পড়িয়ে তিনি ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে থাকেন ! বু-বু মাস্টার নামের লজ্জাও লঘু হয়ে যেত। অথচ এ নামটায় তাঁর ছিল অপরিসীম লজ্জা। আমাদের বাড়ীর ঠাকুর তরুণ ক্ষুদিরাম নিষ্ঠুর কৌতুক ক'রে মাস্টারকে ভয় দেখিয়েছিল। ঠাকুর ক্ষুদিরাম মাস্টার মশায়ের চেয়েও অল্পবয়সী ছিল। মাস্টারের বয়স ছিল কুড়ি-বাইশ, ক্ষুদিরামের ছিল সতেরো-আঠারো। আমাদের বৈঠকখানা থেকে ভিতর-বাড়ী যেতে একটি দীর্ঘ গলিপথ অতিক্রম করতে হয়। দু' পাশেই আমাদের নিজেদের লোকের বাড়ী-ঘর। আমার জ্যেঠামশায় পেয়েছিলেন আমাদের পুরানো বাড়ী, সে-বাড়ীর অনেক অপবাদ। একটা পুরানো ডুমুর গাছ গলির মাথায় ছত্রছায়া মেলে থাকত। সেখানে নাকি কেউ থাকতেন, মধ্যে মধ্যে দুটো পা ঝুলতে দেখা যেত—চকিতের মত; এই বাড়ীতেই ছিল একটা শিউলীগাছ, সেখানেও কেউ থাকতেন নাকি—তার মাথা ন্যাড়া, পায়ে খড়ম। তিনিও মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন, এবং তিনি দেখা দিলেই নাকি আমাদের পরিবারের মধ্যে কাউকে যেতে হ'ত। এই ভৌতিক গৌরব বা অপবাদগ্রস্ত গলি নিয়েই হোক বা অন্য কোনো হেতু হতেই হোক, মাস্টার মশায় ক্ষুদিরামের ভূত সম্পর্কীয় কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। অনেক নজীর দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞানবাদ বুঝাতে চেয়েছিলেন, সায়েবদের দোহাই পেড়েছিলেন এবং ক্ষুদিরামকে নির্বাক ক'রে দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম তখন নির্বাক হয়ে সেই রাত্রে মাস্টার মশায় যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের বাড়ীর ভিতর থেকে একাকী বৈঠকখানায় আসছেন, (সুকৌশলে

ক্ষুদিরাম সেদিন মাস্টারকে একাই ফেলেছিল) তখন হঠাৎ ওই গলির মধ্যে এক স্থানে ঝরঝর শব্দ তুলে এক রাশি কিছু বর্ষণ হয়ে গেল। সম্মুখেই ডুমুরতলা, তার ওদিকে শিউলীবৃক্ষ। মাস্টার মশায়ের রামকবচ—অভয়মন্ত্র বইয়ের মধ্যে আছে, বই তখন সঙ্গে নেই। কাজেই তিনি বু-বু বু-বু শব্দ ক'রে আমাদের বাড়ীর মধ্যেই ফেব দৌড়ে গিয়ে প'ড়ে গেলেন। শব্দটা তিনি প্রাণ খুলেই করেছিলেন, পাড়ার লোকে শুনেছিল, কাজেই ও-নামটা সেই দিন সেই ক্ষণেই করণ ক'বে দিলে লোকে। মর্মান্তিক লজ্জা সেই জন্যে। এ লজ্জাও তাঁব কাছে লঘু হযে যেত। টাকা নিয়ে ছাত্রকে পড়াতে তিনি ফাকি দেন। চোখ ফেটে তাঁব জল আসত। হতভাগ্য শিশুর মনের দুঃখ বুঝে ওঠা সহজ নয়, সে-আমলে এ দিকটায় বুঝবার মত আলোকপাতও হয় নি, কিন্তু শিশুর প্রতি করুণা-মমতা মানুষের অন্তরের সহজাত বৃত্তি, জৈব প্রবৃত্তির মত। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে হরণ ক'রে পশু তাকে হত্যাব পরিবর্তে পালন করেছে। মাস্টার মশায় হৃদয়বান মানুষ ছিলেন, তবুও পরদিন সন্ধ্যায় পড়তে এলেই তাকে ধরতেন চুলের মুঠোয চেপে। তারপর নির্মম প্রহার। কী কান্নাই কাঁদত প্রতুল। কিন্তু মাস্টার তাকে ছেড়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই সে চোখ মুছতে মুছতে আমাব দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলত। আমি তাকে বলতাম, আমি বলি নি রে। মাস্টার মশাই নিজেই শুনেছে।

সে ঘাড় নাড়ত ঠিক, ঠিক। তুমি বল নাই সে আমি জানি।

দু'-চার দিন আমিও ব'লে দিয়েছি। যে-দিন ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা হ'ত, অথচ খোকার পিসীমা ওদিকে কোনো গোল তুলতেন না সেই দিন সে-দিন আমাকেই তুলতে হ'ত সাড়া। ডাকতাম—মাশ-শাই—অর্থাৎ মাস্টার মশাই। স্যার। এদিকে টেনে নিতাম অঙ্কের খাতা।

—হুঁ!

—এটা হ'ল কি না দেখুন।

—কি, পড।

—অঙ্ক স্যার।

—এখন অঙ্ক নিয়ে বসলি কেন? উঠে বসতেন মাশ-শাই। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস ব্রজেন্দ্র পণ্ডিত অঙ্কশাস্ত্রে সত্যকাব পণ্ডিত ছিলেন। কলেজ-ক্লাসের গণিতশাস্ত্র নিয়ে আপন মনেই ক'ষে যেতেন। সে যে তাঁর কী আনন্দ, আমি তা ভুলব না। আবার কবিতাও লিখতেন, মস্ত খাতায় কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন। তিনি আজ নেই, কিন্তু কবিতার খাতার স্তূপ আছে। নাটকও লিখেছিলেন তিনি। সে-কথা থাক। খোকার কথাই বলি। জেগে উঠে ব'সে অঙ্ক দেখে বলতেন, কুড়কুড়ির ছা, ভুরভুরির মা. কষেছ তো ঠিক। বাঃ বাঃ! ওই বিচিত্র শব্দ দুটি তাঁর আবিষ্কার, ওর অর্থ তিনিই জানতেন। আমি যেটুকু বুঝতাম, সেটুকু মাস্টার মশায়ের স্নেহের সমাদর। মাস্টার এর পর লক্ষ্য করতেন খোকা নেই।

—খোকা? পালিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। বললে, জিজ্ঞাসা করলে বলিস, মা ডাকছিল।

—হুঁ।

এর পরই বলতাম—আমিও যাই স্যার।

—ওই ছোঁড়াই তোর লেখাপড়া হতে দেবে না। চল।

তার পরদিন আবার খোকাকে সৎপথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করতেন। এ দিনের প্রহার তত নির্মম হ'ত না। খোকা কাঁদত। আমার সঙ্গে কথা বলত না। কাঁদতে কাঁদতেই পড়ত। আমি মধ্যে মধ্যে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতাম, সেও তাকাত। একবার - দু'বার—তিনবারের বার খোকা ফিক্ করে হেসে ফেলত।

এই সময়টুকুর বাইরে খোকার সঙ্গে আমার কোনও সঙ্গ ছিল না। তার জীবন যেখানে মুক্তির অবকাশ পেয়েছে, সেইখানেই সে গিয়েছে। বাড়ী ঘর সমাজ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছে, নিচের স্তর থেকে আরও নিচের স্তরে গিয়েছে। সে যেন খুঁজত অন্ধকার। যে অন্ধকারে মানুষ শৃঙ্খলা শাসন-লজ্জা—সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত।

সেখানে সে ছুটত বুনো কালো ঘোড়ার মত। গ্রীষ্মের ছুটিতে খোকা গামছা কাঁধে বের হ'ল স্নান করতে। গিয়ে উঠল আমবাগানে। কাঁচা আম খেয়ে কামড়ে ছড়িয়ে দাঁত ট'কে গেলে উঠত তালগাছে। তাল কেটে খেয়ে জলে নেমে—পুকুরেব পাঁক ঘুলিয়ে বাড়ী ফিরত প্রায় তৃতীয় প্রহরে। তখন ভাত খেলেও চলে, না-খেলেও চলে। সেজকাকা তখন ঘুমিয়েছেন। বাড়ীর সবাই তখন ঘুমিয়েছেন। জেগে আছেন শুধু তার মা। এব পর হঠাৎ খোকা পেটের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চীৎকার করত। তারপর ভেদবমি। এই ভেদবমি তিনবার কলেরার পর্যাযে উঠেছে। আম জাম তাল এ-সবের সময় পার হয়ে গেলে খোকা ছুটত বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথে। সমস্ত কথা ভুলে গিয়েছি। দু'বারের কথা বলছি। একবার হঠাৎ দেখি, খোকা থিয়েটারের স্টেজের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। তখন পাকা স্টেজ হয়েছে। সামনেটা চট দিয়ে ঢাকা থাকে। সেই চটের একটা বড় ছিদ্র দিয়ে খোকার মুণ্ডটা বেরিয়েছে। সে মুণ্ডটা দুলিয়ে ডাকলে। লোভ সামলাতে পারলাম না। সে বললে, পিছনের জানালা দিয়ে এস। পেছন দিকে গিয়ে দেখলাম, জানালার একটা শিক নেই। শিকটা খোকা ছাড়িয়েছিল কি না খোকাই জানে। অন্যে ছাড়িয়ে থাকলে সেটা খোকার চোখ এড়ায় নি। জীবনের যে-দিকটা পিছনের দিক, যে-দিকটায় জ'মে থাকে আবর্জনা, ভাঙা খোলা—সে-দিকটার খবব ছিল খোকার নখদর্পণে। ওর চোখে পড়তই। আমি যখন ওদিক দিযে ঘুরে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন সে এরই মধ্যেই সেজেগুজে ব'সে আছে। মাথায় সখীর পরচুলো—একটা বেণীওয়ালা চুল প'রে দেওয়ালে ঝুলানো একখানা আয়নায় মুখ দেখছে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে, বললে, কেমন লাগছে বল তো?

আমারও সে-দিন ভাল লেগেছিল। আমিও পরলাম একটা পরচুল। আয়নায় মুখ দেখলাম। খোকা বললে, বিল্বমঙ্গলে আমি সাজব পাগলিনী, তুমি সাজবে চিন্তামণি। হোক?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম, মুখে বললাম, হ্যাঁ।

—দস্তখচংবাবুর চেয়ে আমি ভাল পার্ট করব। দেখো তুমি। ব'লেই সে গানও এক কলি গাইলে—কেমন মা তা কে জানে?

দস্তখচংবাবু হ'ল নিত্যগোপালবাবুর সে আমলের একটা চটানে নাম। আমাদের গ্রামে ফুল্লরা দেবীর স্থানে মেলা হয়। সে মেলায় সে-কালে বড় বড় যাত্রার দল আসত। একবার কলকাতার থিয়েটার পার্টিও গিয়েছিল। সে-বার এসেছিল ফকির অধিকারী মশাইয়ের নামজাদা দল। মেলায় যাত্রা হ'ল। দশখানা গ্রামের লোক দেখলে। দেখতে পেলে না কেবল আমাদের গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা। মেলায় মেয়েদের জন্যে আসরও করা হয়েছিল, কিন্তু তবু সেখানে যাওয়া চলত না সে-আমলে। হোক না কেন ফকির অধিকারীর দলের যাত্রাগান। এই কারণেই গ্রামের মেয়েরা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন—নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে একদিন যাত্রাগান করাতে হবে। —গ্রামের ভিতরে তাঁরা চাঁদা তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে কে? কর্তা, যাঁরা যাঁরা গ্রামের প্রধান তাঁদের কাছে এ-কথা বলতে সাহস হ'ল না। তাঁরা এসব কাজ কখনও করেন না। মেয়েরা ধরলেন নিত্যগোপালবাবুকে। নিত্যগোপাল নিজে সুকণ্ঠ গায়ক—গান-বাজনায় গভীর আসক্তি। তার উপর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, পনরো-ষোলো বছরের উৎসাহী ছেলে—সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ঘাড় পেতে তুলে নিলেন দায়। দলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা ব'লে এলেন। দলের ম্যানেজারের কাছে এ ধরনের বায়না নূতন নয়। তখন বাংলা দেশের কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামে যাত্রার দল তিনদিনের বায়নায় গেলে অন্তত ছ'দিন গান গেয়ে তবে বের হ'ত গ্রাম থেকে। এ-পাড়ার মেয়েরা ও-পাড়ায় যায় না, এ-বাবুর বাড়ী ও-বাবু যায় না, বাবুদের পাড়ায় দোকানী-পাড়ার লোকেরা বসতে পায় না; সুতরাং তিনদিন মূল বায়নার পর তিনদিন বাড়তি গাওনা গেয়ে তবে তারা ফিরত। এ-সব ক্ষেত্রে দক্ষিণাও কম নিত। খাওয়া-দাওয়া এবং শীতান্তে শীতবস্ত্রের 'সেল প্রাইসে'র

মত 'কম-সম' দক্ষিণা নিয়েই গান গাইত। আর মেয়েদের উদ্যোগের প্রতিভূ হয়ে এই রকম কিশোর ছাওয়ালরাই আসে বরাবর। দিনে চাল ডাল মাছ এবং রাত্রে ঘি ময়দা, আসরে পান তামাক আর টাকা পঞ্চাশেক দক্ষিণায় বায়না হ'ল। দশ টাকা বায়নাও দেওয়া হ'ল। ম্যানেজার পাকা লোক, বললেন, শর্তগুলো কাগজে লিখে কিন্তু এটায় সই ক'রে দিন।

নিত্যগোপালবাবু বললেন, বেশ তো। ব'লেই কাগজ কলম নিয়ে খস-খস ক'রে লিখে দিলেন।

ম্যানেজার বললেন, সইটা—? সইটা কি—

—আমিই করব। ব'লেই সই করে দিলেন—এন. জি. মুখার্জি।

সন্ধ্যায় যাত্রার দলের সাজ-পোশাক নিয়ে গরুর গাড়ী এল। সাজ-ঘরে আলো জ্বলছে, আসরও পড়েছে; কিন্তু নিত্যগোপালবাবু তখন লুকিয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে টাকা উঠেছে তার পরিমাণ দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। চাল-ডাল ঘি-ময়দা মাছ-তরকারি উঠেছে; কিন্তু টাকা উঠেছে তিরিশটি, আরও পাঁচ টাকার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু সে বাকি টাকা কোথায়? কি করবেন নিত্যগোপালবাবু? এ-দিকে যাত্রার দলের ম্যানেজার ব'সে রয়েছেন টাকার জন্য। টাকা না-নিয়ে গান শুরু করবেন না। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। শ্রোতারা এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে জনকয়েক গিয়ে বললেন, কই মশায়, কখন আরম্ভ করবেন? বাবুরা যে সব এসে গেছেন। কর্তারা তখন সত্যিই এসেছেন, তাঁরা সেদিন নিমন্ত্রিত অতিথি। ম্যানেজার বললে, আমরাও তো তৈরী। দেখুন না—সকলেই তৈরী। কিন্তু আমাদের টাকা কই? বাকি চল্লিশ টাকা দক্ষিণা—পান-তামাকের দু' টাকা; টাকাটা পেলেই শুরু করব। তিনি কই?

—কে?

—কে আবার? একটা তীক্ষ্ণকণ্ঠ ব্যঙ্গভরে ধ্বনিত হয়ে উঠল—সারা আসরটা ছড়িয়ে পড়ল। শনির ভূমিকার অভিনেতা শনি সেজেই

তার স্বভাবগত তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে ব'লে উঠল, কে আবার? সেই দস্তখচংবাবু মশায়। বায়না করতে গিয়ে কাগজ টেনে নিয়ে খসখস ক'রে লিখে—টানা ইংরিজীতে সায়েবী ঢঙে দস্তখচং সেরে দিলেন। সেই ছোকরা দস্তখচংবাবু?

কথাটা ছড়িয়ে দিলে শনি। বাবুদের কানে গেল। ব্যবস্থাও হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। তবু যাত্রা শুরু হয় না। কেন?—আরে মশায়, সে দস্তখচংবাবুকে আনুন, তিনি সামনে বসুন, তবে তো গাইব আমরা। গান হয়ে গেল। দল চলে গেল। লোকে গানের কথাও ক্রমে ভুলে গেল, কিন্তু নিত্যগোপালবাবুর 'দস্তখচংবাবু' নামটা লোকে সহজে ভুললে না।

খোকার জ্যাঠতুত দাদা নিত্যগোপালবাবু, খোকা আড়ালে তাকে বলে দস্তখচংবাবু। শুধু নিত্যগোপালবাবুকেই নয়, অন্তরালে নিজের বাড়ীর সকলকেই ডাকে এমনি ধরনের এক-একটা নাম ধ'রে।

দ্বিপ্রহরের অবসরে এমনিভাবে সে ঘুরে বেড়াত। আপনার মনে যা খুশি তাই করত এবং আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লেই এই অবসরের কীর্তি কলাপের কথা এমন রঙ দিয়ে বড় করে বলত যে, অবাক হয়ে যেতাম আমরা। ছোট একটা সাপ দেখে থাকলে বলত সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা মিস্ কালো আলান (কেউটে) সাপ, বুঝলে কিনা, বুঝলে কিনা—এই তার ফণা। কুলোর মতন—কুলোর মতন; চক্র কি? এই চক্র! আমাকে তাড়া করলে।

—তারপর?

- আমাকে তাড়া করলে। সোঁ-সোঁ ক'রে তাড়া করলে।

—হ্যাঁ। তারপর? তুই কি করলি?

—ছুটলাম। হ্যাঁ, ছুটলাম। আমিও ছুটলাম। বোঁ-বোঁ ক'রে ছুটলাম।

—সাপের দৌড়ের সঙ্গে মানুষ পারে?

—তা—পারে নাকি? কিন্তু—আমি—আমি—। আমি মন্তর জানি

কিনা। সেই সীতারাম বাবা সন্ন্যেসীর কাছে শিখেছিলাম। সেই মন্তর ব'লে বললাম—যা, ফিরে যা। সে তখন সুড়-সুড় ক'রে ফিরে গেল।

এমনি ধারায় থেমে থেমে নিজে মিথ্যা কথা ভেবে নিয়ে শ্রোতার চক্ষে প্রকট করে ধরেই সে মিথ্যে বলতে শিখেছিল। সে-অভ্যাস তার জীবনে আজও যায় নি। মিথ্যে যখনই বলে, এবং বলে সে প্রায়ই—অকারণেই বলে, নিঃস্বার্থভাবেই বলে—অপরের ঈষ না করেই বলে,—বলে এমনি থেমে থেমে। আমাদের গ্রামের লোক বা তার পরিচিত লোক সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বলে—থাম খোকা।

খোকা দুঃখিত হয় না, লজ্জিত হয় না, ফিক্ করে হাসে।

১৪

যখন ভাবি, এত অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে, অত্যন্ত পীড়াদায়ক অপ্রতিষ্ঠা ও গৌরবহীনতার মধ্যেও খোকা ওই হাসিটুকু বাঁচিয়ে রাখল কি করে, তখন আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

জীবনের অনুভূতি ম'রে গেছে? মনের ক্ষেত্র, সারা জীবন প্রশংসা প্রেরণা সস্নেহ উৎসাহের বর্ষণ না পেয়ে, শাসনের উত্তাপে, অবহেলা ও অপ্রতিষ্ঠার বালু-ঝড়ে একেবারে অনুর্বর হ'য়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে? হয়তো হবে। কোনো ফুলই ফোটাতে পারলে না সে তার জীবনে। শুধু প্রখর কিছু তার উপর উত্তাপ বিকিরণ করলেই তার জীবন-বিস্তৃত বালুকণা চিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে,—তার না আছে কোনো মূল্য না আছে কোনো অর্থ। মূল্য নাই, অর্থ নাই ব'লে লোকে হাসি দেখলেও চটে ওঠে। সকল লোকই চটে ওঠে—স্ত্রী পুত্র পর্যন্ত। আমার অনুমান, ওর স্ত্রীও ওর গল্পে বাধা দিয়ে বলে, থাম বাপু, আর ব'কো না।

—কেন?

—কেন? যত সব মিছে কথা—

—কক্‌খনও না।
—নিশ্চয় মিছে কথা। যা বলছ, তাই হয় কখনও?
—হয় না? তুমি সব জান!
—সব না জানি; এটুকু জানি যে, তোমার সব কথা মিছে।
—মিছে?
—নিশ্চয় মিছে।
—নিশ্চয় মিছে?
—নিশ্চয়—নিশ্চয় মিছে!
—এই দেখ—
এবার মুখের কাছে মুখ নেড়ে বউ বলে, নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে
—নিশ্চয় মিছে, একশো বার মিছে। হাজার বার, লক্ষ বাব মিছে।
ঢের ঢের মিথ্যাবাদী দেখেছি—তোমার মত দেখি নি।
এবার খোকা ফিক্ করে হেসে ফেলে। ওঃ, বউ কথাটা জোর বলেছে
—হাজার বার, লক্ষ বার মিছে! এঃ, ধরে ফেলেছে!
ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাড়ীতে-ঘরে পাড়ায়-গ্রামে দেশে-দেশান্তরে যত পরিচিত স্থান আছে, সর্বত্রই তাদের বাপের অখ্যাতি-অপবাদের কথা শুনে আসছে,' চোখেও দেখেছে, বাপের প্রতিষ্ঠা-হীনতার দৈন্য তাদের পীড়া দেয়—তারাও অনেক সময় গল্পমুখর খোকাকে বলে, তুমি বাপু, বড় বাজে বকো।
—বাজে বকি? জানিস তুই? শুয়ার কোথাকার!
—না! বকো না!
—অ্যাই—
—চুপ কর, চুপ কর—লোক আসছে, থাম। না যদি থাম তবে আমিই উঠে যাচ্ছি—যত খুশি পেট ভ'রে তুমি বাজে বকো মিছে কথা বল। 'পেট ভ'রে' কথাটা বিচিত্র উচ্চারণে বলে 'পে-ট ভ'-রে'।
ছেলে উঠেই চ'লে যায়।
অল্প দুটি একটি মুহূর্তের জন্যে খোকা স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর আপন মনেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে। ধ'রে ফেলেছে ছেলেটা।

অর্থহীন মূল্যহীন হাসি, বালুকণার ঝিকিমিকি। নীরস-নিষ্ফল জীবনের প্রতিফলন ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে। কেন মিথ্যে বলে—সে খোকা জানে না। হয়তো ওর আত্মা ব্যঙ্গ-ভরে বলে—সব ঝুট হ্যায়। তাই হয়তো মিথ্যে বলতে গ্লানির পরিবর্তে আনন্দ অনুভবই ক'রে থাকে খোকা।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, খোকা হাসে, কাঁদে না। কাঁদলে সে কোনদিন ম'রে যেত।

খোকার অনেক কীর্তি, কিন্তু কথা এইটুকুই—এর বেশী নয়। এক-একটা কীর্তি অপরটারই পুনরাবৃত্তি। থাক খোকার কথা এইখানে।

খোকার পর আরও বন্ধুরা এল. পাড়ারই ছেলে সব।

দ্বিজপদ, বৈদ্যনাথ, বড় পাঁচু, ছোট পাঁচু।

ক্রমে ও-পাড়া থেকে এল বংশী। তার পরের পাড়া থেকে বীরেশ্বর। বীরেশ্বর বয়সে আমার চেয়ে বড়। তারই মাধ্যমে আলাপ হ'ল আমাদেরই পাড়ার বীরেশ্বর বয়সী করালীর সঙ্গে।

দ্বিজপদ আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে।

আমার 'কবি' উপন্যাসের বিপ্রপদ—দ্বিজপদেরই অক্ষম রুগ্ণ অবস্থার চিত্র। বাল্যকালে দ্বিজপদ ছিল দুর্দান্ত দুরন্ত ক্রোধী, প্রচণ্ড রূঢ়ভাষী; কিন্তু আমার কাছে এবং আরও কয়েকজনের কাছে সে ছিল প্রীতি-মধুর, মিষ্টভাষী, অপরূপ মানুষ। আমার সঙ্গ সে খুব পেত না। তবে পেলে কৃতার্থ হ'ত। সম্পর্কে (দূরসম্পর্ক নয়) আমি হতাম তার দাদামশায়, তার মায়ের কাকা। সে, তার দাদা, তার বোনেরা আমাকে 'দাদামশায়' বলত। দ্বিজপদ ছাড়া সবাই ছিল বয়সে বড়। এদের সকলের চরিত্রেই ছিল দ্বিজপদের মত দুটি বিপরীতধর্মী মানুষ—একজন যত ক্রোধী, অপরজন তত মিষ্টভাষী। এর কারণ একেবারে রক্তগত বৈচিত্র্য, বংশানুক্রমের অতি সুস্পষ্ট প্রকাশ। দ্বিজপদের মা, আমার ভাইঝি ত্রিগুণাসুন্দরী—'তিগুণী'র বংশের ভাষা—তার নিজের ভাষা ছিল অতি মিষ্ট; দ্বিজপদের বাপের দিকের চরিত্রে ছিল অপরিমেয় রূঢ়তা, প্রচণ্ড ক্রোধ, কর্কশ উচ্চ কণ্ঠ; আর ছিল জৈব

আবেগের উন্মত্ততা, সে প্রায় অন্ধ উন্মত্ত ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলত জীবনকে। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাদা কালো দুটি স্রোতধারা যেমন পাশাপাশি চলে, তেমনি ছিল দ্বিজপদের জীবন। আমার ভাগ্যে আমি যতবার ওদের জীবনধারায় অবগাহন করেছি, ততবারই স্নাত হয়েছি স্নিগ্ধ শান্ত কালিন্দীর কালো জলের ধারায়।

দ্বিজপদ আমার চেয়ে বয়সে ছিল এক বৎসরের ছোট। পড়ত কিন্তু ক্লাস তিনেক নিচে, ক্রমে সে ব্যবধান—পাঁচ-ছয় ক্লাসের ব্যবধানে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজপদের কণ্ঠ ছিল উচ্চ, উল্লাস ছিল উগ্র, তেমনি প্রবল ছিল জৈব প্রবৃত্তির পথে ছুটবার আবেগ। দ্বিজপদের বাবা ছিলেন আমার বাবার বাল্যবন্ধু, সম্পর্কে হতেন নাতজামাই, প্রতিবেশীও ছিলেন অতি-নিকট। দ্বিজপদের বাবা নিত্য আসতেন আমার বাবার ওখানে। চা খেতেন, গল্পগুজব করতেন। রামজী গোঁসাই বাবা তাঁকে ডাকতেন 'রাজা' ব'লে। তার কারণ যৌবনে দ্বিজপদের বাবা গ্রামের যাত্রার দলে রাজা দুর্যোধন সাজতেন। রাজার মত চেহারাও ছিল। তাঁর কথা থাক। দ্বিজপদের কথা বলি।

আমার জীবনে দ্বিজপদ এবং বড় পাঁচু হঠাৎ একদা এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা ক'রে দিলে, সে সূচনা সূত্ররেখার মত সূক্ষ্ম সূত্রপাত থেকে ভবিতব্যের রেখায় মিলে প্রশস্ত হয়ে হ'ল পায়ে-চলা পথ: তারপর পরিণত হ'ল রাজপথে;—অথবা তারা সেইদিন বল্মীক-স্তূপে আরোহণের আস্বাদন দিয়ে আমাকে ভাবীকালে দুরূহ পর্বতাভিযানে রত ক'রে দিয়ে—নিজেরা নেমে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারে কোন মনোরমের হাতছানি তাদের মুগ্ধ করেছিল, সেই কথাই আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবি।

স্পষ্ট মনে রয়েছে সেদিনের কথা।

বড় পাঁচু, দ্বিজপদ আমার সঙ্গে খেলা করছিল আমাদের বাড়ীতে। কয়েকদিন আগে নারাণের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বড় পাঁচু এবং দ্বিজপদকে নিয়ে রামায়ণ-খেলা খেলছি। পাঁচু হি-হি ক'রে হাসছে; ওটা ছিল পাঁচুর স্বভাব। কথার একটু জড়তা ছিল। অল্প বয়সেই

—বোধ হয় এগারো-বারো বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল পাঁচু, তবু যতটুকু মনে পড়ে, তার স্বভাবের মধ্যে একটি ভীরু চতুরপ্রকৃতির জীব উঁকি মারত। ঠাকুরবাড়ীতে পূজক ছিলেন বুড়ো ভট্টাচার্য, আগুনের মত কোপন-স্বভাব, কণ্ঠস্বর একটু খনা ছিল ব'লে ছেলে-বয়সে নাম হয়েছিল—খনা, ক্রমে সেই নাম কোপন-স্বভাব হেতু—'খুনে'তে পরিণত হয়েছিল। চতুর ভীরু পাঁচু তার কাছেও হি হি ক'রে হাসত। ভটচাজ পূজা করতেন, পাঁচু দোরের পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারত আর হাসত—হি-হি! হি-হি! হি-হি! আশ্চর্য চতুর পাঁচু অনুভবে বুঝত যে, খুনে এতেই খুশী হবে।

সত্যই ভটচাজ রাগ করতেও পারতেন না। তিনিও হেসে ফেলতেন এবং পূজার মধ্যে অবকাশ হ'লেই প্রশ্ন করতেন—কি?

—পেছাদ।

প্রসাদ দিতেন ভটচাজ। একটু চিনি, একখানা বাতাসা। এর বেশী শিবঠাকুর আর কি পান?

পাশাপাশি পাঁচটি শিবমন্দির। ভটচাজ এক মন্দিরে পূজা সেরে দ্বিতীয় মন্দিরে ঢুকতেন। পাঁচু আবার এসে দাঁড়াত।

—হি-হি! হি-হি! হি-হি!

—আরে আবার কি?

—ভশচাজ!

—কি? আবার কি?

—পেছাদ।

—আরে! আবার প্রসাদ? এই যে দিলাম!

—তু আমাকে বায়ে বায়ে দে—আমি বায়ে বায়ে খাই ভশচাজ

এবার ভটচাজই হেসে ফেলতেন হা-হা-ক'রে।

সেদিন খেলতে এসেও অকারণে হাসছিল পাঁচু।

হঠাৎ নারাণ এসে নিমন্ত্রণ জানালে। ভাগবত খেলছে তারা।

ভাগবত! অবাক হয়ে গেলাম।

ভাগবতের কথকতা তো তখন শুনেছি। সংস্কৃত শ্লোক—তার

ব্যাখ্যাগান, বিচিত্র রসরসিকতা—সেই সব ওরা করবে ? কে করবে ? তুই ? নারাণ ?

—না, আমি না। নিশাপতি করবে। মঙ্গলডিহি থেকে নিশাপতি এসেছে।

নিশাপতি মঙ্গলডিহির ছেলে হ'লেও লাভপুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বেশী। নারাণের জীবনে সে-ই হয়েছে—নব নায়ক। সে-ই করবে ভাগবতের কথকতা।

গেলাম। সঙ্গে দ্বিজপদ, পাঁচু এরাও গেল। সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। নিখুঁত পরিপাটি আয়োজন। একখানি আসন, সামনে একটি ছোট জলচৌকি, তার উপর একখানি কার্পেটের ঢাকনি, তার উপরে ফুল ও একখানি বই। পুষ্পমাল্যশোভিত কণ্ঠে তিলকশোভিত নিশাপতি বসেছে আসনের উপর। সে বললে, অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন। নমস্কার - নমস্কার।—বললাম আমরা।

নিশাপতি গম্ভীরভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে রাজা বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন—আসুন, দেবর্ষি, নমস্কার।

নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এ স্টার্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সে-কালে ভাগবতের আসরে এইভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ ক'রে অপ্রস্তুত হতেন। আমি অপ্রস্তুতই হলাম। কিন্তু পাঁচু বা দ্বিজপদ হ'ল না। তারা এমন হি হি ক'রে হাসতে শুরু ক'রে দিলে যে, নিশাপতিই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এর পর সে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে গেল।

মুখস্থ চাণক্য শ্লোক আউড়ে তার ব্যাখ্যা ক'রে নিশাপতি ভাগবত পাঠের খেলা খেলছিল। চাণক্য শ্লোক তখন বাল্য বয়সেই শেখানো হ'ত। আমি চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করি নাই; তবে কেউ বললে চাণক্য শ্লোক ব'লে চিনতে পারতাম। আমার মুখস্থ ছিল রঘুবংশের প্রথম শ্লোক—বাবা শিখিয়েছিলেন,

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দেঃ পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥"

আমার সে শ্লোক আওড়াবার অবকাশ ছিল না। আমি চুপ ক'রেই রইলাম। নিশাপতি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুরু করলে। বিষ্ঠার মধ্যেও স্বর্ণখণ্ড থাকলে, তা সযত্নে সংগ্রহ করবে। বাস্, আর যায় কোথায়! হি—হি—হি! হি—হি—হি!—বিষ্ঠা! ভাগবতের মধ্যে বিষ্ঠা!

পাঁচু এবং দ্বিজপদ হেসে আসব পণ্ড ক'রে দিয়ে উঠে পড়ল, এবং হঠাৎ পাঁচু মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ফেললে—

নিশাপতি—খিশাপতি—ছিশাপতি রে—

ভাগবতে থ্যাক-থু—থ্যাক-থু-থু। হি-হি-হি। হি-হি-হি। হি-হি-হি। সে আর থামে না। নিশাপতি প্রায় ক্ষেপে গিয়ে ভ্রষ্টযোগীর মত আসন ত্যাগ ক'রে উঠে মারপিট শুরু ক'রে দিলে। ওরা দলে ছিল ভারী। এলাকাটা ছিল ওদের। তবুও আমরা শুধু মার খেয়েই এলাম না, নাকের বদলে নরুনের মত দু-এক ঘা দিয়েও এলাম। এলাম আমাদের বৈঠকখানায়। এসে শোধ নেওয়ার পরামর্শ চলতে লাগল। হঠাৎ বাগানের একটা গাছ থেকে পড়ল একটি পাখির বাচ্চা। ছোট্ট পাখির বাচ্চা, বাসা থেকে প'ড়ে গেল কি ক'রে? খেলার মোড় গেল ঘুরে। শোধ নেওয়ার পরামর্শ স্থগিত থাকল। পাখিটিকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য পরিচর্যা শুরু ক'রে দিলাম। জল দিলাম, গাড়ুর নলের মুখে জল। খামার থেকে ধান এনে দিলাম তার মুখে—খা খা। পরিচর্যায় হাঁপিয়ে উঠে ছোট পাখির ছোট প্রাণটুকু বেরিয়ে গেল। ঘাড়টি লট্‌কে পড়ল। অত্যন্ত দুঃখ হ'ল। আহা-হা, ছোট পাখিটি! বাঁচলে—কেমন পুষতাম!

অতঃপর পাখিটিকে সমাধি দেবার কল্পনা হ'ল। মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। পাখির ছানাটি প'ড়ে রইল বাগানের বাঁধানো বেদীর উপর।

হঠাৎ পাঁচু ডাকলে—দেখ।

দেখি, পাখির মা ডাল থেকে নেমে এসে ছানাকে ডাকছে। তার চারিপাশে ঘুরছে, সস্নেহে ঠোকরাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

পাঁচু ইতিমধ্যে মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ফেললে—

"তারা দাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি

তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ-কেঁউ করি।"

আমাদের বৈঠকখানার দরজায় লাইন দুটো খড়ি দিয়ে লিখে ফেললে সে। আমি বিস্মিত হয়ে পাঁচুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কবির সম্মান, কবির মূল্য তখন বুঝি নি, কিন্তু পাঁচু যা করেছে সে যে একটা মহাগৌরবের—তার মূল্য যে পরম মূল্য—তা যেন সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধি করলাম নিজের বিস্ময়ের পরিমাণ থেকে, গভীরতা থেকে। মা-পাখিটা ইতিমধ্যে ডালে গিয়ে বসলে, আবার এল, আবার গেল, কয়েকবারের পর ডালেই ব'সে রইল। তখন খড়ি নিয়ে আমি পাঁচুর লাইন দুটির নিচে লিখলাম—

পাখির ছানা—মরে গিয়াছে—

মা ডেকে ফিরে গিয়াছে—

মাটির তলায় দিলাম সমাধি—

আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

লাইন ক'টি অন্তত কুড়ি বৎসরের উপর লাল রঙ করা দরজার খড়খড়ির গায়ে লেখা ছিল। বোধহয় কুড়ি বৎসরেরও বেশী। আমার আমলেই আমি নিজে হাতে সাদা রঙ দিয়েছিলাম দরজায়, তাতেই সে ঢাকা প'ড়ে গেছে। আমার সাহিত্য-সাধনা শুরু হয়ে গেল সেই দিন।

পাঁচু লিখেছিল প্রথম দুটি চরণ। আমি করেছিলাম পাদপূরণ। দিন তারিখ মনে নেই। তবে বয়স মনে আছে। আমার বয়স তখন আট বছরের কম। আট বছরেই আমার বাবা মারা গেলেন। তখন বাবা আমার বেঁচে ছিলেন। সেই বারেই পূজোর সময় কবিতা রচনা করলাম—

শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল

তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।

আর মনে নেই, আরও অন্তত বারো-চৌদ্দ লাইন ছিল। বাবা

সে-কবিতা দেখেছিলেন। কবির সম্মান, কবির মূল্য আমাকে বুঝিয়েছিল পাঁচু। জিহ্বায় জড়তা, সবতাতেই হাসি, বিচিত্র পাঁচু হঠাৎ সেদিন কি ক'রে এবং কেন কবিতা রচনা করেছিল—তা ভাবি আর বিস্মিত হই। কবিতা রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তার আকস্মিক উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাকে দিয়ে গেল জীবনের দীক্ষা।

১৫

"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

কবিতাটি রচনা করেছিলাম যখন, তখন অলক্ষ্যে কাল নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। আজ সেই বহুকালের পুরানো কথা স্মরণ করতে গিয়ে—যখন পুরানো ছবিগুলি ঝাড়ামোছার পর স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তখন মনে হচ্ছে সেদিন ছবিগুলি আঁকা হওয়ার সময় অনেক কিছু চোখে পড়ে নি—পড়লেও সেদিন তার অর্থ উপলব্ধি হয় নি। কাল হেসেছিলেন এবং সে-হাসি ঠিকই চোখে পড়েছিল, কিন্তু তাকে কালের হাসি ব'লে চিনতে পারি নি এতকাল পর্যন্ত, এই মুহূর্তে সেই কাহিনী লিখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও না। আজ মনে পড়ছে সেই কালের হাসির খানিকটা ফুটেছিল বাবার মুখে—খানিকটা ফুটেছিল লোকের মুখে। বাবা হেসেছিলেন. রোগশয্যায় শুয়ে ছোট্ট কাগজে ছাপানো কবিতাটি প'ড়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিল। প্রসন্ন, কিন্তু রোগের ক্লান্তি ও ক্লিষ্টতার জন্য বিষণ্ণ ও ব্যথিত। আমায় ডেকে সমাদর ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন. তুমি কতটা লিখেছো, নারাণই বা কতটা লিখেছে?

কবিতাটির নিচে রচয়িতা হিসাবে আমার এবং নারাণের নাম ছিল। ছাপা হয়েছিল কলকাতার তখনকার দিনের এক বিখ্যাত প্রেসে - ক্যালিডোনিয়ান প্রেসে। নারাণের ঠাকুরদা ছিলেন ক্যালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কুলীন! ষেঠেরা তারাচরণের

বংশধর, আমাদের গ্রামের জামাই। বছরে বার দুয়েক শ্বশুরবাড়ী আসতেন। পূজোর সময় একবার এবং আর-একবার যখন হোক। তিনিই এনেছিলেন ছাপিয়ে। নারাণের সঙ্গে তখন বিরোধ মিটে গেছে; নারাণের পাশ থেকে নিশাপতির দলও অন্তর্হিত হয়েছে, আমার আশপাশ থেকে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও সরেছে। পৃথিবীকে যারা ভাল-মন্দ বোধের বিচার দিয়ে বেছে-বুছে ভোগ করে—তাদের সঙ্গে, যারা দু'হাতে ভোগ ক'রে যায় কোনো বিচার না ক'রেই তাদের সঙ্গে ঠিক বনে না। ওদের সঙ্গে তাই ঠিক বনত না আমার। পাঁচু অল্পবয়সে গেছে, দ্বিজপদ অনেক দিন দুনিয়াকে দুর্দান্তভাবে ভোগ ক'রে—শেষ-জীবনে যেন কার প্রচণ্ড গদাঘাতে ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের মত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সুস্থ জীবনে যার প্রচণ্ড চীৎকার ক'রে পৃথিবীতে কোলাহল সৃষ্টি ক'রে চলা অভ্যাস ছিল, হঠাৎ সে একেবারে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল; কঠিন যৌন-ব্যাধি থেকে বাত। রোগের সামান্য উপশম হ'লেই দ্বিজপদ লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে গ্রাম্য রাস্তা উচ্চ হাস্যে রসিকতায় মুখর ক'রে তুলত। থাক সে-কথা। দ্বিজপদরা বার বার এসেছে আমার কাছে। কিন্তু কিছুতেই বনে নি, কয়েক দিন পরেই আমার সঙ্গ ছেড়ে যেন পালিয়ে গেছে। সে-দিনও নারাণ এলে ওরা চলে গিয়েছিল। বড় পাঁচুর দেওয়া প্রেরণা তখন আমার মনের প্রদীপে আলো জ্বালিয়েছে। একটা ছোট কথা মনে প'ড়ে গেল। এ ঘটনার অনেক পরে—সম্ভবত বছর পঁচিশেক আগে—কালীপূজার রাত্রে আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এক জায়গায় পূজা। দেখতে চলেছিলাম; হঠাৎ পথের ধারে গাছতলায় সিগারেট খেতে ব'সে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় চোখে পড়ল কিছু খড় প'ড়ে আছে, বোধ হয় কোনো রাহী ফেলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হ'ল খড়গুলিতে আগুন ধরিয়ে বহ্ন্যুৎসব করবার। ধরিয়ে দিলাম আগুন, খড় পুড়ে ছাই হতে লাগল। হঠাৎ বেশ একটু দ্রুতগতিতে এল দুটি লোক, বললে—'বাঁচলাম বাবু, দাও তো একটু আগুন, লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিই।

আলো ধরিয়ে নিতে আগুন পাই নাই সারাটা পথ। সাথে দিয়েশলাই নাই।' অলোর শিখা জ্বেলে নিয়ে তারা চলে গেল মাঠের পথে। আমার সামনে খড় জ্ব'লে নিভে গেল ; অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। কেউ খড় পুড়িয়ে হাসে, কেউ পথের আলো জ্বালিয়ে নেয় তা থেকে।

বাল্যকালে একদিন আমার আলোয় নারাণকেও বললাম, তুই ভাই ধরিয়ে নে তোর মনের পিদিম এই শিখাতে। তা হ'লে ভাল হবে— একসঙ্গে চলব দু'জনে।

নারাণ প্রথমটা উৎসাহিত হয়েছিল। এ উৎসাহ তার অনেকদিন ছিল। ওই কবিতা রচনায় সেদিন সেও যোগ দিয়েছিল। কতটা সে, কতটা আমি রচনা করেছিলাম—সে হিসাব আজ মনে নেই, করবও না।

বাবার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, আমি অর্ধেক, নারাণ অর্ধেক।

—তুমি সবটা লিখলে না কেন ?

আমি চুপ ক'রে ছিলাম। তারপর বলেছিলাম, ওর ঠাকুরদাদাই যে ছাপিয়ে দিলেন।

এবার বাবা চুপ করেছিলেন।

সেদিন ষষ্ঠী। সপ্তমীর দিন সকালে ছাপা কবিতার তাড়া নিয়ে ঢাক ঢোল শানাই কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা মুখর শোভাযাত্রার মধ্যে—দুটি শিশু কবি—সর্বসমক্ষে সলজ্জ বিনয়ের অন্তরালে সগৌরবে আত্মঘোষণা করলে -'আমাদের পদ্য, পড়ে দেখুন।' আমার এই আত্মঘোষণার সময় কাল হেসেছিলেন বিচিত্র হাসি।

ক্ষুদ্র একটি বাংলার পল্লীতে সে-কালের গ্রাম্য বাঙালীর সমাজে এ আত্মঘোষণা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু আমাদের গ্রাম ক্ষুদ্র ছিল না —আকারেও না, প্রকৃতিতেও না, প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে অহরহ উত্তপ্ত গ্রামখানিতে দ্বন্দ্বী রথীর সংখ্যা ছিল অনেক। আভিজাত্য কৌলিন্য-গৌরব, বংশগৌরবের এবং সম্পদগৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজক্ষেত্রটি প্রায় কুরুক্ষেত্র তখন। অল্পস্বল্প ভূসম্পত্তি, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ —এমন ধরনের ব্যক্তিরা সে কুরুক্ষেত্রে অর্ধরথীর সামিল। কিন্তু

তা হ'লেও অস্ত্রে ধার তাঁদের কম ছিল না। কুরুক্ষেত্রের সমরে সেনাপতি শল্যের মত বিক্রমে, তাঁরা ভীষ্ম দ্রোণের অভাবে সৈনাপত্য গ্রহণের শক্তি ধরতেন। বড় রথী ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা শুধু গ্রামেই প্রতিষ্ঠাবান নন—গ্রামের বাইরেও যাঁরা গণ্যমান্য। এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবার আমাদের গ্রামে এমন সব মানুষ ছিলেন, যাঁরা সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় থাকতেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। রূপে, সজ্জায়, অস্ত্রে, ধ্বজায়, শঙ্খনাদে তাঁরা এমনই দীপ্যমান ছিলেন যে তাদের চিনিয়ে দিতে হ'ত না—দেখবামাত্র চেনা যেত। এই রথীদের সামনে প্রতিষ্ঠাকামী বালকের আত্মঘোষণা সহজ ছিল না। সেদিন রথীরা সবাই সমবেত। সমস্ত বৎসরের মধ্যে দুটি দিন তাঁরা সকলে একত্রিত হতেন, মহাসপ্তমীর প্রভাতে ঘট পূর্ণ করবার ঘাটে এবং বিজয়া-দশমীর দিন ওই ঘাটেই—ঘট বিসর্জনের অপরাহ্নে। আজ স্মৃতি স্মরণ করতে ব'সে সেদিনের আমার গ্রামের সেই দীপ্তমুখ প্রসন্নস্বাস্থ্য উজ্জ্বলশ্রী প্রাণবন্ত মানুষের সমারোহ মনে ক'রে চোখে জল আসছে। চারিদিকে দীপ্তি—চারিদিকে সবল দ্বন্দ্বে যুধ্যমান মানুষ, সে কত কোলাহল—কত বাজনা—কত উল্লাস—সে কী উচ্চ হাসি, সে কী প্রাণখোলা আলাপ! আবার তেমনি কঠিন উচ্চ ছিল বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে দৈহিক আক্রমণও হয়ে যেত। আর বক্র তীক্ষ্ণ হাস্যের গুণ আরোপ ক'রে মর্মান্তিক শরক্ষেপ—সে যেন অগ্নিবাণ ব্যর্থ হচ্ছে বরুণাস্ত্রে, বরুণাস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে বায়বাস্ত্রে, বায়ুবাণ স্তিমিত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে শৈবাস্ত্রে; সে যুদ্ধ বিচিত্র! তার মধ্যে ছাপা পদ্য হাতে নিয়ে যখন প্রবেশ করলাম, তখনকার অবস্থা আজ কল্পনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে—অভিমন্যুর মতই দুঃসাহস হয়েছিল আমার সেদিন। কাগজ বিলি করতেই এই রথীদের অধর-ধনুতে বক্র হাস্যের জ্যা যোজিত হয়েছিল—পদ্য! কবিতা! কে লিখে দিলে? কি থেকে টুকলে? এরই মধ্যে ডিম ফুটে কালিদাস-হংস বেরুল নাকি? কেউ কেউ হয়তো মহাকবির "মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী" শ্লোকটির প্রথম চরণও আউড়েছিলেন। সংস্কৃত-জানা কালিদাস-পড়া

লোকও না-থাকা ছিল না আমাদের গ্রামে আমার কালে। আমার বাবার কালিদাস গ্রন্থাবলী আজিও রয়েছে। অর্ধপ্রসন্ন অর্ধবক্র কালের হাসির প্রসন্ন ভাগটা ফুটেছিল শয্যাশায়ী আমার বাবার মুখে —বক্রকুটিল দিকটা ফুটল সেদিনের সমবেত জনতার মুখে। কয়েকজনের মুখে প্রসন্ন প্রশংসার হাসিও ফুটেছিল। তাঁদের আজও ভুলি নি। এ'দের ভোলা যায় না।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, এঁদের সেদিনের প্রশংসা-প্রসন্ন হাসি আমার চোখের উপর ভাসছে।

দ্বিজপদ সেদিন হঠাৎ আমায় সম্বোধন করলে 'কপিবর' ব'লে। সঙ্গে সঙ্গে কোন পূজাবাড়ী থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা একটা কপিপাতা নিজে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে বললে, কপি খেয়ে ফেললাম। ওর আচরণটুকু আমাকে ওর বাক্যের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে বুঝলাম, কেউ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কপিবর কথাটা। কিন্তু কপির অর্থ বেচারা জানে না। আমি কপিপাতা চিবিয়ে খাওয়া দেখে হেসে উঠেছিলাম। পরবর্তীকালে দ্বিজপদকে আমিই ডাকতাম 'কপিবর' বলে। সে প্রাণ খুলে হাসত। মধ্যে মধ্যে বলত, একদিন কিন্তু 'উঁ-প' শব্দ ক'রে ঘাড়ে চড়ে বসব।

আমি হাসতাম, বলতাম, ঘাড়ে না, তুই নাতি, তুই বন্ধু—পড়িস তো বুকে লাফিয়ে পড়িস।

কখনও কখনও বলতাম, দোহাই, যেন ঘাড়ে ব'সে কান ধ'রে টেনে ছিঁড়িস না।

সে জিভ কেটে পায়ের ধুলো নিয়ে বলত, দাদু, ছি-ছি দাদু! ছি-ছি! গাল পেতে বলত, মার মার, তিন চপেটাঘাত—থ্রি শ্ল্যাপস। সটাসট —সটাসট!

সেদিনের কথাই বলি। কপিবর ব'লে কপির পাতা চিবিয়েই দ্বিজপদ ক্ষান্ত হ'ল না, সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় দ্বিজপদ ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এল—ওই ছাপানো 'পদ্য' নিয়ে।

—কে লিখতে পারে ? কার ক্ষমতা আছে বল না শুনি ? আমাদের পাড়ায় চারজনা পদ্য লিখেছে। গোপালবাবু লিখেছে, নির্মলবাবু লিখেছে, তারাশঙ্কর লিখেছে নারাণ লিখেছে। কে লিখেছে তোদের পাড়ায় ?

—লেখে নাই, লিখতে পারে আমাদের কালীকিঙ্করবাবু।

—কালীকিঙ্করবাবু! কালীকিঙ্করবাবু তোদের পাড়ার ? একা তোদের পাড়ার ? কালীকিঙ্করবাবু দু' পাড়ার।

শেষ পর্যন্ত মারপিট ক'রে ফিরল দ্বিজপদ।

আমাকে এসেই ডাকলে।—লাগাও যুদ্ধ ওদের সঙ্গে, ও-পাড়ার সঙ্গে।

আমাদের বাড়ীতে তখন সমস্ত কিছু যেন থমথম করছে। বাবার অসুখ দেখে ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন পিসীমা। বাবা পূজোর বাজার করতে গিয়েছিলেন কলকাতা ; সেখান থেকে এসে জ্বরে পড়েছেন। একজ্বরী জ্বর। প্রথমে ছিল অল্প জ্বর। ধীরে ধীরে জ্বর বেশী হয়ে চলেছে। আজ চারদিন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নি। আমাদের গ্রামের ডাক্তার গিরিশবাবু ভয় পেয়েছেন আজ। আমার আশুদাদাও চিন্তিত হয়েছেন। তখন আমাদের জেলায় সিউড়িতে ছিলেন লালা গোলোক ব'লে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। কিন্তু তাঁর চেয়েও খ্যাতি বেশী ছিল রামপুরহাটের হরিতারণ ডাক্তারের। ডাক্তার আনাবার জন্য লোকও অপরাহ্লে রওনা হয়েছিল, কিন্তু অন্য কয়েকজন প্রবীণে সে-লোককে ফিরিয়ে এনেছেন।

সে-কালে এটি ছিল একটি গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য।

শুধু ক্রিয়াকলাপেই নয়, অসুখে-বিসুখেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এসে একান্ত আপন জনের মত বসতেন। কতটা তার আন্তরিক কতটা তার শুদ্ধ কর্তব্য পালনের তাগিদ—সে-কথা বলতে পারব না, তবে এটা ছিল। সে অসুস্থ ব্যক্তি, যেমন প্রতিষ্ঠার মানুষ হোক না কেন, তার চারিপাশে মানুষের অভাব হ'ত না।

রোগের গুরুত্ব তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরা

প্রত্যেকেই নাড়ী দেখতে জানতেন। ওটা ছিল সে-কালের অপরিহার্য একটা শিক্ষা। অনেকের এই নাড়ীজ্ঞান ছিল যেমন সূক্ষ্ম তেমনি বিচক্ষণ।

ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে নাড়ী চলছে, পায়রার মত থমকে-থমকে চলছে, পিঁপড়ের পায়ের মত চলছে—এ সব কথা এখনও আমার মনে আছে। তাঁরাই নিজেরা নাড়ী বিচার করে লোক ফিরিয়ে আনলেন।

বাবার হয়েছিল টাইফয়েড। কলকাতা থেকে বীজাণু সংক্রামিত হয়েছিল। নাড়ী দেখে তাঁরা সে আভাস সকলেই পেয়েছিলেন, কিন্তু রোগ কতটা কঠিন হয়েছে বা হতে পারে তাই নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল অপরূপ। এই রোগে—শেষ তিন-চারদিন বিছানায় থাকলেও—বসেই আছেন; সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছেন। তিনি নিজেও বললেন, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ শৈলজা? তুমি ব্যস্ত হলেও তো রোগ ব্যস্ত হয়ে চলে যাবে না। ওর ভোগ ও পূর্ণ ভোগ করে তবে যাবে।

সপ্তমীর দিনই সকালবেলা আমায় পূজোর পোশাক বের করে দিয়েছেন। আমরা তখন ভাই বোন তিনজন—আমি বড়, আমার ছোট বোন, তারপর আমার মেজ ভাই; আমার কনিষ্ঠ সহোদর পাঁচ মাস মাতৃগর্ভে। আমাদের সকলকে পোশাক পরিয়ে ভাল করে দেখেছেন কাকে কেমন মানিয়েছে। রসিকতা করেছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাম চাকরের কোলে আমার ছোট ভাইকে দেখে। মাকে আদেশ করেছেন পোশাকী কাপড় পরতে। পরদিন মহাষ্টমীতে আমাদের বাড়ীতে গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ, তার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই চণ্ডীমণ্ডপ—জানালা খুললে খাটে বসেই সব দেখা যায়। তিনি খাট থেকে নেমে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পূর্ণঘট চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশমাত্র প্রণাম করেছেন;—নবপল্লবকে মণ্ডপে স্থাপন করে সপ্ত তীর্থের জলে স্নান করানো দেখেছেন—হুলুধ্বনি দিয়ে পান সুপারি ছিটিয়ে বরণ করে নবপল্লব পূজাবেদীতে স্থাপনার

পর তবে আবার বিছানায় শুয়েছেন। সুতরাং তাকে খুব বেশী অসুস্থ না ভাববার মত কারণ অনেক ছিল। বুঝতে কয়েকজন পেরেছিলেন মা-পিসীমা মনের একটা আকুলতা থেকে বুঝেছিলেন। রাম চাকরও যেন বুঝেছিল। আর বুঝেছিলেন যোগেশদাদা। যোগেশ মজুমদার ছিলেন আমার জ্যাঠা মশায়ের নায়েব। তার কথা আগে বলেছি। তাঁর মত নাড়ীজ্ঞান কচিৎ দেখা যায়। নাড়ী দেখে তিনি বলে দিতেন —এ জ্বরের ভোগ হবে কত দিন। বলতে পারতেন—জ্বরের পরিণতি কি হবে। খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয় বৎসর পঁচিশেক আগে, আমাদের ওখানে স্বনামধন্য কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মুর্নীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছেলের টাইফয়েড হ'ল। বারো দিনের দিন যোগেশদাদা নাড়ী দেখে এসে বললেন, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্য লোক গেল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কেমন দেখলে যোগেশদা?

—আমি? দাড়িতে হাত বুলিয়ে যোগেশদা ম্লান হাসি হাসলেন।

- কঠিন কিছু?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভাই, নাড়ার গতি আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমার মনে হ'ল, রোগটি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর আয়ত্তের বাইরে তবে শিব সব পারেন। মৃত্যু একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন।

তারপর বলে দিলেন—আঠারো দিন কি বাইশ দিন। তার পরে বোধ হয় একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে।

সে অসুখে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কলকাতার বর্তমান চিকিৎসা-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। পাচ-ছ দিন তিনি ছিলেন, প্রাণপণে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে যা করবার করেছিলেন। অবশ্য তিনিও আশা প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁর কর্তব্য তিনি করেছিলেন। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে যোগেশদাদার নাড়ী-পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। চিকিৎসা তিনি করতেন না, শুধু ওই নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্য সাধনায়। আজ

পেনসিলিন-স্টেপটোমাইসিনের যুগে যোগেশদাদার নাড়ীজ্ঞান অনেকটা বিভ্রান্ত হ'ত এ-কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর একটা কথা লিখবার সময়েও আমার কানের কাছে যেন বাজছে। ঐ সময়েই তিনি বলেছিলেন, ভাই, সাধারণ-রোগের নাড়ী আর মৃত্যু-রোগের নাড়ীতে পার্থক্য আছে। বুঝা কঠিন, সব সময়ে বুঝতে পারাও যায় না। তবে গভীর মন দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে আভাস পাওয়া যায়, বুঝা যায়। সাধারণ-রোগে নাড়ী দেখে এও বলা যায়—ঠিক ঠিক ঔষধ পড়লে এই এই দিনে এই এই উপসর্গের হ্রাস হবে, এইভাবে জ্বরত্যাগ হবে। সে বলা কঠিন নয়। রোগের প্রকোপের মাত্রা, ঔষধের শক্তির মাপ, ঐ দুইয়ে যোগ-বিয়োগ ক'রে বেশ বলা যায় কিন্তু মৃত্যু-ব্যাধিতে ঔষধ কার্যকরী হয় না।

এই যে যোগেশদাদা বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু তিনিও এ কথা বলতে পারেননি কি করে হবে—এই ভেবে তিনি কূলকিনারা পাননি রাম চাকর সকলকে বলেছিল—আমার কি রকম লাগছে গো। উঁহু, ই ভাল নয় উঁহু! উঁহু!

সে এক বিচিত্র পরিবেশ। তাজও মনে পড়ছে আমার শিশুচিত্তের সে কী দ্বন্দ্ব! বাইরে দুয়ারের ওপারে আনন্দ কলরোলের প্রবাহ বয়ে চলেছে, শঙ্খে-ঘণ্টায়-হুলুধ্বনিতে-ঢাকে ঢোলে-কাঁসিতে-সানাইয়ের সুরে ঘোষণা করে আনন্দ-কলরোল প্রহরে প্রহরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটায়, শরৎ-রোদ্রের ঝলমলানিতে, দেবীমূর্তির সৌন্দর্যে-গাম্ভীর্যে রূপের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। রূপের সঙ্গে গন্ধ মিশেছে গঙ্গা-যমুনার ধারার মত দেবমন্দিরে উঠছে ধূপগন্ধ, ঘৃতদীপের গন্ধ, পরাতের উপরে রাশীকৃত গন্ধপুষ্প—পদ্মফুল এসেছে ডালা ডালা, গন্ধরাজ টগর মালতীর রাশি সাজানো রয়েছে, ওদিকে ঘষা হচ্ছে অগুরু চন্দন। বধূ-কন্যাদের পরিচ্ছদে উঠছে পুষ্পসারের গন্ধ।

সেই চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই আমাদের বাড়ীটা সেদিন যেন ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর ভিতরে পূজার

আয়োজন চলছে, তবু যেন সেখানকার আকাশ মেঘমলিন, সব যেন স্তব্ধ হতশ্রী, বায়ুরও যেন অভাব ঘটেছিল। বাড়ীতে থাকতে আমার শিশুচিত্তের যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তবু সেখান থেকে বেরুতে পারছিলাম না। কেউ জোর করে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠিয়ে দিলে—সেখানেও থাকতে পারছিলাম না, কঠিন আকর্ষণে বাড়ীতে এসে ঢুকছিলাম।

আমাদের সে কালের লাভপুর ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যে এবং যোগ্যতায় রুচিতে এবং মহার্ঘ্যতায় বাংলাদেশের মহানগরীর রুচিসমৃদ্ধ পল্লীর সঙ্গে তুলনীয় ছিল; পূজার সময় সেই শোভা ষোলো-কলায় পরিপূর্ণ হ'ত। বিদেশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রতিটি জন ফিরতেন গ্রামে। ষষ্ঠির দিন রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেকে যেন ফিরতে বাধ্য ছিলেন। না-আসাটা মহা-অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। সমাজের কাছে, গ্রামের কাছে এই শর্তে যেন দলিল লেখা ছিল। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ যাদের বলি, সেদিনের লাভপুরের জীবন-দ্বন্দ্বের মহারথী ও রথী—তেমন মানুষের সংখ্যাই ছিল ষাট-সত্তর জন, এদের সঙ্গে আসত পরিজনেরা। একটি পল্লীগ্রামে এমন দেড়শত মানুষের আগমন কম কথা নয়। তাঁরা এসে পূজা-সমারোহের মধ্যে যে উল্লাসের সৃষ্টি করতেন তাতে গ্রামের সকল বিষণ্ণতা সকল মলিনতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাঁরাও যেন দমিত-উল্লাস হয়ে গেলেন। আমার বাবার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বের কথা আগেই বলছি। এই পূজা-সমারোহের মধ্যে তিনি থাকতেন পুরোভাগে। তাঁর কণ্ঠস্বরের উল্লাসকে যেন একটি মহিমা দিত। এবং তাঁর অসুস্থতা ছিল যেন কল্পনার বাইরের ব্যাপার। তিনি যে-অসুখে উঠতে পারেননি সে-অসুখ তো কম নয়—এই কথাটাই সকলকে উল্লাসের মধ্যেও সচকিত ক'রে দিয়েছিল। একে একে দল বেঁধে তাঁরা আসতে শুরু করলেন দেখতে।

এর মধ্যে বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে কয়েক জনকে। ইন্দ্রবাবু উকিল, যোগীবাবু উকিল আর ব্রজ জ্যেঠা-মহাশয়কে। বাবার সমবয়সী—

অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনজনেই। ইন্দ্রবাবু শুধ লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলই ছিলেন না—তিনি সে-আমলের সত্যকারের সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন, পাণ্ডিত্যে-ব্যক্তিত্বে আচারে-ব্যবহারে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর-ভূদেব-বঙ্কিম-ইন্দ্রনাথের (পঞ্চানন্দ) অনুগামী। সম্ভবত সে-কালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় বাবার রোগশয্যার চারিপাশে মজলিস ব'সে গেল। আমি উকি মারছিলাম। যেতে পারছিলাম না। মনে আছে—ইন্দ্রবাবু আমার গায়ে বীরভূমের বসোয়া বিষ্ণুপুরের সিল্কের পাঞ্জাবি দেখে বলেছিলেন, হরিবাবু, এই জন্যই আপনাকে এত ভালবাসি। এখানে এসে দেখলাম ছোট ছেলেদের গায়ে আগাগোড়াই বিলিতী জামা পোশাক। আপনার ছেলের পরনে দেখছি ফরাসডাঙ্গা ধুতি—দেশী সিল্কের পাঞ্জাবি। ছেলে কাঁদেনি—জরিদার ভেলভেটের পোশাকের জন্যে ?

বাবা মৃদু হেসেছিলেন।

এইটুকুই মনে আছে। তারপর আলোচনা চলেছিল অনেকক্ষণ। যোগীবাবু ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। সৎ মানুষ, খাঁটি উকিল। বাবার সুখ-দুঃখের বন্ধু ছিলেন—আমাদের উকিলও ছিলেন। তিনি বসেই ছিলেন চুপ ক'রে।

ব্রজ জ্যেঠার আসার কথা মনে আছে। আত্মভোলা সরল রসিক মানুষ। গান গাইতে পারতেন। তিনি গান গেয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। শুনেছি, তিনি সিঁড়ি থেকেই গান ধরেছিলেন—

"ও ভাই কানাই, তু ভাই বিনে রাখাল-খেলা হয় না খেলা—
তু ভাই শুয়ে থাকলি ঘরে, চ'লে যে যায় গোঠের বেলা।"

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, এ কি কাণ্ড ভাই হরাই! মনে মনে কত আচ ক'রে গায়ে এলাম—মহামায়ার পূজা, তুমি ভাই অসুখ ক'রে ঘরে প'ড়ে। শিবরাম! শিবরাম! তারা কালী—কালী তারা! কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠে বলেছিলেন, হরি—হরি—হরি! এ যে অনেকটা জ্বর ভাই হারাই!

ব্রজ-জ্যেঠা আমার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, জ্যেঠা, তুমি নাকি

পত্ত লিখেছ ? আমাদের পাড়ার সদরে দেখি—ছেলের দল দেওয়াল থেকে কাগজ ছিঁড়ছে। আর ঐ পাড়ার শশনের ব্যাটা—কি নাম—আচ্ছা বাহাত্বর লেড়কা—এই যে কি-পদ—তার কান ছিঁড়ছে। আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কান ছিঁড়িস না বাবা, তার আগে বল হ'ল কি ? বলে—হরিবাবুর ছেলে তারাশঙ্কর আর চারুবাবুর ছেলে নারাণ পত্ত লিখেছে—তাই ওই কি-পদ—ও এসে টিটকিরি দিয়েছে আমাদের পাড়ার ছেলেদের। তাই ছেলেরা—পত্ত ছিঁড়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি, ছোকরার কানও ছিঁড়ে দেবে। আমি বলি—বাবারা, তাতে রাগ কেন ? সরকার পাড়ার আমরা সাতপুরুষ জমিদার— কাগজং-কলমং-লিখনং-পঠনং—ও আমাদের বারণং: হায় -হায়—হায়, নইলে পোস্টাপিসে চাকরি পেয়েছি সেই কবে, আজও প্রমোশন হ'ল না রে বাবা ! যতবার দরখাস্ত করি, ততবার ওপর থেকে লেখে—'না'। কেন 'নো' ? না—দরখাস্তেই এত ভুল যে ওতে প্রমোশন হয় না। আমি বলি, দিস না ব্যাটারা। জমিদারকে প্রমোশন দিতে হলে রাজা করতে হয়, সে তোমাদের হাতে নেই কই জ্যাঠা তোমার পত্ত দেখি। ছেঁড়া কাগজটা তো পড়া হয়নি।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার এবং আশুদাদা। তাদের পিছনে পিসীমা।

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। ডাক্তার দেখবেন। পিসীমা বললেন, সকলেই বললেন ভাল আছেন দাদা। কিন্তু আমার যে ভাল ঠেকছে না ডাক্তার। তুমি দেখ। ভাল ক'রে দেখ মুহূর্তে অন্ধকার এল ঘনিয়ে। ইন্দ্রবাবু আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ক্ষিদে পায়নি ? যাও, মায়ের কাছে যাও।

অকস্মাৎ কাল এসে দাঁড়াল।

তাকে যেন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। অষ্টমীর দিনও কেটে গিয়েছিল এমনিভাবেই। মহানবমীর দিন অকস্মাৎ অতর্কিতে সে এসে

দাঁড়াল। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটের এক কোণে বাবার ঠোঁটের ম্লান হাসি, অন্য কোণে ফুটেছিল বক্র তীক্ষ্ণ হাসি।

মহানবমীর দিন বেলা একটার সময় বাবা মারা গেলেন।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাবা দশটার সময়ে বললেন—এ ঘর তিনি বদল করবেন। মহানবমীর দিন আমাদের ও-অঞ্চলে পূজা-সমারোহের সর্বোচ্চ লগ্ন। বলি হয় অনেক—ছাগ-মেষ-মহিষ, এবং বলির নিয়ম এক স্থানের পর অন্য স্থানে পর্যায়ক্রমে। গ্রামে সকল পূজাবাড়ীর ঢাক-ঢোল একত্রিত হয়ে বাজতে থাকে, গোটা গ্রামের লোক এক স্থানের পর অন্য স্থানে চলে শোভযাত্রার মত।

এই কারণেই বাবা বললেন, এ ঘরে বাজনার শব্দ হবে প্রচণ্ড একটু দূরের ঘরে যাবেন। ডাক্তার নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হেঁটেই ঘর বদল করলেন।

বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা দিল বিকার। ভুল বকতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সে চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর ভাসছে, রক্তাভ চোখের অস্থির চঞ্চল অর্থহীন দৃষ্টি; সে দৃষ্টি কি যেন খুঁজছিল মনে আছে, ইন্দ্রবাবু উকিল মুখের কাছে ব'সে প্রশ্ন করলেন, হরিবাবু!

—আঃ! কি?

—কে আমি বল তো? চিনতে পারছ আমাকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি ইন্দ্র।

- কিন্তু এমন কেন করছ?

—সর ইন্দ্র, সর। স'রে ব'স। দেখছ না, বসতে পাচ্ছেন না দাঁড়িয়ে আছেন।

—কে? কি বলছ?

—ঠিক বলছি। বাবা। আমার বাবা এসেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন আঃ, ইন্দ্র, গুরুজনের সম্মান রাখ। স'রে ব'স, জায়গা দাও বাবা—আমার বাবা। স'রে যাও, সব স'রে যাও। শৈল, আসন দে।* আসন দে।

কপালের উপর জলপটি, লাল চোখ, অস্থির দৃষ্টি—বাবার চোখ আমার দিকে পড়ল, কিন্তু আমি তাঁর চোখে পড়লাম না।

কে যেন আমায় কোলে তুলে নিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়ছে, বাবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের ছবি। সেই সময় ছুটে এসে পড়েছিলাম।

বিহ্বল হয়ে দেখলাম।

চারদিকেব কলরব কান্না—কিছুই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেনি। আমি দেখলাম, সে বিকারের প্রচণ্ডতা—সে অস্থিরতা।

আবার আমাকে কে নিয়ে গেল।

বাবার দৃষ্টি তখন স্থির হয়ে গেছে।

আবার ফিরে এলাম।

জনতা তখন স্তব্ধ। মৌন মূক সব। মা উপুড় হয়ে প'ড়ে আছেন আপাদমস্তক আবৃত ক'রে ঘরের এক পাশে। বোধ হয় চেতনা ছিল না তখন। পিসীমা প'ড়ে আছেন। একে একে লোক আসছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। শুধু উঠছে পদধ্বনি।

বাবা শুয়ে আছেন। চোখ দুটির পাতা তখন নামিয়ে দিয়েছে কেউ। আমি নেড়েছিলাম বাবার দেহ। ঠাণ্ডা হিম—কঠিন। মুহূর্তে মনে হ'ল, আর ডাকলে সাড়া দেবেন না। ঠাণ্ডা হিম কঠিন হয়ে গেছেন বাবা। স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলাম প্রথম। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। আতঙ্কিত অভিভূত আমি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলাম।

১৬

আমার কাল সে-কাল আর এ-কালের সন্ধিক্ষণের কাল।

আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। শালপ্রাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল

বলীরেখা। গভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অনন্তের ধ্যানে। এই আমার সে-কালের ছবি। তাই সে-কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত। আমার বাবা তাঁর দিনপঞ্জীতে তাঁর চরিত্রের কোনো দিক অনুদ্ঘাটিত রাখেননি, এবং সে-দিনলিপি আমাকেই উদ্দেশ ক'রে লিখে গেছেন, সব জানিয়ে গেছেন; বার বার ব'লে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য-মহিমাকে অক্ষুন্ন অটুট রাখতে, অপূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য, সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের। যে ত্রুটি জীবনে ছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ দিয়ে গেছেন। তাই তো শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারি না সে-কালকে। তাই তো বলতে পারি না, সে-কাল ছিল ভ্রান্ত। কোন ভ্রান্ত জন কি বলে?—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রো। আমি পারিনি: হে আমার উত্তরপুরুষ, তুমি ক'রো।

কোন ঘৃণ্য জন কি বলে?—জীবনে যেটুকু সত্য তাকে জীবন বিনিময়ে রক্ষা ক'রো। হে আমার উত্তরপুরুষ, তোমার উত্তরপুরুষের জন্য এটুকু গচ্ছিত দিতে গেলাম তোমার কাছে।

কোন অতৃপ্ত আত্মকেন্দ্রিক অসুস্থ মানুষ কি বলে? আমার জীবনে যা পরিপূর্ণ হ'ল না, হে আমার উত্তরপুরুষ, তা যেন তোমার জীবনে পূর্ণ হয়।

আমার কালের অপরার্ধ নূতন-কাল যেন আমার মা।

জ্যোতির্ময়ী—প্রসন্ন।

তিনি বলেন, আঘাতে বিচলিত হ'য়ো না, ক্লান্ত হ'য়ো না, পথ চল। শুচিশুভ্রবস্ত্রাবৃতা মায়ের একটি কথা ব'লেই শেষ করব।

বাবার মৃত্যুর পরই অকস্মাৎ একদিন অনুভব করলাম—আমি নিঃসহায়, আমি সমগ্র গ্রামে উপেক্ষার পাত্র, করুণার পাত্র আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শারদীয়া নবমীর দিন আমার বাবা মারা গেলেন। পরদিন বিজয়া-দশমী। তার পরদিন একাদশী। একাদশীর দিন সকালে আমাদের হিন্দুসংসারে একটি অনুষ্ঠান আছে। আজও আছে। বলে 'যাত্রার সাইত'।

সম্ভবত, রামচন্দ্র বিজয়া-দশমীর দিন রাবণ বধ ক'রে বিজয়যাত্রা শেষ ক'রে পরদিন প্রাতে সভানুষ্ঠান করেছিলেন। পুরস্কৃত করেছিলেন বানর-সৈন্যদের, রাক্ষসদের মার্জনা করেছিলেন, প্রসাদ বিতরণ করেছিলেন। মহাযজ্ঞ শেষে আরম্ভ হয়েছিল নবজীবন। সেই অনুকরণেই বোধ হয় এই প্রথার সৃষ্টি।

সেদিন সকালে শুভসময়ে চণ্ডীমণ্ডপে গৃহস্থকর্তা তাঁর সম্পদ নিয়ে বসতেন, আজও নামমাত্র বসেন। সামনে থাকত বাক্স। বাক্সের মধ্যে আধুলি সিকি দুয়ানি ডবলপয়সা। তখন আনি মুদ্রার সৃষ্টি হয়নি। ডবলপয়সা ছিল তামার এবং আকারে ছিল টাকার মত বড়। প্রথমেই আমাদের গ্রাম-দেবতা ফুল্লরা দেবীর পূজক পুরোহিত ও গদিয়ান এসে প্রসাদী বিল্বপত্রের মালা গলায় দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে দাঁড়াতেন। কর্তা টাকা বা আধুলি বা সিকি দিয়ে প্রণাম করতেন। তারপর দুর্গাপূজার পূজক, পুরোহিত, পরিচারক, পাচক, ছেত্তাদার, প্রতিমাগঠনের কারিগর, ডাকসাজের মালাকার, নাপিত, বাদ্যকর, প্রতিমাবিসর্জনের বাহকদল প্রতিমার চুল যারা তৈরি করে তারা, প্রতিমার নাকের নথ দেয় যারা তারা, আনন-অঙ্গুরী-সরবরাহকারী, ফুলবিল্বপত্র-সরবরাহকারী—সে অনেক-অনেকজন এসে তাদের প্রাপ্য নিয়ে যায়। গ্রামান্তর থেকে লাঠিয়াল আসত, তারা বিসর্জনের মিছিলে রক্ষক হিসেবে থাকত, তারা নিয়ে যেত প্রাপ্য। এর পর আসতেন চিকিৎসক, বৈদ্য, বিষবৈদ্য—অর্থাৎ সাপুড়ে, গো-বৈদ্য, চৌকিদার, দফাদার, কনস্টেবল, পোস্টাপিসের

পিওন। মোদক আসত মিষ্টান্ন নিয়ে, মুদী আসত মসলা নিয়ে। জেলে আসত মাছ নিয়ে। তারা কাপড় পেত, টাকা—একটা টাকাও নিয়ে যেত, হিসেবে জমা করত। গ্রামের দাই আসত, রজক আসত, কর্মকার আসত। দু' আনা চার আনা বৃত্তি নিয়ে যেত। বাউল আসত, দরবেশ আসত, ভিক্ষুক আসত, সন্ন্যাসী আসত। সাঁওতালেরা আসত দল বেঁধে, তারা নাচত; বাঁশী মাদল বাজাত, দু' পয়সা চার পয়সা বিদায় পেত আর পেত অন্দরের দুয়ারে আঁচল ভ'রে মুড়ি খই মুড়কি। এ-সব এই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পেত। এই আসরে এসে বসত গ্রামের শিশু বালক-বালিকার দল। প্রতি আসরে একটি করে পয়সা পেত। এ হ'ল শিশুদের বৃত্তি, এ আজও আছে। এই দিনটিতে ছেলেদের হাত পাততে কোনো বাধা নাই। লক্ষপতির সন্তানেরও নাই। আমি আমার বাবার কাছে প্রতি বার পেতাম একটি ক'রে টাকা। তা ছাড়া সকল আসর ঘুরে পাঁচ ছ' আনা হ'ত। সে-বার যাত্রার সাইতের আসরে আমাকেই বসিয়ে দিলে আমার বাবার শূন্য আসনে। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ পরেই হ'ল আমার ছুটি। উঠবার সময় কিন্তু আমার বৃত্তি একটি টাকা নিতে ভুললাম না। আমাকে তখন পাশের আসর থেকে ডাকলেন জ্যাঠামশাই। একটি সিকি বা কিছু যেন দিলেন। ও-পাশ থেকে ডাকলেন হিরণ্যভূষণবাবু। তিনি বোধ হয় আধুলি দিলেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। এমন অভাবিত সৌভাগ্যের হেতু একটু উৎসাহিত হয়েই অন্যান্য কর্তাদের আসরে গেলাম স্বাভাবিক-ভাবেই।

এক স্থানে অভাবিতভাবে সমাদৃত হলাম।

আমাকে একটা টাকা দিলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গেই ছিল আমার বন্ধু ওই কর্তার ভাগিনেয়। তার হাতে দিলেন তিনি একটি সিকি। কর্তার ভাগিনেয় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুণ্ণ হ'ল। বললে, ওকে টাকা দিলে, আমি সিকি নেব কেন?

কর্তা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে তাকে বললেন, যাও—যাও, যাও বলছি।

আমি পালিয়ে এলাম। হয়তো ভয়েই এসেছিলাম। মনে হয়তো হয়েছিল যে, আমার টাকাটাও হয়তো ফিরে দিয়ে সিকি নিতে হবে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধুর অপেক্ষায়। সে কি পায় দেখব। যাত্রার সাইতে কে কত পায় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হ'ত আমাদের মধ্যে। যে বেশী পেত, সে-ই আপন সৌভাগ্যে স্ফীত হয়ে উঠত।

হঠাৎ কানে এল ভিতর থেকে বন্ধুর কান্নার শব্দ। বন্ধু কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, কর্তার বাড়ীর কোনো কর্মচারী বন্ধুকে বলছে, ছি, কাঁদতে নাই। ছেলেমানুষ, টাকা নিয়ে কি করবে? ওর বাবা মারছে কিনা—তাই ওকে একটা টাকা দিয়েছেন তোমার মামা। ওর হিংসে করতে নাই, ও নেহাত হতভাগা ছেলে।

সে দিনের সে-মুহূর্তটি আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সে যে কী হয়েছিল—তা বনর্ণা করা আজ সম্ভবপর নয়। শুধু ওই একটা কথা যেন লক্ষ কোটী হয়ে আমার পৃথিবীর আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে বেজে উঠেছিল।

হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে!

ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরে এসেছিলাম।

মা আমার তখনও মাটির প্রতিমার মত আপাদমস্তক থান কাপড়ে আবৃত ক'রে প'ড়ে ছিলেন। এসে মায়ের কাছেই শুয়ে পড়েছিলাম। হাতে আর তখন টাকা-পয়সাগুলি সব ছিল না। প'ড়ে গেছে রাস্তায়।

মা মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি মস্ত লোক হবে। কেন হবে হতভাগা? দুঃখ ক'রো না। ও তোমাকে তাঁরা ভালবেসে বলছেন।

টাকাটি ছিল না, প'ড়েই গিয়েছিল। বাকি সিকি দুয়ানি আধুলিগুলি মা ভিক্ষার্থীদের দিয়ে-দিয়েছিলেন।

এই কারণেই এ-কালে অবজ্ঞা অবহেলা জীবনে বা এসেছে, তাই আমি পথে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলতেই চেষ্টা করেছি আজীবন। আমার

কালের যে অংশ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, পালন করেছে আমাকে মায়ের মত—এ হ'ল তারই শিক্ষা। দীক্ষা আমার কালের সে-কালের কাছে।

অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমিলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত-দৃষ্টি শুভ্রবাসপরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ: আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সে-কাল আর এ কালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চির-কল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোনো কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোনো কালে এ-পারে ফুটছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ ক'রেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সে-দিন আমার মাল্য রচনা সমাপ্ত হবে। বলব, নাও আমার মালা। শেষ ক'রে দিলাম মালা-গাঁথার পালা। আমি হারিয়ে যাই তোমার মধ্যে। তোমার জয় হোক—জয় হোক—জয় হোক!

বিচিত্র

১

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

মানুষের জীবনে এই বিচিত্রের একটি অনুসন্ধান বোধ করি তার জীবনধর্ম। এই বিচিত্ররূপিণী রহস্যময়ীকে সে অনুসন্ধান ক'রে চলে সারা জীবন। কোথাও কখনও চকিতের মত তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, সেই মুহূর্ত জীবনে তার অক্ষয় হয়ে থাকে। এই দুর্লভ চকিত সাক্ষাৎ কদাচিৎ তার ভাগ্যে ঘটে। বৈজ্ঞানিক বলবেন, সব ক্ষেত্রেই মানুষের ইতিহাসে এই সাক্ষাৎ ভ্রান্তি-বিলাসের ইতিহাস। এই থেকেই ভূত-প্রেত বহু রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে মানুষ তাকে যত ভয় করেছে তত ভালবেসেছে। ঠিক এই কারণেই অনুকূল কোনো পটভূমি এবং কাল সম্মুখে পেলেই মানুষের ভয় ও ভালবাসার এই বিশ্বাস এক কল্পনার মূর্তি ধ'রে সামনে দাঁড়ায়; তা হলেও কিন্তু মিথ্যার মধ্য থেকেও একটা সত্যের সাক্ষাৎ মানুষ পায়।

কাল্পনিক বিচিত্ররূপিণীকে মানুষ যখন ভ্রান্তির মধ্যে নিজে গ'ড়ে নিজের সামনে ধ'রে দেখে তখন ওই সাক্ষাৎকারের যে স্বাদ, সে স্বাদের যে গাঢ়তা, যে মাধুর্য সেটা মিথ্যা নয়। কথাটা হ'ল এই—হোক না কেন যা দেখলাম তা আমারই কল্পনায় গড়া অলীক মিথ্যা, কিন্তু তাকে দেখে আমার মন যে রহস্যদর্শনের রসানুভূতিতে অভিভূত হ'ল—তার আস্বাদন-মাধুর্য তো মিথ্যা নয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' তর্ক ক'রে শ্রীকান্ত যখন শ্মশানে গিয়ে একা আসন গ্রহণ করলে, যখন বাতাস উঠল শ্মশানভূমে,

শকুন শিশু কাঁদল গাছের মাথায়, বাতাসের প্রবাহ নরকপালের গহ্বরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনি তুললে, তখন শ্রীকান্ত যে অনুভূতি অনুভব করলে সেই অনুভূতির ফলেই তো খুলে গেল তার তৃতীয় নয়ন, তখনই তো সে দেখতে পেলে কালোর রূপ। বলে উঠল—কে বলে কালোর রূপ নাই! শরৎচন্দ্রই যে এই শ্মশানসাধক শ্রীকান্ত তাতে আর সন্দেহ নেই। 'শ্রীকান্তে'র অন্য ঘটনাগুলির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনে কতখানি মিল আছে সে আলোচনা না ক'রে এ ঘটনাটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবেন বোধ করি সকলেই। সেদিন সে শ্মশানে কালোর এমন একটি স্তবগান তিনি নিশ্চয় করেননি, সেদিন ওই শ্মশানভূমে আকাশ থেকে মাটির বুক-জোড়া নিবিড় নিকষ অন্ধকারের মধ্যে যে শ্বাসরসে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন তাতে ঠিক সেই মুহূর্তে ওই অভিভূত অবস্থায় তখনই বাক্য যোজনা ক'রে স্তবগান রচনার কথা নয়। সেদিন সে-সময় ওই অনুভূতিই বড়। হয়তো সব। এবং এ অনুভূতি তার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল অতীন্দ্রিয় লোকের সঙ্গে সত্য-সাক্ষাতের স্মৃতির মত পরবর্তী কালে সবই মিথ্যা মনে হয়েছে, শ্মশানের বাতাস, শকুনের কান্না সবই ধরা পড়েছে, কিন্তু ওই কালোর রূপ দেখা, সে মিথ্যা হয়নি। মিথ্যা সেদিন আয়োজন ক'রে তাকে ছলনা করতে গিয়ে সত্যের আস্বাদ দিয়েছে। অন্তত সে আকাশ-জোড়া কালো তার চোখের সামনে ভুবনমোহন রূপে দোল খেয়েছে এক বিরাট যবনিকার মত, সেই যবনিকার অন্তরালেই মহাসত্য সে মুহূর্তে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের রহস্যানুসন্ধানী মন সেদিন রহস্যের আভাস পেয়েছিল। বিচিত্রকে আভাসে অনুভব করেছিল।

এই বিচিত্রকে অনুভব বলায় যদি বা কারও আপত্তি থাকে তবে আপনার যে অজানাকে আদিকাল থেকে মানুষের মহাভয় সেই অজানার সঙ্গে কল্পনায় মানুষের মুখোমুখি দাঁড়ানো—একথা বললে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। এই কল্পনা—কল্পনা বা ভ্রান্তি হলেও

এমনই সত্য যে, ওই মহাভয়ের মূলে যে রস সে অমৃত। এই রসই মৌলিক রস, তা আস্বাদনে বাধা হয় না। এ আস্বাদে এবং আত্মবিলুপ্তির আস্বাদে কোনো প্রভেদ নাই। যে বিচিত্র পুষ্পিত অরণ্যভূমে গাঢ় নির্জনতার মধ্যে অকস্মাৎ দেখা দেন, অকস্মাৎ পূর্ণিমা-রাত্রির প্রান্তরের মধ্যে শুভ্রবসনা সুন্দরীর মত আবির্ভূতা হয়ে চকিতের জন্য অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে অন্তর্হিতা হন যে রহস্যময়ী, ইনি তিনিই। ভয়ঙ্করী-রূপা হয়ে তিনি যখন দেখা দেন তিনি তখন অমোঘা, তিনি তখন অতিপ্রত্যক্ষা, অতিস্পষ্টরূপে প্রকটিত। দেখা দেন কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। দেখা দিয়েই তিনি মিলিয়ে যান, মানুষের হৃদ্‌স্পন্দনে বাজিয়ে দিয়ে যান তাঁর নূপুরধ্বনির প্রতিধ্বনি। তখন সেই মহাভয় পরিণত হয় আনন্দে অমৃতে। ভয়ঙ্করী বিচিত্র মনোহারিণী হয়ে ওঠেন স্মৃতির মধ্যে। আবার এমনও হয় যে, মানুষ সেই কল্পনার মোহে হয়ে ওঠে উন্মত্ত, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। দুই হাত বাড়িয়ে সে ছুটতে থাকে। আর সারা সংসার তার পিছনে ছোটে ভয়ে অভিভূত হয়ে। তাই তাকে বলি বিচিত্র।

অমনি একটি ঘটনার কথা দিয়েই শুরু করব বিচিত্র-সন্ধানী মনের কথা। নিজের কথার আগে একজন সামান্য, সাধারণ, অতি সামান্য, অতি সাধারণ মানুষের কথা বলব।

ক

ইংরাজী ১৯২৯ সাল। আমি তখন লাভপুর ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আসলে ভাইস প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমিই প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নিয়ে কাজ

চালাই। বর্ষার শেষ, ভাদ্র মাসের চতুর্থ সপ্তাহ। দীঘি পুকুর ডোবা জলে ভ'রে উঠেছে। সে বৎসর বর্ষা হয়েছিল প্রবল। মাঠ থৈ-থৈ করছে জলে, কাঁদর নালা জলস্রোতের কলধ্বনিতে মুখরিত, গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বক্রেশ্বর এবং কোপাইয়ের মিলিত ধারা কুয়ে নদীতে তুফান চলেছে। এমনটা আমাদের দেশে কদাচিৎ হয়। বিশ ত্রিশ বৎসর অন্তর এমন বর্ষা আসে। মাঠে সে-বার ভাদ্র মাসের শেষেই ধানগাছগুলি প্রায় কোমরের সমান উঁচু হয়ে উঠেছে।

ওদিকে ম্যালেরিয়া এসে হাজির হয়েছে সদর-দরজায়, ঘরে ঢুকে আসন পাতি-পাতি করছে।

ইউনিয়ন-বোর্ডের কর্মভারের মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নয়নও আছে। ম্যালেরিয়া বিতাড়নের যে কয়টা পন্থা তখন প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সহজসাধ্য ছিল টোপা পানা বা ড'কলি তুলে ফেলা। এ পন্থাটি আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা দেশেরই একজন হেল্‌থ অফিসার। এ আবিষ্কারের তত্ত্বটি হ'ল এই যে, অ্যানোফিলিস নামক যে মশক জাতি ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে এবং মানুষের রক্তে সেই বিষ সংক্রামিত করে, সেই অ্যানোফিলিস যতক্ষণ এই বিশেষ জাতীয় টোপা পানার রস পান না-করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার এই বিশেষ ক্ষমতা জন্মায় না। ঠিক মনে নেই, হয় ম্যালেরিয়ার বীজাণু এই রসে পুষ্ট না হ'লে কার্যকরী হয় না, বা ওই মশক ওই রস পান না করলে এই বীজাণু বহনের ক্ষমতা অর্জন করে না—অমনি একটি তত্ত্ব। মোট কথা, ম্যালেরিয়ার বীজাণুও থাকুক, অ্যানোফিলিসও থাকুক, টোপা পানা না থাকলেই ম্যালেরিয়ার প্রসার ও প্রচার বন্ধ। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকেও এই তত্ত্বটি অনুমোদন এবং সমর্থন পেয়েছিল। সেই অনুযায়ী মশা ছেড়ে দিয়ে টোপা পানার ওপর পড়েছিল স্বাস্থ্য-বিভাগের আক্রমণ। স্বর্গীয় দত্ত সাহেব নাচের দল নিয়ে টোপা পানার ধ্বংসের কাজেও আসরে নেমেছিলেন। টোপা পানা তুলে

তাতে খড় সংযোগে আগুন দিয়ে চারিপাশে ব্রতচারীদল নৃত্য করত আর গান করত--

"মশার মাসী সর্বনাশী
আয় দোব তোর গলায় ফাঁসী
ছিঁড়ব রে তোর ঘেরা টোপ
পোড়াব তোর দাড়ি গোঁফ।"

গানটির লাইন ঠিক মনে নেই, তবে মশার মাসী শব্দটি আছে এবং 'পোড়াব তোর দাড়ি-গোঁফ' লাইনটিও আছে। তখনকার উৎসাহ এমন এবং আই-সি-এস-কবি দত্ত সাহেবের প্রতাপ এমন যে মাসীর দাড়ি-গোঁফ কি ক'রে গজাল বা যার দাড়ি-গোঁফ আছে সে মেসো না হয়ে মাসী কেন হ'ল, এ প্রশ্ন তুলবার কারও অবকাশও হয়নি এবং সাহসও হয়নি। সম্ভবত সর্বনাশী গালিটি দেবার জন্যই মাসী এবং ফাঁসী কাব্যে আমদানি হয়েছিল।

যাই হোক, ডঁরুলি মেসোই হোক বা মাসীই হোক, কি ডঁরুলি ডঁরুলিই হোক, তাকে নেচে পুড়িয়ে শেষ করা যায় না—শেষ করতে হ'লে মজুরের দরকার করে। বর্ষার শেষে পুকুরগুলি ভ'রে উঠলে পুকুর থেকে এই টোপা পানা তুলে ফেলার কাজ ইউনিয়ন-বোর্ডের কাঁধে এসে পড়ত ;— এবং বোর্ড মজুর লাগিয়ে ডঁরুলি তুলে ফেলত। জনকয়েক বাউ রী-মজুরকে নিয়মিতভাবে এই কাজে আমার বোর্ড থেকে নিযুক্ত ক'রে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে দু'জন ছিল—যারা নাকি পরস্পরের খাঁটি মিত্র। রাষ্ট্রবিপ্লব—দিল্লী অনেক দূরের ব্যাপার এদের কাছে, রাজদ্বারও তাই, ওই দুটো ক্ষেত্রে ছাড়া—উৎসব-ব্যসন-দুর্ভিক্ষ-শ্মশান সব ক্ষেত্রেই পরস্পরকে ছেড়ে ওরা থাকত না। মদের দোকানে, গানের আসরে, যাত্রা-গানের আসরে পাশাপাশি বসত, একে অন্নের ভাগ অপরকে দিত। মড়া পোড়াতে যেতে হ'লে দু'জনের দুটো কাঁধ দুই পাশেই থাকত। কঠিন পরিশ্রমে দু'জনেরই ছিল সমান ভয়। গান গাইত গলা মিলিয়ে—

চাষকে চেয়ে গোরা চাঁদ রে মান্দেরি ভাল।

এ ক্ষেত্রে গোরাচাঁদ সে নদীয়ার গোরাচাঁদ—তাঁকে সম্বোধন ক'রে দু'জনে গলা মিলিয়ে নিবেদন করত—হে প্রভু গোরাচাঁদ, চাষে খাটা অতীব কঠিন কর্ম, এর চেয়ে 'মাহিন্দারি' অর্থাৎ 'মাহিনাদারী' —গো-সেবার চাকুরিও অনেক ভাল। তাতে থাকে কিল চড় চাপড়। বাঁধা ভাত-কাপড়ের সুখে সহ্য হয়। করুক মনিব বাপান্ত কিন্তু মাঠ-ভরা জলে উদয়াস্ত খেটে পায়ে হাতে হাজা হয় না, পিঠে দাদ চুলকানি হয় না। এমন প্রকৃতির দুই বন্ধু, নাম—নিত্যানন্দ এবং পাঁড়ে। পাঁড়ের নাম পাঁড়ে কেন এ গবেষণা কেউ কোনোদিন করেনি। নেতো এবং পাঁড়ে। প্রতিদিনই তারা কোনো-না-কোনো পুকুরের পানা তুলত বা ঘাট পরিষ্কার করত। অপরাহ্নে এসে টিপছাপ দিয়ে পয়সা নিয়ে গলা ধরাধরি ক'রে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরত গ্রামের দক্ষিণের রেলপথ ধ'রে

খ

যে-দিনের ঘটনা সেই দিন অপরাহ্নে ইউনিয়ন বোর্ড-আপিসে ব'সে আছি, এমন সময় একা নেতো এসে হাজির হ'ল। বললে—পাঁড়ে আসছে। অনেকক্ষণ যায়, পাঁড়ের প্রতীক্ষায় ব'সে রয়েছি, নেতো রয়েছে, সেক্রেটারি রয়েছে, আমি রয়েছি; পাঁড়ে আসে না।
অবশেষে নেতোর হাতেই দু'জনের মজুরি দিয়ে তাকে বিদায় ক'রে আমরা বেরিয়ে এলাম।
এর ঠিক ঘণ্টা দেড়েক পরে।
আমার বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা বসেছে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা. আকাশে মেঘ। বন্ধুরা কয়েকজন তাস নিয়ে বসেছেন—আমি বসেছি একখানা বই নিয়ে। অকস্মাৎ গ্রামপ্রান্তে একটা আর্ত কলরব শোনা গেল। কি হ'ল? চকিত হয়ে উঠলাম আমরা। ওদিকে

কলরব বেড়ে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে যেন, এখনও ঘ'টে শেষ হয়নি ঃ. যেমন হয় আগুন লাগলে। কিন্তু সময়টা বর্ষার সময়, আগুনের তো কাল নয় এটা! ছুটে সকলে বেরিয়ে গেলাম। আমাদের বৈঠকখানা থেকে গ্রামপ্রান্ত সাধারণ পদক্ষেপে মিনিটছয়েকের পথ। ছুটে গেলাম তিন মিনিটে। আমাদের গ্রামের প্রান্তরেখা রেল লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা। লাইনের ওপারেই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। প্রায় দুই-আড়াই মাইল প্রশস্ত। লাইনের উপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ দাঁড়িয়ে হায়-হায় করছে। লাইনের ওপারে আকাশ-ভুবন-জোড়া মেঘলা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার। মাঠের গাঢ় সবুজ ধান আর আকাশের নীল সেই অন্ধকারের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে; শুধু ওই অন্ধকারের মধ্য থেকে ভেসে আসছে একটা প্রাণ-ফাটানো আকুতি-ভরা ডাক, কেউ যেন প্রাণপণ চিৎকারে দিগন্ত পর্যন্ত ডাক ছড়িয়ে দিয়ে কাউকে ডাকছে—দাঁড়া রে, দাঁড়া রে! ওরে, দাঁড়া রে! এবং সে বিরতিহীন চিৎকার অতি বিচিত্র ও বিস্ময়করভাবে ক্ষণে ক্ষণে দিক পরিবর্তন ক'রে চলেছে। এখনি মনে হয় ঠিক সম্মুখে খানিকটা দূরে, পরক্ষণেই মনে হয় ডাইনের দিকে ছুটেছে সে ডাক, পরক্ষণেই মনে হয় আবার সামনে ঘুরে চলল এগিয়ে,—তার পরক্ষণেই মনে হয় ফিরল বাঁ দিকে।

তার পিছে ডাইনে বাঁয়ে অনেক মানুষের বিভিন্ন কণ্ঠের ডাক শোনা যাচ্ছে—নেতো, নেতো, নেতো, ওরে নেতো! কিন্তু ডাকগুলির সঙ্গে ওই ডাকের অনেক প্রভেদ। কণ্ঠস্বরের আকুতির গাঢ়তায়, প্রচণ্ডতায় অনেক প্রভেদ।

কি হ'ল? বুঝতে পারলাম না।

একজন প্রৌঢ়া বললে—নেতাকে ভুলোয় নিয়ে গেল গো!

ভুলো? বিচিত্র ছলনাময়ী রহস্য; সে নাকি মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এবং মানুষকে হত্যা করে। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলে—বাতাসে ভর দিয়ে চলে হাতছানি দিয়ে ডেকে ডেকে, আর

মানুষ চলে তার পিছনে ছুটে; প্রাণপণে ছোটে দু'হাত বাড়িয়ে কিন্তু ধরা তাকে যায় না। তবু সে ছোটে—থামতে সে পারে না, থামা যায় না। ছুটতে ছুটতে দুর্ঘটনা ঘটে, জলের মধ্যে পড়ে, খানার মধ্যে পড়ে, হৃদ্‌পিণ্ড ফেটে যায়, সাপে কামড়ায়; মানুষ মরে। সামনে পড়ে জল, তারই উপর দিয়ে লঘু পদক্ষেপে সে রহস্য হেঁটে চ'লে যায়; বিহ্বল অনুসরণকারী সেই পথে ছুটতে গিয়ে পড়ে অগাধ জলে। খানা-খন্দকের উপর দিয়ে সে চ'লে যায়, অনুসরণকারী সেই খানার মধ্যে প'ড়ে যায় মাথা গুঁজে। এমন অনেক গল্প শুনেছি। বিশ্বাস করিনি। আজ শুনে এবং সম্মুখে এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে নেতোর উন্মত্ত আকুল আকুতি-ভরা প্রাণ-ফাটানো চিৎকার শুনে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। এ যেন প্রাণের সর্বস্বকে নিয়ে চোখের সামনে ওই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কেউ চ'লে যাচ্ছে আর প্রাণ-সর্বস্ব-হারা মানুষ তাকে ধরবার জন্য ছুটেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলেছে, দূর থেকে আরও দূরে চলেছে। বিস্তীর্ণ ধান-ভরা জল-ভরা সরীসৃপ-সঙ্কুল, নালায়, বাঁধে গাছের শিকড়ে বাধা-বন্ধুর পথ হেলায় অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছে; দু'মাইল দূরে ভাদ্রের ভরা কূয়ে নদী। নদীতে এবার তুফান. কুটিল ক্রুর আবর্ত ঘুরপাক খেয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে ওই মুখে। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে-ফিরেও গতি তার দক্ষিণমুখী. সম্মুখে দক্ষিণ দিকে নদী।

অপেক্ষা করতে পারলাম না। আমিও ছুটলাম।

৭

এক সময়ে মনে হ'ল নেতোকে বুঝি পেলাম। খুব কাছে শুনলাম নেতোর কণ্ঠস্বর। অন্ধকারের মধ্যে চোখ তখন অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।

অন্ধকারের মধ্যেও উন্মত্তের মত ধাবমান। নেতোকে দেখতে পেলাম। একখানা ধান-ভরা ক্ষেতের ওপারে সে, এপারে আমি এবং আরও দু'তিনজন। সে কী তার ভঙ্গি—সে কী তার দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য গতির প্রচণ্ডতা! আর সে কী তার কণ্ঠস্বরের প্রচণ্ডতা এবং আকুলতা! সামনে আশেপাশে অন্ধকার আর অন্ধকার; শুধু কালো বায়ুস্তর, কিন্তু তারই মধ্যে নেতো যে কাউকে দেখছে, স্পষ্ট দেখছে সন্দেহ নাই। একটা হাত বাড়িয়ে সে যেন সম্মুখের তার আঁচল চেপে ধরতে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না। আমরা এবার নেতোকে পাব। যে পথে সে আসছে আমরা কোণাকুণি সেইদিকে ছুটেছি, নেতোর পথ রোধ করে দাঁড়াব।

হঠাৎ নেতো ঘুরে গেল। যার পিছনে সে ছুটেছে সে যেন চোর চোর খেলার খেলুড়ের মত তার হাতের সীমানা এড়িয়ে ঘুরে গেল ডান দিকে। নেতো ঘুরল; ঝাঁপিয়ে পড়ল জল-ভরা মাঠে। আমরা পিছনে প'ড়ে গেলাম। জল-ভরা ধান-ভরা মাঠে নামতে সাহস হ'ল না। দেখতে দেখতে নেতো আরও দুটো মোড় ফিরে চলে গেল দূরে। অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরবার জন্য উন্মত্ত গতিতে নেতো ছুটেছে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরে—মোহিনীর পিছনে শিবের মত ছুটছে আর ডাকছে—দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! ওরে, দাঁড়া রে! পাঁড়ে! পাঁড়ে! পাঁড়ে!

ডাকছে সে পাঁড়েকে। পাঁড়েই তার মোহিনী।

অথচ পাঁড়ে আমারই সঙ্গে। সেও সাড়া দিচ্ছে—ওরে নেতো! ওরে, এই যে আমি। ওরে!

সে-কথা নেতোর কানে যাচ্ছে না, ঢুকছে না। সে ছুটে চলেছে—অন্ধকারের মধ্যে কোন পাঁড়ে চলেছে তার পিছনে! এ পাঁড়ে এ মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গিয়েছে তার কাছে।

সে পাঁড়ে ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার দিয়ে। ওই নদীর দিকে।

সেই শ্রাবণ-রাত্রের গাঢ় গভীর অন্ধকার রাত্রির কুক্ষিগত বিস্তীর্ণ

প্রান্তরের মধ্যে সেই বাউরী জোয়ান উন্মত্তের মত ছুটে চলেছিল, হাত বাড়িয়ে সে ছুটেছিল—সম্মুখেই তার প্রাণের পরম ধনের মত কল্পনার মূর্তি। যে মূর্তিকে সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে শুধু পৃথিবী অর্থাৎ স্থানই শুধু নয়—কালও অর্থাৎ চারি-দিকে সেই গাঢ় অন্ধকারেরও বোধ করি অস্তিত্ব ছিল না—বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ বলছি: নেতো ছুটে চলেছে অন্ধকারের দিকে হাত বাড়িয়ে অথচ তার চারিপাশে না-হোক—তিন পাশে ডাইনে বাঁয়ে পিছনে অনেকগুলি আলো তাকেই অনুসরণ ক'রে ছুটেছে—তবু সে আলো তার চোখে পড়ল না, সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কোনো ইশারা দিতে সমর্থ হ'ল না। উন্মত্ত পদক্ষেপে ছুটে সে চলেছিল—খাল বিল কাঁটা পাথর—পায়ের তলায় যা এসেছে তারই উপর দিয়ে সে ছুটেছে; পথ বাছা দূরের কথা, পথের স্পর্শানুভূতিও সে অনুভব করছিল না। তাই বলছি, সেদিন তার স্থান কাল বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে একমাত্র অবশিষ্ট ছিল তার মানস কল্পনার পাত্র—তার পরম বন্ধু।

সম্মুখে দু'কূল পাথার নদী।

নেতোর পরম বন্ধু ছুটে চলেছে ভরা নদীর দিকে। আমি এবং আরও অনেকেই মনে মনে অনুমান করলেন—বন্ধু তার ওই ভরা নদীর উপর দিয়ে লঘুপদক্ষেপে পার হয়ে ও-পারে মিলিয়ে যাবে; নেতো ডুবে যাবে ওই পাথারের মধ্যে। হয়তো বা যে মুহূর্তে ডুববে নেতো—সেই মুহূর্তে ওই জলস্রোতের তলদেশে কেউ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, বলবে—এই যে আমি। কিন্তু না, নেতো অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন করলে, ছুটতে শুরু করলে নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে। এবার সে ছুটেছে—নদীর উপরে রেলের পুলের দিকে। রেলের পুল প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু—গোড়ার দিকটা বড় বড় পাথরের চাঙড় দিয়ে ঢাকা—তার উপরে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা; একেবারে উপরে খানিকটা জায়গা এক বিঘত লম্বা, আধ ইঞ্চি মোটা—সূচালো লোহার কাঁটায় সমাচ্ছন্ন। নেতো অবলীলাক্রমে

উঠে গেল সেই ওপরে। সেই কাঁটার উপর গিয়ে দাঁড়াল। ও-দিকে চল্লিশ ফুট নীচে হাসছে তার পরম বন্ধু। ঠিক এই মুহূর্তে একজন তাকে জাপটে ধরলে। সে আমাদের ও-অঞ্চলের বিখ্যাত দাগী শশী ডোম। হরিণের চেয়ে সে ক্ষিপ্র। সে ঘুরপথে ছুটে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে নেতোকে জাপটে ধ'রে আয়ত্ত করলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, বোধ করি মিনিট চারেকের মধ্যেই, আমরা গেলাম। দশ-বারোটা আলো চারিপাশে এসে জমা হ'ল। দেখলাম ক্ষতবিক্ষত-সর্বাঙ্গ নেতো পাথরের মূর্তির মত ব'সে আছে, নিষ্পলক নিরুত্তর; শুধু হাঁপাচ্ছে, চোখ দুটি জবাফুলের মত গাঢ় লাল এবং বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে-দৃষ্টিতে কোনো কিছু দেখবার কোনো ইঙ্গিত কোনো চিহ্ন নাই; কোনো দূর-দূরান্তে হয়তো বা অন্য কোনো জগতের কিছুতেই তার সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। তার বাপ এল, ভাই এল, স্ত্রী এল—সামনে দাঁড়ালে, ডাকলে; তবু তার দৃষ্টি ফিরল না, কোনো উত্তরও সে দিলে না। যে পাঁড়ে বন্ধুর জন্য উন্মত্ত হয়ে ছুটেছিল, সে এসে দাঁড়ালে তবুও কোনো সাড়া এল না, দৃষ্টিতে এতটুকু পরিবর্তন দেখা দিল না। তার কাঁধ ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, দেহে তার স্পন্দন জাগল না। আমি নাড়া দিতে গিয়ে অনুভব করলাম—দেহটা যেন শক্ত হয়ে গেছে কোনো রকমে তাকে তুলে ঘরে আনা হ'ল। মাইল দেড়েক পথ, নির্বাক-নিষ্পলক নেতো এল যেন নিষ্প্রাণ মানুষের মত। সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য! বাড়ীর দরজায় এসেই সে চমকে উঠল; একটা আর্ত-চিৎকার ক'রে সে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল। তার পর যখন তার জ্ঞান হ'ল, সে তখন সহজ মানুষ। বললে—সে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় রেল লাইনের উপরে পাঁড়ে-বন্ধুর প্রত্যাশায় ব'সে ছিল। হঠাৎ এক সময় সে দেখলে, পাঁড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে এবং তাকে সে ইঙ্গিতে আহ্বান জানিয়েই চলতে শুরু করলে। নেতো তাকে বললে—দাঁড়া। সে দাঁড়ালে না। নেতো গতি দ্রুততর করলে, তবু ধরা গেল না।

নেতো ছুটল, তবু ধরতে পারলে না। প্রান্তরে ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সে ছুটল। এই একটু দূরে হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে হয়তো; কিন্তু না, ধরা যায় না। সে ছুটল তার পিছনে। কোথা দিয়ে সে ছুটেছে তা তার মনে নেই; কেমন ক'রে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তার স্মরণ হয় না। এর পর থেকে নেতো সন্ধ্যা হ'লেই কেমন অভিভূত হয়ে যেত ভয়ে। তার এই ব্যাপারটি আমার কাছে শুধু কৌতূহলের বস্তু হয়েই র'য়ে গেল—ব্যাখ্যায় শুধু ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু মনে হ'ল না। এর চেয়ে একবিন্দু বেশি গুরুত্ব আরোপ করিনি। কিন্তু এর ব্যাখ্যা আশ্চর্যভাবে আমার সামনে এসে উপস্থিত হ'ল কিছু দিন পরেই। আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলাম।

২

১৯৩২ সালের আষাঢ় মাস। ঠিক ওই সন্ধ্যার পর আকাশে গাঢ় ঘন মেঘ, ফিন্‌ফিনে ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। মুহূর্তে মুহূর্তে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। বর্ষা সে-বার প্রবল এবং প্রথম বর্ষা থেকেই বৃষ্টি নেমেছে—প্রান্তরে প্রান্তরে কৃষিক্ষেত্র জলে ভ'রে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যেও ঘোলা সাদাটে জল আকাশমুখী হয়ে মাটির বুক ঘেঁষে একটি স্বচ্ছ প্রতিফলন ফেলেছে; অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় যেমন একটি প্রভা বিস্তার করে ঠিক তেমনই। সন্ধ্যায় তখন একখানি ট্রেন যায়; সেই ট্রেনে একজন রাজনৈতিক কর্মীর আসবার কথা। আসবেন গোপনে, আমারই কাছে আসবেন। তাঁর প্রতীক্ষাতেই গিয়ে দাঁড়াব রেল-লাইনের পাশে; তিনি স্টেশনে নামবেন প্ল্যাটফর্মের বিপরীত দিকে; তারপর এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা দু'জনে নির্জন প্রান্তরে গিয়ে

কথাবার্তা বলব। সন্ধ্যার মুখে বাড়ী থেকে বের হলাম। কিছু দূরে গিয়েই দেখা হ'ল আমারই এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে। তাঁদের কাছারিবাড়ীর বারান্দাতেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন; যাবেন মাঠে সান্ধ্যকৃত্যের জন্য। এই বন্ধুটি আমার মানুষ হিসেবে অতুলনীয় দুর্লভ মানুষ। প্রেম যেখানে, প্রীতি যেখানে,—সেখানে তিনি তাঁর মর্যাদা রাখতে, তাঁর সম্মান রাখতে, বোধ করি সব কিছু উৎসর্গ করতে পারেন; অকপট বিশ্বাসে তাঁর কাছে যা গচ্ছিত করা যায়, তাকে তিনি জীবনমূল্যে রক্ষা ক'রেই ক্ষান্ত হন না, জীবনের পরপার যদি থাকে, তবে সেখান থেকে ছায়ামূর্তিতে ফিরে এসে সেই গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ ক'রে যাবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। ইংরেজী শিক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করেননি ব'লে মনে মনে তাঁর কুণ্ঠা আছে, লজ্জাও আছে। কিন্তু আমি জানি, এই নূতন যুগে অতীতকালের এক মহান ঐতিহ্যের তিনি এক দুর্লভ অধিকারী। তিনি আমাকে দেখেই নেমে এলেন পথের উপর, বললেন—মাঠে যাবে? চল।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম, মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা বহন ক'রেই পথ চলছিলাম; ভাবছিলাম, যে রাজনৈতিক কর্মীটি আসবেন রাত্রে তাঁকে কিভাবে নিরাপদে রাখব সেই কথা। তিনি তখন আত্মগোপনকারীরই সামিল। গোপনে নতুন আন্দোলনের ভূমিকা রচনা ক'রে ফিরছেন। আমার বাড়ী গভীর রাত্রেও নিরাপদ নয়। পুলিসের নজর তো আছেই—তার চেয়েও বেশি হ'ল আমার বাড়ীর লোকের নজর। আমার বাড়ীতে তখন বাইরের লোক অনেক। অন্তত বারো-চোদ্দোজন। তার মধ্যে কয়েকটি স্কুলের ছাত্র; তারা আমার বাড়ীতে থাকে, খায় এবং স্কুলে পড়ে। এ ছাড়াও আমার ছেলে। বালকমণ্ডলী তখন অসীম আগ্রহে, গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে, প্রতিটি আগন্তুককে জানতে চায়, চিনতে চায়। তাঁদের পরিচয় জানতে চায়, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। মনে মনে স্থির করেছিলাম, আগন্তুককে

অপরিচিত আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে নিয়েই যাব বাড়ীতে কিন্তু তাতেও আশ্বাস পাচ্ছিলাম না। এই কৌতূহলী কিশোরদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ—প্রায় অভ্রান্ত। ঠিক এই কারণেই এই বন্ধুটিকে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম, নিশ্চিন্ত হলাম। মুহূর্তে মনে হ'ল পেয়েছি, নিরাপদ নিশ্চিন্ত স্থান পেয়েছি। মনে পড়ে গেল একটি বিদেশী গল্পের কথা। এক চাষীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল এক পলাতক অপরাধী। অনুসরণকারী রক্ষী যখন এল, তখন পলাতককে সে লুকিয়ে রেখেছিল খড়ের গাদার মধ্যে। রক্ষীদল তন্ন তন্ন করে সন্ধান করেও যখন পলাতককে পেলে না তখন দৃষ্টি পড়ল ওই চাষীর ছেলের উপর। চাষীর ঘরের কিশোর ছেলে—সরল গ্রাম্য ছেলেটির চোখে বিচিত্র দৃষ্টি, বিস্ময় লোভ ভয় অনেক কিছুই খেলা করছে। রক্ষীদলের নায়ক চতুর এবং বিচক্ষণ। সে তাকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে লোভ দেখালে। লোভের বস্তু পেলে ছেলেটি ব'লে দিলে পলাতকের সংবাদ। রক্ষীদল সদর্পে গোয়ালের ভিতর থেকে পলাতককে ধ'রে নিয়ে গেল। চাষী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে তারপর বন্দুক বের ক'রে ছেলেকে বললে—প্রার্থনা কর্। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নিতে হবে তোকে। এবং সে শাস্তি সে দিলে। আমার বন্ধু সেই ধরনের মানুষ। তারই বাড়ীতে রাখব আজকের আগন্তুককে। তাঁর কাছে কথাটা বলব গ্রাম শেষ হলেই বলব। দু'জনে এসে গ্রামপ্রান্তে পৌঁচেছি, কথাটা বলব, ঠিক এই সময় ডাক এল পিছন থেকে বন্ধুর বাড়ীর পাইক তাঁকে ডাকছে। দাঁড়ালাম দু'জনে।

পাইক এসে বললে, আপনাকে ডাকছেন ন-বাবু। অর্থাৎ আমার বন্ধুর কাকা। শুনলাম, কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন; বন্ধুকে বিশেষ প্রয়োজন। পত্তনির খাজনা দিতে এসেছেন। তাঁর তাড়া আছে।

বন্ধু বললেন, তুমি দশ মিনিট অপেক্ষা কর। পারবে?

পারব বই কি। পারতেই হবে। ইতিমধ্যে ট্রেনও আসবে, সুতরাং

আগন্তুককে সঙ্গে নিয়েই প্রান্তরের দিকে যেতে পারব। বললাম, আমি কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি, রেল-লাইনের লেবেল ক্রসিঙের পাশে থাকব।

—ঠিক থেকো। আমি আসছি।

খ

বন্ধু চলে গেলেন। আমি অগ্রসর হলাম। কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির প্রথম প্রহর; ডাইনে একটা বিস্তীর্ণ বাগান রেল-লাইনের ধার পর্যন্ত প্রায় চলে গেছে, বাগানের চারিপাশে পাঁচিলের মত দুর্ভেদ্য ঘন তেঁতুল তাল গাছের সারি, ভিতরে বড় বড় আম, লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ। অন্ধকার ঘন করে তুলেছে বাগানটার ছায়া; ডাইনে ঘোলাটে জল-ভরা মাঠ, সামনে রেল-লাইন; তার ও-পাশে সুবিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। দূরে রেল-লাইনের ডিস্টাণ্ট সিগ্ন্যালের মাথায় গাঢ় রক্তবর্ণ আলোটা জ্বলছে। জনকোলাহল স্তব্ধ, বর্ষার উতলা বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে সজল স্পর্শ বুলিয়ে। দাঁড়ালাম। চারিদিকে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গের সমবেত বিচিত্র স্বরধ্বনি উঠছে; তাকে ঢেকে উঠছে বর্ষার মাঠে হাজার হাজার ব্যাঙের ডাক। মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে মাঠের ভিতর থেকে—মানুষের দু'চারটে কথা; আর উঠছে অবিরাম ছপ্ ছপ্ শব্দ; জলে আছড়ে আছড়ে কেউ কিছু ধুয়ে ফেলছে। চাষীরা বীজক্ষেত থেকে ধানের বীজচারা তুলে ছপ্ ছপ্ আছাড় দিয়ে শিকড়ের মাটি ধুয়ে নিচ্ছে। আমি দাঁড়ালাম লেবেল ক্রসিঙের ধারে। সামনে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে—দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত, ডাইনে বাঁয়ে পূর্বে পশ্চিমে দেড় মাইল দেখা যাচ্ছে। জল-ভরা মাঠের ঘোলাটে জল—একটা বিরাট শব্ধবে

ফরাসের মত বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে—মাটির বুক ঘেঁষে আকাশমুখী একটি প্রতিফলন পড়েছে এই স্বচ্ছতায়। আকাশে মৃদুগম্ভীর মেঘ ডাকছে—গুরু গুরু গুরু ডাক। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ বিদ্যুতের চমকে চকিত হয়ে উঠছে: আকাশ মাটি জোড়া এই অন্ধকারে তরঙ্গ ব'য়ে যাচ্ছে যেন।

এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই আমার মন দৃষ্টি চেতনা—সব বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে মনের মধ্যেই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল আগন্তুকের। ট্রেন এল, স্টেশনে দাঁড়াল, বাঁশী বাজল সশব্দে—আবার তার যাত্রা শুরু হ'ল। আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। আমার বুকের ভিতরটায় গুরু গুরু ধ্বনি উঠল। এইবার আগন্তুক আসবে। আমার চোখের সামনে আর তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র নেই। আকাশ নেই; কোনো শব্দ নেই; আছে শুধু রেল-লাইনের স্বল্প খানিকটা স্থান একটি মানুষ আসবার মত একটি পথ। আর সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্তরলোকে সে রয়েছে - ভাবনায় রয়েছে—চিত্তলোক জুড়ে রয়েছে—তাকে দেখছি। বাইরের দিকে তাকে দেখবার জন্য চোখ দুটি বিস্ফারিত নির্নিমেষ। কই সে? কই?

"তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্বরী মেঘমগন তারা
নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা
তমাল বন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।"

—মহাকবির এই গানখানি সেদিন সেই বর্ষণঘন রাত্রির প্রারম্ভে আমার জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেই রাত্রির কথা যখনই মনে হয় তখনই মনে পড়ে এই গানখানি।

কৃষ্ণপক্ষের মেঘাচ্ছন্ন আষাঢ়-রাত্রির প্রথম প্রহর। সম্মুখে অবাধ বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, মনে হয় —এর পর আর কোথাও কিছু নাই। তারই মধ্যে বর্ষার মৌসুমী

বায়ু বইছে—কখনও মৃদুমন্দ, কখনও উতলা তার গতি। উতলা গতির সঙ্গে সঙ্গে আসছে বর্ষণ; পিছনে আমবাগানের পত্র-পল্লবে উঠছে ঝরঝর শব্দ। এরই মধ্যে যার প্রতীক্ষায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম সর্বাঙ্গ বর্ষাতিতে ঢেকে নিশ্চল নির্বাক হয়ে; তারই চিন্তায়, তারই ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেলাম। আজও বুঝতে পারি, জোর ক'রে বলতে পারি, সে তন্ময়তা দুর্লভ—সে তন্ময়তার মধ্যে কোথাও এক বিন্দু এক চুল ছিদ্র ছিল না। লক্ষীন্দরের লোহার বাসরঘরে ছিল একটি চুল-পরিমাণ চক্ষুর অগোচর ছিদ্র; কালনাগিনী সেই ছিদ্রপথের মুখ বিষ-নিশ্বাসের বহ্নুত্তাপে গলিয়ে পরিসর করে তুলে অনায়াসে প্রবেশ করেছিল সেই ঘরে। ভাবনার জনকে নিয়ে তন্ময়তার যে লোহার ঘরে বাসর পাতা যায়, সে ঘরে এমনই চুল-পরিমাণ ছিদ্র থাকলে বাইরের পৃথিবী যে কোনো মুহূর্তে সেই পথে ঢুকে বসে—সে বাসর ব্যর্থ ক'রে দেয়। আমার তন্ময়তায় সেদিন সে ফাঁকি ছিল না। সম্মুখের যে পায়ে চলা পথ—সেই পথ ছাড়া দেখতে দেখতে সব বিলুপ্ত হয়ে গেল। দেখলাম—একজন কে আসছে, চলে আসছে হনহন ক'রে। সর্বাঙ্গ তার আচ্ছাদনে আবৃত। মুহূর্ত কয়েক পরেই চিনলাম তার পদক্ষেপ, তার আকৃতি অবয়ব। দীর্ঘাকৃতি মানুষ—দীর্ঘ লঘু পদক্ষেপ। আমার বাঁ দিক থেকে এসে সামনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। তার পর সে চলতে শুরু করলে সম্মুখপথে।

৭

সম্মুখে—দক্ষিণে সেই অন্ধকার অবলুপ্ত বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র। ডাকলে আমাকে। ইশারায় ডাকলে। মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, নির্জন নিরাপদ স্থানের জন্য সে চলেছে কৃষিক্ষেত্র পার হয়ে আমাদেরই

তারা বাগানে। এই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রটির মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে পাকা সড়ক—সিউড়ি থেকে কাটোয়া। তার ওপাশেই আমাদের একটি বাগান আছে। বাগানের মধ্যেই আছে তারা দেবীর মন্দির। আমার বাবা স্থাপন ক'রে গিয়েছিলেন। অনেক আলাপ অনেক পরামর্শ এই বাগানে এর আগে হয়েছে। তাছাড়াও এই বাগানের মধ্যেই রডা আর্মস লুট কেসের অন্যতম বিপ্লবী কর্মী শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি বাড়ী করেছিলেন, আমি তাঁকে জায়গা দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে এই সব কর্মীদের কাছে এই বাগান বিশেষ পরিচিত। সে সেইখানে চলেছে—এই ভেবে আমি নীরবে অনুসরণ ক'রে চললাম। দীর্ঘ পদক্ষেপে লম্বা মানুষটি চলেছে দ্রুততালে। আমার সম্মুখে তার ও আমার মধ্যের আন পথটুকু; দু'পাশে জলভরা মাঠের অস্তিত্ব নাই—আভাস আছে। জলের উপর বৃষ্টিধারা পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দু পা চার পা অন্তর আমার পায়ের সাড়ায় কীট-পতঙ্গ ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে জলে। সে চলেছে—আমিও চলেছি। কৃষিক্ষেত্রের একটা খাল পার হয়ে পাকা সড়কের বাঁধের উপর সে উঠল। আজও আমার চোখের উপর ভাসছে সে মূর্তি। তার ওপাশে দক্ষিণ দিকে আমাদের সেই বাগান। কিন্তু সেই মূর্তি দক্ষিণ দিকে নামল না, পশ্চিম মুখে দিক পরিবর্তন করলে; সড়ক ধরেই এগিয়ে চলল। মুহূর্তে আমার মনে হ'ল অদূরেই আছে একটি কালভার্ট; বড় একটি শিমুল গাছ তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছে ওই কালভার্টটির উপর। এইখানেও অনেক দিন অনেক জটলা করেছি, পরামর্শ করেছি। বুঝলাম, ওই স্থানটিতেই কথা বলবে।

সে চলেছিল দ্রুত, গতি হ'ল দ্রুততর। আমিও চললাম দ্রুততর গতিতে। সড়কের দুই পাশে ঘন কেয়াফুলের জঙ্গল। সে জঙ্গলের মধ্যে শেয়ালের বাসা। আগে এখানে থাকত হায়েনা, নেকড়ে। আর এখন আছে বীরভূমের মাঠের কালো কেউটে। সেদিন কোনো কথা মনে হয়নি। চলেছি, চলেছি। সে চলেছে, আমিও চলেছি।

সে যখন রয়েছে তখন ভয় কোথায়, ভয় কিসের ? সেই কালভার্ট পার হয়ে গেল সে—আমিও পার হলাম। আচ্ছন্ন হয়ে অনুসরণ করে চলেছি—মনে আর প্রশ্ন নাই, শুধু আছে উদ্বেগ--ওই মানুষটির সঙ্গ নেবার—তার হাত ধরবার ; বুকের স্পন্দনও অনুভব করছি না। চলেছি বিস্তীর্ণ মজাপুকুরের ভিতর দিয়ে। সড়কটি এই মজাপুকুরের বুক চিরে চলে গেছে। মজাপুকুরের গর্ভে এখন ধানক্ষেত হয়েছে ; শুধু চারিপাশে উঁচু পাড় চারটি পুকুরের স্মৃতি বহন করছে। বিশাল আয়তন উঁচু পাড়, সেয়াকুলের জঙ্গল, বন শিরিষ ও কপিত্থের বন ছেয়ে রেখেছে এই পাড়গুলিকে। তারই ভিতর সরু এক ফালি পায়ে-চলা পথ। এই পথও খানিকটা গিয়ে আর নেই। আমার সম্মুখের পরম কামনার জনটি হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে মোড় ফিরে এই জঙ্গলের মধ্যে দক্ষিণমুখে ফিরল।

আমিও ফিরলাম। অনায়াসে নির্ভাবনায় প্রশ্নহীন শঙ্কাহীন চিত্তে দ্রুতপদক্ষেপে চলেছি। পাড়টির পশ্চিমদিকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর —আমাদের খেলার মাঠ। গ্রাম থেকে দেড় মাইল দূর। এই প্রান্তরের সমস্ত জল এসে নামে পাড় ভেঙে কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে, এই ভাঙনে সেদিনে সেই বর্ষণমুখর রাত্রে জলস্রোত নেমে চলেছে ঝর ঝর শব্দে। আমি জানি এই জলধারার দু'পাশে অন্ধকারের মধ্যে নিকষ কৃষ্ণ দেহ কেউটে মুখ বের করে বসে থাকে ; মাছ, শামুক, ব্যাঙ—জলস্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যাবে। সে ছোবল মেরে তাকে ধরবে। ক্ষুধার্ত—আহারপ্রত্যাশী কালো কেউটে। আমি জানি। কিন্তু সেদিন মনে হয়নি। কেন হয়নি জানি না।

জানি না কেন, জানি বৈকি। সেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার সম্মুখের ওই মানুষটি ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব আমার কাছে ছিল না। স্থান ছিল না, কাল ছিল না, ছিল শুধু সে। আমার সকল কাম্য তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আমার জীবনের পথ ওই তারই পিছনে আঁকা হয়ে চলেছে, আমার সকল আনন্দ সকল সুখ সকল প্রাপ্তি সব—সব—সব যেন সে-ই। আমার পিছন মুছে গেছে—

ঘর-সংসার—এমন কি আমার নিজের অস্তিত্বও বোধ হয় বিলুপ্ত হয়ে আসছিল ক্রমশ। সে ছাড়া আমি মিথ্যা। এমনি একটি অনুভূতি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল আমাকে। কী গভীর, কী অমোঘ যে তার আকর্ষণ! সে পার হয়ে গেল সেই ভাঙন। আমিও গেলাম পার হয়ে। নিঃশঙ্ক অনায়াস পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে। ভাঙনের ওপারে উঠলাম—স্পষ্ট মনে পড়ছে তার ও আমার মধ্যে দূরত্ব এর মধ্যে বৃদ্ধি পায়নি। এইবার সে নিশ্চয় থামবে। আমি গতি আরও দ্রুততর করলাম। সেও চলল, থামল না।

মজাপুকুরের পাড় অতিক্রম করে আর একটা গভীরতর ভাঙনে সে নামল, আমিও চললাম। নামব সেই ভাঙনে, ভাঙনের ওপারে ঘন তালগাছ ও শরবনের বেড়ার ঘেরের মধ্যে আমারই জ্যাঠামশায়ের বাগান। দ্বিতীয় ভাঙন পার হয়ে সেই বাগানের বেড়ার ধারে উঠল সে। আমি এপার থেকে পা বাড়ালাম—ভাঙনে নামব। নিচে জলস্রোত বইছে। হঠাৎ আমাকে পিছন থেকে কে টানলে। পায়ের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। জটিল বাধনে কে যেন আমার পা দুটোকে বেঁধে ফেলেছে, আমি জড়িয়ে গিয়েছি কিছুতে।

ঘ

'কে? কিসের বাধা?'

সেয়াকুলের কাঁটার ঝোপের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছি। পায়ের হাঁটু অবধি দুই পায়ের কাপড় আটকেছে। টানলাম কাপড়। খানিকটা ছিঁড়ল, কিন্তু আরও জড়িয়ে গেল। এবার বাধ্য হয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে গভীর মনঃসংযোগের সঙ্গে ছাড়াতে লাগলাম কাঁটা। একটি একটি ক'রে কাঁটা ছাড়ালাম। ছাড়িয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম—তখন সম্মুখের ভাঙনের ওপারে কেউ নেই। ঘন শরবন ও তালগাছের বেড়ার মধ্যে একটি মুমূর্ষু ব্যাঙের কাতর আর্তনাদ—

সেই মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণানিশার্থিনীর স্তব্ধতার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। ব্যাঙটা মরছে, সাপে ধরেছে। কালো কেউটে অথবা গোখুরা। জ্যাঠামশায়ের ওই বাগানটি চিরদিন ভীষণ সর্প-সঙ্কুল।

সে কোথায় গেল? কোথাও কেউ নাই। থম থম করছে অন্ধকার, ঝিমিঝিমি ঝরছে জল, আকাশের দিগন্তে মধ্যে মধ্যে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, বাতাস বইছে হা হা ক'রে; মরণ আর্তনাদ উঠছে ব্যাঙটার। ওপাশে ওই দূরে গ্রাম। এপাশে ওই পূবে দিগ-দিগন্তের নিশানা নাই। সর্বাঙ্গ ভিজে। বর্ষাতিটা ভারী হয়ে উঠেছে। পায়ের নিচের দিকটা জ্বলছে। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। জুতো বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। ভিজে-সপসপে হয়ে উঠেছে। দিগন্তজোড়া অন্ধকারের সেই জনহীন প্রান্তরে আমি দাঁড়িয়ে আছি একা। সে নেই।

আমার মন যখন একাগ্র হয়ে ওই কাঁটার বাঁধন ছাড়াতে নিবিষ্ট ছিল তখনই ভেঙে গিয়েছে আমার তন্ময়তা। তন্ময়তা ভেঙে গেছে যখন তখন সে কি আর থাকে? সে মিলিয়ে গেছে।

সেখানে আর্তনাদ করছে মৃত্যু-যন্ত্রণা-কাতর ব্যাঙটা।

মুহূর্তে আমি ফিরে এলাম জাগ্রত চেতনায়। সচেতন ধরণীতে। স্থান কাল আমার চেতনার সম্মুখে প্রকটিত হ'ল। আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম। এ আমি কোথায় এসেছি? এই ঘন অন্ধকার, বর্ষণমুখর রাত্রি। তারই মধ্যে ওই সকরুণ মরণ-যন্ত্রণা-কাতর শব্দের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত। মনে হ'ল পায়ের নিচে ওটা খাদ নয়, পৃথিবীর প্রান্তভূমি। আমি বোধ করি পড়ে যাবার ভয়েই চেপে ধরলাম সেই সেয়াকুলের কণ্টকতীক্ষ্ণ একটা পল্লবকে। ওই—ওই আমাকে মাটির পৃথিবীতে টেনে রেখেছে। আমার পায়ের নিচে পৃথিবীর সীমা-শেষের মহাশূন্যতার মতো ভাঙনটা। মহাভয়ে আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হ'ল, আমার দুই পাশে এসে দু'জনে দাঁড়িয়েছে—একজন জীবন, একজন মৃত্যু। আজ এতকাল পরে তাদের প্রত্যক্ষ স্পষ্টরূপ আমার মনে নেই, তবে মনশ্চক্ষে আজও দুটি

শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত অবয়ব ভেসে উঠছে। একজন, ঠিক আমার পায়ের তলার মাটির হাতখানেক পাশেই গভীর ভাঙনটার শূন্যলোকে দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের তলায় ভাঙনের নিচে ব্যাঙটার কাতর শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে; আর একজন, এপাশের যে কণ্টকগুল্মটায় আমার কাপড় জড়িয়ে গিয়েছিল, সেই কণ্টকগুল্মটার মাঝখান থেকে আবির্ভূত। জীবনে সে একটা বিস্ময়কর মুহূর্ত, অসার, অবসন্ন, কিম্বা চরমতম প্রশান্ত স্তব্ধ। চেতনা বিলুপ্ত হয়ে চলেছে অথবা চেতনাকে অতিক্রম করে চৈতন্যের দিকে চলেছি। সেদিন যদি ভাঙনের তলায় ব্যাঙটা না আর্তনাদ করত তবে সেই অসাড় কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রম করে আমার সচেতনতা দ্রুত ফিরে আসত কি না সন্দেহ। কয়েকটা মুহূর্ত পরেই চেতনা আমার ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল আশপাশ দূর-দূরান্তর থেকে অন্তরাত্মা বিদীর্ণ করে আমাকে ডাকছে কারা। ডেকেছিল বোধ হয় পৃথিবী বসুমতী। মহাকালের 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনি সেদিন আমি শুনেছিলাম। তার মধ্যে শুনেছিলাম আমার মায়ের কণ্ঠস্বর—স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, পুত্রের কণ্ঠস্বর। ক্রমশ ধ্বনি কোলাহল স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবং এতক্ষণে অনুভব করলাম কোলাহল উঠছে স্টেশনের ওদিকে, সে কোলাহল যাত্রীদলের। সেই সমগ্র ক্ষণটির পরিমাণ বোধ হয় কয়েক মিনিট মাত্র। আমি ফিরলাম, প্রায় লাফ দিয়ে ভাঙনের ধার থেকে সরে এলাম—হাতখানেক দূরে, এসে দাঁড়ালাম এক টুকরা সমতল পরিচ্ছন্ন জায়গায়। পিছনে একটা শব্দ হ'ল ঝপ্ করে মাটির খানিকটা চাঙড় খসে পড়ল সেই ভাঙনের ভিতর। আমার সন্দেহ রইল না—ভেঙে পড়েছে সেইখানটাই যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম এই কয়েক মিনিট। আমারই ওজনে ভিজে মাটি এতক্ষণ ধরে ফেটে আসছিল। আমি সরে না-এলে আরও দু-এক মুহূর্ত আগেই খসে পড়ত আমাকে নিয়ে।

৬

এবার শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে সচেতন দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে দেখলাম। দক্ষিণে মৃত্যুপুরীর প্রগাঢ় অন্ধকারপুঞ্জের মতো সেই বাগানটা, পূর্বে পশ্চিমেও অন্ধকার—সে অন্ধকার শূন্যলোকের মধ্যে স্বাভাবিক রূপ নিয়ে সম্প্রসারিত, উত্তরে আমাদের গ্রাম—সেখানে দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে আলোকবিন্দু—স্টেশনে, স্কুল-বাড়িতে, দু-একখানি বড় বাড়ীর মুক্ত বাতায়নের ওপারে ঘরের মধ্যে জ্বলছে আলো। ওখান থেকেই আসছে মানুষের সাড়া। বুকের ভিতরটা ঘন স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে, ভিতরে যেন প্রাণপুরুষ থরথর করে কাঁপছে, এতক্ষণ পর্যন্ত যার জন্যে সে লালায়িত হয়ে ছুটে এসেছে এতদূর—তার অঙ্গবায়ুর স্পর্শেই সে হয়ে পড়েছে অবসন্ন। কালিন্দীতটে নওলকিশোরের প্রথম স্পর্শ-বিধুরা রাধার মতো তার অবস্থা। নওল কিশোর তার হাতখানি বারেকের জন্য স্পর্শ করেই চকিতে গেলেন ঘথ বনান্তরালে মিলিয়ে। থরথর করে কাঁপতে লাগলেন চিরকিশোরী। মনে হ'ল একূলে ওকূলে দু'কূলে গোকুলে কেউ কোথাও নাই। এপার হয়েছে শেষ, ওপার হয়েছে শুরু, তারই সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনে মনে প্রশ্ন করলাম বার বার -কাকে দেখলাম। কি দেখলাম! চোখের ভ্রম? মনের ভ্রান্তি? এত স্পষ্ট? এত কাছে? যুক্তি বার বার বললে, তাই—হ্যাঁ—তাই, তাই! কিন্তু সেকথা কোনোমতেই মানতে চাইলে না মন। সে বললে তবে আমি মহাসত্যকে উপলব্ধির অনুভূতি পেলাম কি করে? আমার সর্বাঙ্গে প্রতি রোমকূপে যে তার স্পর্শের প্রতিক্রিয়া!

এই ঘটনার কথা শুনে আমাদের গুরুবংশের একজন বলেছিলেন, বাবা, তোমার জীবনে সেদিন একটি পরমলগ্ন এসেছিল। তোমার দীক্ষা হয়ে থাকলে তুমি সেদিন পরমবস্তু পেতে পারতে। আমাদের গুরুবংশ বীরভূমের কোতলঘোষা গ্রামের বিখ্যাত তান্ত্রিকের বংশ।

ইনি শেষ জীবনে ঘরে থেকেও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। মানুষটি ছিলেন বিচিত্র। আমার পিতৃদেব গ্রামপ্রান্তে জনহীন প্রান্তরে মন্দির তৈরি ক'রে তারাপূজার প্রবর্তন করেছিলেন। আশ্বিন মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন চতুর্দশীর মহানিশাতে তারা-পূজার বিধি। প্রথম পুরোহিত ছিলেন এঁদেরই বংশের একজন, তার পর এই সতীশ ভট্টাচায মহাশয়কে আমিই বরণ করেছিলাম পুরোহিতরূপে। প্রতি বৎসর শারদশুক্লা চতুর্দশীর সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই এই মানুষটি একটি হুকা হাতে—কাঁধে ঝোলা বলিয়ে—তারা তারা শব্দ করতে করতে এসে উপস্থিত হতেন, সঙ্গে থাকতেন একজন সঙ্গী এসে নিজের আসন বিছিয়ে বসতেন উচ্চকণ্ঠে কথা—উচ্চকণ্ঠে হাসি. সে কথায়, সে হাসিতে বসতিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর মুখর হয়ে উঠত। আশ্বিন মাস ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ মাথায় করে আসতেন। আমরা দু'একবার উৎকণ্ঠিত হয়েছি—তার আসবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—হঠাৎ এক সময় ঝড়বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁচেছে পরিচিত উচ্চকণ্ঠের ডাক—তারা—তারা।

হঠাৎ এক বৎসর তিনি এলেন একা, নীরবে নীরবে এসে আসন বিছিয়ে বসলেন, কুশল প্রশ্নের উত্তর মৃদুস্বরে সংক্ষেপে দিয়ে নীরব হয়ে বসে রইলেন বিস্মিত হয়েই আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তিনি একটু হেসে বললেন— সকল কারণ সকলকে বলা যায় না বাবা। নীরবে বসে তামাক টানতে লাগলেন

মধ্যরাত্রে শিবাধ্বনি হতেই আমাকে পূজারম্ভের উদ্যোগ করতে বললেন। ঘট এল। তিনি পূজার আসনে দাঁড়িয়ে আসন গ্রহণের পর মুহূর্তে বললেন, দেখ বাবা, আমার বাড়ী থেকে কোনো লোক এলে তাকে অপেক্ষা করতে বলবে। আমাকেও সে সংবাদ দেবে না। কারণ প্রশ্ন ক'রো না।

মনে সন্দেহ জাগল কিন্তু প্রশ্ন করতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, অল্পক্ষণের মধ্যে পূজার ব্যবস্থায় কাজে ভুলেও গেলাম একথা। লোক অবশ্য এলও না। ওদিকে পূজা শেষ হ'ল, বলিদান হয়ে

যাওয়ার পর পূর্ণাহুতি—তিলক ও শান্তিজল-সিঞ্চন-শেষে, মন্ত্রোচ্চারণ করে ঘট বিসর্জন দিয়ে তিনি আমাকে ডেকে বললেন—আগামীর থেকে তুমি পূজার পুরোহিতের ব্যবস্থা ক'রো তারাশঙ্কর। আমি এই শেষ পূজা করে গেলাম।

বিস্মিত হয়ে সসঙ্কোচেই প্রশ্ন করলাম—কেন একথা বলছেন? কোন অপরাধ হ'ল আমাদের?

তিনি প্রসন্ন হাস্য সহকারেই বললেন—না বাবা, অপরাধ নয়। তার জন্যে বলিনি। আজ বোধ হয়—মা আমার বলি গ্রহণ করলেন। এর পর আর তো পূজার বিধি বা প্রয়োজন নেই আমার। আমি চললাম।

তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। তিনি বরাবরই পূজান্তে বাকি রাত্রিটা ওই মন্দিরেই শুয়ে থাকতেন। এই রাত্রে চলে যাবেন—তাও হেঁটে, যাবেন প্রায় পাঁচ মাইল পথ। এর মধ্যে ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে মাইল দুয়েক অতিক্রম করতে হবে। আমার মুখ দেখেই আমার মনোভাব অনুমান করে তিনি বললেন—বাবা, আমার একমাত্র পুত্র একমাত্র সন্তান, তাকে শেষ শয্যায় দেখে এসেছি। বাড়ীতে বলে এসেছিলাম—যাই ঘটুক—লোক পাঠিয়ে যেন আমার পূজার ব্যাঘাত না করে। তবুও যদি পাঠায় সেই ভেবেই বলেছিলাম—লোক এলে আমাকেও সংবাদ দিয়ো না, তাকেও আটকে রেখো। তা তারা আমার কথা রেখেছে। লোক যেন পাঠায়নি। কিন্তু এইবার আমি যাব।

আমি বললাম—আপনি এই অবস্থায় এলেন কেন?

হেসেই তিনি বললেন—না এলে? পূজা? পূজা কে করতো তোমার? দ্বিপ্রহরের পর অকস্মাৎ তার অসুখ উঠল বেড়ে। অকস্মাৎ সমুদ্রে ঝড় ওঠার মতো। সে সময়ে লোক পাই কোথায়? তা ছাড়া —বুঝে নিলাম—এই পূজাতেই মা আমার বলি নেবেন। এ পূজা না করে বসে থাকলে পরমমঙ্গল থেকে বঞ্চিত হব! যাক, আমি চললাম।

—লোক? লোক দিই সঙ্গে?

—না।

চলে গেলেন তিনি।

বাড়ী পৌঁছুবার আগেই তাঁর সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল।

এই মানুষ একদিন আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

বলেছিলেন—তোমার জীবনে একটি পরমলগ্ন এসেছিল। তাম র দীক্ষা হয়ে থাকলে তুমি দিব্যবস্তু পেতে পারতে।

চ

আমি নিজে ওখন নব্য পথের পথিক। তন্ত্রে মন্ত্রে বিশ্বাস করি না। কিন্তু জীবনে বংশগত শিক্ষায় অতীতকে পুরাতনকে অসম্মান করতে কোনো কালেই পারি না বা পারতাম না। জানতাম বুঝতাম—অতীতই এখানে এনে পৌঁছে দিয়েছে। পিতৃপিতামহের পথই এসে আমার পথে নবকলেবর লাভ করেছে। নিজেকে সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানে—উচ্চকণ্ঠে তাই জাহির করতে গিয়ে পিতৃপিতামহকে মিথ্যাশ্রয়ী ঘোষণা করার ঔদ্ধত্য আমার কোনো কালেই হবে না, তাই সেদিন তাঁর কথা বিশ্বাস করতে না-পারলেও কোনো তর্ক তুলিনি কিন্তু তিনি আমাকে জানতেন। তিনি আমার মনোভাব অনুমান করেই বলেছিলেন—বাবা—এসব তুমি বিশ্বাস কর না তা আমি জানি কিন্তু বাবা—রামকৃষ্ণদেব যখন নিজের গলায় খড়্গাঘাত করতে গিয়েছিলেন তখন সাক্ষাৎ মা এসে দেখা দিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরেছিলেন এ ঘটনা তোমার কাছে, বস্তুবাদীর কাছে মিথ্যা হলেও তাঁর কাছে তো মিথ্যা নয়। সে ঘটনা তাঁর কাছে পরমসত্য যাকে তোমরা—বস্তুবাদীরা বলবে—ভ্রান্তি, ভ্রম—তাই থেকে তে তিনি পেলেন পরমসত্যের—পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ। তার ফলে—রামকৃষ্ণদেবের জীবনে যে পরম সমৃদ্ধি তা তো সকলেই দেখেছে। সকল ফুলের ফল চোখে দেখা যায় না, আবার সকল ফলের ফুলও দেখা যায় না। কিন্তু ফল ধরলে ফুলটা অস্বীকার কর কি করে?

জল খেয়ে কেউ যদি বলে অমৃত খেলাম তা শুনে তুমি হাসতে পার। কিন্তু অমরত্বের লক্ষণ যদি তার মধ্যে প্রকাশ পায় তখন কি বলবে!

আজ এতকাল পরে একথা মানতে কোনো সঙ্কোচ নেই। অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার করি। সেদিন মনের প্রস্তুতি—সে তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রদীক্ষার ফলেই হোক, আর জীবানুশীলনের অন্যপথে অন্যমতেই হোক, আরও অগ্রসর হয়ে থাকলে সেদিন অরূপের সাক্ষাৎ আমি পেতাম। রূপের ধরণীর মধ্য থেকে তন্ময়তার কল্যাণে অপরূপকে আমি দেখেছিলাম। কিন্তু অপরূপকে অরূপের সঙ্গে এক হয়ে যেতে দেখার মতো মনের যোগবল সেদিন আমার ছিল না।

বস্তুবাদী দেখে শুধু রূপকেই। রূপকে কেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে সেও একপথে অপরূপকে উপলব্ধির চেষ্টা করে। অরূপে সে আজও পৌঁছুতে পারেনি। কিন্তু অপরূপকে চোখে সে দেখে না—দেখতে পায় না। ভাবুক তা দেখে।

থাক ওকথা।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে-থাকতেই বিহ্বলতা কেটে গেল। বিভোর মন নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। কাকেও কিছু বললাম না।

ঠিক পরের দিন একজন সংবাদ নিয়ে এলো। যার আসবার কথা ছিল তিনি আসতে পারেননি। অন্যপথে বোলপুর হয়ে চলে গেছেন কলকাতায়।

তারপর কত দিন কত সন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছি ওইখানে। প্রতীক্ষা করেছি দীর্ঘক্ষণ। কিন্তু কাউকে দেখিনি। সে বিচিত্র সেই এক লগ্নে এসেছিল, হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, মাঝপথ থেকে আমার অযোগ্যতা অনুভব ক'রে—মৃত্যুভয়ে ভীত ক'রে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

তার কিছু ফল সে আমাকে দিয়ে গিয়েছে। সে ফল 'তন্ময়তা' যোগ। তার আস্বাদ আমি পেয়েছি। আমার সাহিত্যজীবনে সাধনকর্মে সে ই আমার সবচেয়ে বড় সম্বল।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

১

এই ঘটনার তিন বৎসর পর।

বিচিত্র প্রকাশ অহরহ, অফুরন্ত, সে নিজেকে প্রকাশ ক'রে চলেইছে, চলেইছে। সেই যে তা অনির্বচনীয় আনন্দলোক অথবা অনন্ত বেদনালোক যার সংস্পর্শে এলেই মানুষ মুহূর্তে অনুভব করে সে অপার প্রশান্ত প্রসন্নতার মধ্যে অথবা অনন্ত গভীর বিষণ্ণতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল অথবা যেন গ'লে গেল, মিশে গেল, একাকার হয়ে গেল, বিলুপ্তি ঘটে গেল আত্মসত্তার অথচ কোনো শোচনা নাই, কোনো ক্ষোভ নাই, কোনো বিলাপ নাই। ভয় নাই, বন্ধন নাই, আশা নাই, ভাষা নাই, গৃহ নাই, আছে শুধু মহানভ-অঙ্গনের মতো অনন্তের অঙ্গনতলে সঞ্চরণ। প্রশ্ন থাকে না, অশান্তি থাকে না, কিন্তু চৈতন্য থাকে, অনুভবের প্রকটতা থাকে না, সুগভীর অনুভূতির আস্বাদন থাকে।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে সংযোগ তো তার অহরহ ঘটে না, ঘটে কদাচিৎ ঘটে জীবনের এমনি একাগ্রতার মধ্যে, সর্বসত্তার গভীর আকুলতার মধ্যে, অনেক ক্ষেত্রে বহিঃপ্রকৃতির আনুকূল্যের মধ্যেও ঘটে। অনন্ত বিশাল সমুদ্রতটে অথবা ধ্যানগম্ভীর মৌন স্থির পার্বত্য প্রদেশে, প্রকৃতিপ্রভাবেই অন্তর হয়ে ওঠে ধ্যানমুখী। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো স্থানে—ক্ষণিক বিরতির সুযোগে ধ্যানমুখী মন মগ্ন হয়ে যায় ধ্যানে। ভিতরে বাহিরে যোগযোগ ঘটে, অনন্তের মহাঅঙ্গন জীবনকে ঘিরে এসে নামে বস্তুময় এই পৃথিবীর উপর। কিন্তু বস্তুময় পৃথিবীর যেখানে জীবন, যেখানে কোলাহলমুখরতা, জৈব-প্রকৃতির চেতনা যেখানে দ্বন্দ্বকাতর সেখানে এ যোগাযোগ ঘটে কদাচিৎ।

আত্মসচেতনাকে অতিক্রম করতে পারে না মানুষ এবং একে অতিক্রম করতে না পারলে ধ্যানযোগ আসে না।

আগের এই ঘটনাটির পর আমার জীবন এমনই ঘটনা-বহুলতার মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলে যে, আবার এ সুযোগ এল তিন বৎসর পর। শুধু তাই নয়, সেকালে এ ঘটনাটিকে দৃষ্টিবিভ্রম বলেই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম, অস্বীকার করতে চেয়েছিলাম এর প্রভাবকে ; মনে মনে নিজেই সেদিনের সেই আমিকে বার বার ব্যঙ্গ করে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। যারা হিমালয়ের নির্জনতায় এই মহাঅঙ্গনকে সন্ধান করতে যায়, সমুদ্রতটে ব'সে নিরবধি দিকচক্রবালে সমুদ্র ও আকাশের মিলনরেখায় অসীমের সন্ধান ক'রে তাদের অনন্তবিলাসী ব'লে রহস্য করি, এমনি তখন আমার মনের গতি।

আইন-অমান্য-আন্দোলন—সভা-সমিতি—গেপ্তার—কারাদণ্ড একের পর এক এসে গেল দ্রুততম গতিতে। জেলখানা ছিল একটি অনুকূল স্থান যেখানে এই ধ্যানযোগের সাধনা করা যেতে পারত। কিন্তু উনিশশো তিরিশ সাল একটি ঐতিহাসিক সাল—সে শুধ জাতীয় আন্দোলনেই একটি মোড় ফেরায়নি, আমাদের রাজনৈতিক কর্মীদের চিন্তাধারায়, বিশ্বাসের পথেও মোড় ফিরিয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তির কাছে যত আঘাত খাচ্ছি, ততই জোরে আমরা আঁকড়ে ধরছি ইউরোপের বস্তুবাদকে। মার্কসবাদের আলোচনায় আন্দোলনে জেলখানা তখন মুখর। মহাঅঙ্গন অভিমুখে ফুৎকার নিক্ষেপ করায় প্রবৃত্তি তখন ঘাড়ে চেপে বসেছে—ব্যর্থতার আক্রোশে। জেলখানাতেও এ চিন্তার অবকাশ ছিল না।

জেলখানায় কারাজীবনের শেষ দিকে এর উপর এল একটা বিতৃষ্ণা। বিতৃষ্ণা এল দলবাঁধার কদর্যতা দেখে। সেকথা এখানে থাক। মুক্তিকালে সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে এলাম, সকল দলের কাছ থেকে দূরে থেকে সাহিত্যের মাধ্যমে বলব আমার বলার কথা, বাইরে নয়—মানুষের মনের ভিতর খুঁজে নেব আমার কর্মক্ষেত্র। উনিশশো একত্রিশ গেল—বত্রিশ সালে অকস্মাৎ জীবনে এল একটা প্রচণ্ড

আঘাত। জীবনে হ'ল প্রথম সন্তান-বিয়োগ। আমার প্রিয়তমা কন্যা বুলা মারা গেল অকস্মাৎ। এই আঘাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অশান্তিতে বেদনায় জীবনটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অশান্ত চিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দেশময়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মেলা থেকে মেলায়; সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করলাম সাহিত্যের মধ্যে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব বাধল—বস্তুবাদ-বিশ্বাসে এবং প্রেততত্ত্ববাদে 'বঙ্গশ্রী' আপিসে স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রেততত্ত্ব আলোচনায় আমার মনের সুপ্ত কৌতূহল এবং বিশ্বাসকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তুললেন। অনেক কাল আগে, বোধ করি, তেইশ-চব্বিশ সালে আমি নিজে হাতে-কলমে প্রেততত্ত্ব আলোচনা করেছিলাম। দু-তিনবার প্রেত আহ্বানচক্রের অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং নেতৃত্ব করেছিলাম আমি। সে সময় প্রেততত্ত্বের বই পড়েছিলাম নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এবং পরীক্ষা করার জন্য অনুষ্ঠানের প্রথম চক্রেই বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম প্রেতাত্মার আবির্ভাবে আমাদের গ্রামের প্রতুল মুখোপাধ্যায় আশ্চর্য রকমের মিডিয়ম ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার আচ্ছন্ন অবস্থা আসত এবং মিডিয়মের মুখে পরিচিত প্রিয়জনের আত্মার যে সব মমতাকাতর উক্তি এবং বিস্ময়কর অজ্ঞাত গোপন সংবাদ শুনেছিলাম তাতে অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না। আমি কিন্তু ঠিক এক কারণেই এ চর্চা এইখানে স্থগিত রেখেছিলাম। ওতে আমি বিশ্বাস করতে চাই না। বিশ্বাস করব না। দীর্ঘকাল পর সন্তান-শোকের বেদনায় আবার ওই প্রেততত্ত্ববাদের মধ্যে খুঁজতে গেলাম সান্ত্বনা—যদি বুলার দুটো কথা শুনতে পাই, যদি সে কোনো কথা বলে।

কলকাতায় অনেক বৈঠকের সন্ধান করলাম, পেলাম না। সবগুলিই প্রায় উঠে গেছে। দু-এক ক্ষেত্রে মিডিয়মের অভাবের কথা শুনলাম। শুনে আমি প্রতুলকে সংগ্রহের চেষ্টা করলাম কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হতে হ'ল। সে-কালের চক্রে বসে মিডিয়ম হয়ে প্রতুলকে নিষ্ঠুর দৈহিক

যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। সে যেন একটা নিদারুণ প্রহার, তারই ফলে প্রতুলের হয়েছিল আতঙ্ক। এবং এই বর্তমান সময়ে প্রতুলের দেহও ছিল খুব অসুস্থ। পেটের মধ্যে একটা অপারেশন হয়েছিল বোধ হয়। আর তখন যেন অল্প অল্প হাঁপানিতেও কষ্ট পায় মাঝে মাঝে। সুতরাং প্রতুল রাজী হ'ল না।

অতৃপ্ত অশান্ত শোকার্ত চিত্তে আমি সান্ত্বনা খুঁজে ফিরতে লাগলাম শ্মশানে, বুলার খেলাঘরে, খেলার প্রিয় স্থানগুলিতে। লাভপুরেই তখন থাকি, মধ্যে মধ্যে কলকাতা আসি-যাই। লাভপুরে যখন থাকি তখন সন্ধ্যায় শ্মশানে গিয়ে বুলার চিতার পাশে ব'সে থাকি জনহীন অন্ধকার শ্মশানের প্রতিটি শব্দ আমাকে সচকিত ক'রে তোলে, মনে হয়, বুঝি বুলা দিল সাড়া, এইবার তাকে দেখতে পাব, দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে চারিদিক খুঁজি। কিন্তু কোথায় কি? কত দিন গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি সন্তর্পণে—বুলার খেলার সাইগুলির কাছে এসে বসি, নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকি, নিজের বুকের শ্বাসপ্রশ্বাস গণনা করি, রাত্রি শেষ হয়ে আসে, বুকের বোঝা দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে সেই বোঝা নিয়ে ফিরে বিছানায় এলিয়ে পড়ি। কত দিন কেঁদেছি

এমন অবস্থায় একদিন শ্মশান থেকে ফেরার পথে আমাদের গ্রামের দেবস্থল বা দেশের একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ- ফুল্লরা মায়ের আশ্রমে ঢোকবার মুখে এক গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি শুনে ফিরে দাড়ালাম। ফুল্লরা দেবীর আশ্রম গ্রামের প্রান্তে এক নির্জন প্রান্তরে- অরণ্যসমাবেশের মধ্যে মনোরম একটি স্থান আশ্রমের দক্ষিণ দিকে নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর আমি এই দক্ষিণ দিক থেকে আশ্রম প্রবেশের পথের ঠিক মুখেই ওই কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে দাড়ালাম। অন্ধকারে দেখলাম, দূরে দীর্ঘাকৃতি -প্রায় ছ ফুট লম্বা খাড়া সোজা একটি মানুষ, একটি জ্বলন্ত কাঠ হাতে চলে আসছেন এই আশ্রমের দিকে। বুঝলাম, সাগ্নিক কোনো সন্ন্যাসী। জীবনে সন্ন্যাসগ্রহণের সময় যে যজ্ঞাগ্নি প্রথম প্রজ্বলিত করেছেন, সেই অগ্নিকে আজীবন বহন ক'রে নিয়ে চলেছেন এবং মলমূত্র ত্যাগের সময় ছাড়া অন্য

কোনো সময়েই ওই অগ্নির সঙ্গে সংস্পর্শ ছিন্ন করেন না। স্থান থেকে স্থানান্তরে চলেন—এমনিভাবেই কাষ্ঠখণ্ডের মুখে অগ্নিকে গ্রহণ ক'রে বহন করে নিয়ে চলেন. যেখানে আসন গ্রহণ করেন সেখানে এই অগ্নিকে প্রথম স্থাপন করেন নূতন সমিধ। দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসী আমাকে দেখে দাঁড়ালেন। আগেই দেখেছিলাম তার দৈর্ঘ্য এবং ঋজু গঠন ভঙ্গি. এখন দেখলাম মাথার চুলগুলি একেবারে শুভ্র এবং ছোট ক'রে ছাঁটা, মুখে চাপদাড়ি, গোঁফ, সগুলও সাদা হয়ে গেছে আমাকে পেয়ে বললেন, এই কি ফুল্লরা দেবীর আশ্রম?

—হ্যাঁ বাবা। কোথা থেকে আসছেন?

—বহুৎ দূর থেকে বাবা

ব'লেই আমাকে পাশ কাটিয়ে [illegible] সঙ্কীর্ণ পথটি ধ'রে আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেলেন। আশ্রমের মধ্যে মন্দিরে তখন আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে আমি ওই প্রবেশ-পথের ধারেই বাঁধানো বেলগাছের তলায় বসে [illegible] এখন ওখানে অনেক লোক—অনেক ভক্ত। আরতি শেষ হ'লে ওখানে [illegible]

ভেতরে গেলাম যখন তখন আরতি শেষ হয়েছে [illegible] কজন প্রায় সকলেই চলে গেছেন [illegible] মন্দিরের [illegible] দেখলাম বিষণ্ণ হয়ে ঘুরছে. শুনলাম বলছেন [illegible] কি করব? কোথায় কি পাব?

আশ্রমের ব্যবস্থায় তখন [illegible] বিশৃঙ্খলা চলছিল [illegible] কোনো রক্ষক [illegible] ব্যবস্থাপক কেউ নেই বললেই চলে। মহান্ত নেই। পূজকেরা আসেন পূজা করেন. যা আসে তার দ্রব্য বেঁধে নিয়ে সন্ধ্যায় চলে যান. আশ্রম খাঁ খাঁ করে সাধুসন্ন্যাসীরা এসে আশ্রয় পান না। মন্দির ছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরদুয়ারগুলি অপরিচ্ছন্ন। আশ্রমের গোয়ালঘর ভেঙে যাওয়ায় কয়েকখানা ঘরে গরু ছাগল থাকে। বাকি কয়েকখানায় অবাধে বিচরণ করে এই ঘন অরণ্যের সরীসৃপেরা। মন্দিরের পিছন দিকে এই ঘরগুলির

উঠানে গিয়ে দেখলাম. একখানা পাথরের উপর পা রেখে সেই জ্বলন্ত কাঠখানি হাতে সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন—নরীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অধীরতা নেই এক বিন্দু. চেয়ে রয়েছেন রক্তিম আকাশের দিকে।

পূজক বললেন, কী বিপদ দেখুন তো! এই রাত্রিতে সন্ন্যাসী এসে হাজির। বললাম—এখানে নানান অব্যবস্থা, তার থেকে চলুন গ্রামের মধ্যে বাবুদের কোনো ঠাকুরবাড়ীতে থাকবেন। তা উনি যাবেন না। বলেন—এখানে ঠাই আমার চাই-ই। এইখানেই কয়েকদিন থাকব বলেই আমি এসেছি। নেহাত না পাই, আমার দুসরা ঠাঁইয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ওই চাতালটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওইখানে আমার ঠাঁই ক'রে দাও আর কিছু কাঠ এনে দাও। কি খাবেন জিজ্ঞাসা করলাম তো বললেন—দুধ। এখন আমি একা কি করি বলুন? সব লোক একে একে খ'সে পড়ল। মায়ের স্থানের মাহিন্দার বেটাও পালিয়েছে।

আমি আর-একবার তাকিয়ে দেখলাম সন্ন্যাসীর দিকে। মনে শ্রদ্ধা হ'ল বললে সবটা বলা হবে না। মানুষটিকে দেখে আমি যেন ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি যা খুঁজছি, এঁর কাছে হয়তো পাব।

পূজককে বললাম, চলুন, আমি সাহায্য করছি।

—আপনি?

হ্যা, আমি। চলুন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম ক'রে সন্ন্যাসীর সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে ফেললাম। চাতাল পরিষ্কার হ'ল, রাশীকৃত শুকনো গোবর, শুকনো পাতা, ছাগলের বিষ্ঠা পরিষ্কার করলাম। কাঠ সংগ্রহ ক'রে দিলাম। অন্য ব্যবস্থা যা কিছু যথাসাধ্য ক'রে দিলাম। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করলেন। আগুনের উপর কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন অগ্নি। এক খানি কাঠকে স্পর্শ ক'রে তিনি বসলেন।

এতক্ষণে সেই আগুনেব আলোয় সেই সন্ন্যাসীকে ভাল ক'রে

দেখলাম। পশ্চিম দেশীয় মানুষ। সে তার ভাষা থেকেই বুঝেছিলাম। বয়স আশী বা আশীর উর্ধে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য পেশী-সবল দেহ এবং চোখে আশ্চর্য দৃষ্টি। স্থির এবং কোন দূর দূরান্তরে নিবদ্ধ যেন সে-দৃষ্টি।

আমি ব'সে রইলাম কাছে। একটা পিপাসা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলেছে। অন্তর যেন আকুল হয়ে উঠেছে। এমনি মানুষই যেন আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সন্ন্যাসী আমার দিকে না-তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, ব'সে কেন বাবা? মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, আপনার আর কিছু প্রয়োজন আছে?

—না বাবা। আর কি প্রয়োজন থাকবে? কিছু প্রয়োজন নেই।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম দু'জনেই। তারপর অকস্মাৎ বলে ফেললাম, আমাকে আপনি দীক্ষা দেবেন বাবা? আমার অন্তর বড় ব্যাকুল হয়েছে।

সন্ন্যাসী আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না, যেমন চেয়েছিলেন সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে তেমনিই তাকিয়ে রইলেন, শুধু ঠোঁট দুটি নড়ল, আমি শুনলাম তিনি বললেন—সুধা রাখতে হলে স্বর্ণপাত্র চাই বাবা, মৃৎপাত্রে হয় না। হিরণ্ময়েন পাত্রেন—

মুহূর্তে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এ-কালের শিক্ষার মর্যাদাবোধ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো একটা দাহ ছড়িয়ে চকিতে খেলে গেল। মাথাটা খাড়া হয়ে উঠল। তবুও আমি তাকে কোনো উদ্ধত প্রত্যুত্তর দিলাম না। বাধা দিলে আমার কুলগত শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে উঠলে তাঁর অসম্মান করা হবে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম না। মিনিটখানেক অপেক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে উঠলাম, বললাম—নমো নারায়ণায় বাবা।

—নমো নারায়ণায়।

সন্ন্যাসী সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। চোখের মধ্যে অগ্নিচ্ছটার প্রতিচ্ছটা জ্বলছে।

আমি চলে এলাম।

কি হবে আমার সেই সুধায় যে সুধা স্বর্ণপাত্র ব্যতীত ক্ষয় হয়, দূষিত

হয়? যে অমৃত মৃৎপাত্রকে অক্ষয় এবং শুচি করতে না পারে, সে আবার অমৃত কিসে?

আর আমিই বা মৃৎপাত্র কিসে? কে?

রক্তমাংসের এই জরা-মরণশীল দেহের আধারে আমার আত্মা যে তপস্যার হোমাগ্নি জ্বেলেছে তার স্বরূপ তো আমি জানি। সে তো সম্পদ চায়নি, সে তো স্বার্থ চায়নি, সুখ চায়নি, সে হোমাগ্নি আমার জীবনকে দহন করছে, সুতরাং আমি মৃৎপাত্র কিসে? কেন?

প্রশ্ন করেছিলাম নিজেকেই। উদ্ধত হয়ে প্রশ্ন করিনি। যাচাই করেছিলাম।

ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এলাম।

এর পর সন্ন্যাসীটির কথা মন থেকে প্রায় মুছে গেল।

কঠোপনিষদে আছে নচিকেতা যমের কাছে উপস্থিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে।
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে,
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াজুহং।'

—মানুষের মৃত্যু হলে অস্তি ও নাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্যেই অস্তিত্ব থাকে বা থাকে না—এই নিয়ে সংশয় রয়েছে মানুষের মনে। এই তত্ত্ব সম্পর্কে, হে মৃত্যো, আপনার কাছে পরম সত্যকে আমি জানতে চাই।

মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসা সকল মানুষের মনের মধ্যেই আছে। কখনও অন্য বহু প্রশ্ন বা বাইরের কোলাহলের মধ্যে ঢাকা প'ড়ে থাকে, কখনও জেগে ওঠে নানা রূপ পরিগ্রহ ক'রে। কদাচিৎ এ প্রশ্ন জেগে ওঠে আকুল তৃষ্ণার মতো। আকুল তৃষ্ণা বলছি তাকেই, যে তৃষ্ণা জলের পরিবর্তে অন্য কোনো পানীয়ে নিবারিত হয় না।

যম নচিকেতাকে এ তত্ত্বের সত্যের পরিবর্তে দিতে চেয়েছিলেন যা কাম্য, যা দুর্লভ তাই। বিত্ত, সম্পদ, সুখদায়িনী অপ্সরা, আরও

অনেক কিছু। ইঙ্গিতে বলেছিলেন—এই বাদ্যযন্ত্রধারিণী রমণীয় অপ্সরাবৃন্দ নৃত্যগীতে তোমাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে রাখবে। এ প্রশ্ন তুমি ভুলে যাবে।

নচিকেতা বলেছিলেন—'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো।' আর বলেছিলেন—'শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ।'

মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে যখন প্রশ্ন জাগে, তখন মানুষের মন এমনি একাগ্র হয়েই ওঠে। সে ছুটে চলে পাগলের মতো ওই রহস্য জানবার পথে। ভুলে যায় অন্য সব কিছু। আমিও ভুলে গেলাম কয়েক দিনের মধ্যেই এই সন্ন্যাসীর কথা। না, ভুলে গেলাম ঠিক নয়। আমার অহংবোধ বিলুপ্ত হয়নি, তাই সন্ন্যাসীটির কথা ঠিক ভুলিনি। তবে সাবধানতা অবলম্বন করলাম, ওই দেবস্থানে যাওয়া বন্ধ করলাম। তাঁর কাছ থেকে অমৃতের প্রত্যাশীও আমি নই, বিষেরও নই। যা জানতে চাই—আপন সাধনায় সম্ভব হ'লে জানব, নইলে জানা হবে না।

দেবস্থানটিকে বাঁ দিকে রেখে নিয়মিত চলে যেতাম শ্মশানে। সেখানে ব'সে চিন্তা করতাম। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতাম। কোনো-কোনোদিন শ্মশান থেকে ফিরেও গ্রামপ্রান্তে আমাদের নিজেদের বাগানে ব'সে থাকতাম। এমনিভাবেই চলছিল দিন। দিন-দশেক পর একদিন ওই ফুল্লরা দেবীর আশ্রমের প্রয়োজনেই ওখানে যেতে হ'ল। তখন আশ্রমের বিশৃঙ্খলার জন্য গ্রামের লোকেরা মিলে একটি পরিচালক-সমিতির মতো সমিতি গড়েছিলেন, সেই সমিতির মধ্যে আমিও ছিলাম। শ্মশানে সেদিন আর যাওয়া হ'ল না। স্থির করলাম, সমিতির কাজের শেষে ওখান থেকেই যাব সেখানে।

ফুল্লরা দেবীর আশ্রমে গিয়ে সেদিন বিস্ময় বোধ না ক'রে পারলাম না। দেখলাম বহুলোকের সমাবেশ। প্রবেশ-পথেই দেখলাম গ্রাম-গ্রামান্তরের পাঁচ-সাতজন লোক আশ্রমে প্রবেশ করছেন।

অথচ দীর্ঘদিন ধ'রে আশ্রমের বিশৃঙ্খলা হেতু এখানে লোকজন বড় আসে না। দু'একটা কথা কানে এল—সন্ন্যাসী সাধু। ভিতরে ঢুকে দেখলাম, আশ্রমে সাধুদের জন্য নির্দিষ্ট সেই ঘরটির চাতাল বারান্দা লোকে ভ'রে গেছে। মাঝখানে ব'সে আছেন সেদিনের সাধু। দিনের আলোতে তাঁকে দেখলাম। হ্যাঁ, বয়স কখনই আশীর কম নয়। কালের অলঙ্ঘনীয় আদেশে দেহে জরা এসেছে, কিন্তু সে জরা সম্ভ্রমভরে বিনম্র। মাথার চুল ও মুখের দাড়ি-গোঁফের শুভ্রতায়, দেহ-চর্মের ঈষৎ শিথিলতায়, পাংশু বিবর্ণতায় বরং যেন প্রসন্নতাই এনে দিয়েছে ব্যক্তিটির সর্বাঙ্গে। দৃষ্টি তাঁর ওই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডেই নিবদ্ধ। সমবেত জনতার মধ্য থেকে প্রশ্ন হচ্ছে, কোনোটার উত্তর দিচ্ছেন, কোনোটার দিচ্ছেন না। আমি একটা নমস্কার জানিয়েই সেখান থেকে স'রে গিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের সম্মুখে। হঠাৎ আমার কাছে ছুটে এল একজন, বললে, আপনাকে ডাকছেন গো সাধুবাবা।

—হ্যাঁ, আপনাকে। ক'দিনই বলছেন। বলছেন—প্রথম দিনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কই, সে তো আর এল না? পুরোহিত বললে—সে আপনি। আজ আপনি চলে এলেন, আমি বললাম, বাবা, আপনি খোঁজ করছিলেন সেই তারাশঙ্করবাবু এসেছেন আজ। বললেন—ডাক।

মনটা কেমন যেন ভ্রূকুটি ক'রে উঠল। আমার অহংবোধ জেগে উঠল। বললাম, যাও তুমি, পরে যাব আমি।

সে চলে গেল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে বললে, না, আপনি আসুন। বললেন—এখুনি আসতে বল।

এখুনি আসতে বল? আচ্ছা, চল। উঠলাম, এসে দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে আবার নমস্কার জানিয়ে বললাম, আমায় ডেকেছেন বাবা? সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর যেন কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসার সুরেই বললেন, তুমিই সেদিন আমার কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলে?

নিজেকে সংযত করলাম, তাঁর মর্যাদা রেখে সম্ভ্রমের সঙ্গেই বললাম—হ্যাঁ। সে-কথা আপনার মনে আছে ?

—মনে আছে।

মিনিট-খানেক স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। তারপর ধীর সংযত কণ্ঠে বললাম —আর তো প্রয়োজন বোধ করিনি।

—প্রয়োজন বোধ করনি ?

—না। আপনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন—সুধা রাখতে হলে স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন হয়, মৃৎপাত্রে হয় না বাবা। স্পষ্টতই আমাকে আপনার মৃৎপাত্র মনে হয়েছে। সুতরাং সুধা আমি পাব না। সে-ক্ষেত্রে আমি এসে কি করব বাবা ? তা ছাড়া—

চকিত হয়ে উঠল সমবেত জন-সমাবেশ।

বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। দৃষ্টি তাঁর মর্মভেদী হয়ে উঠল।

আমি বললাম, কিছু মনে করবেন না বাবা। আমি একটি গল্প মনে ক'রে সাবধান হয়েছি। সেই জন্যই আসিনি।

—সে কি গল্প ?

—একটি নদীতে একটি মৃৎপাত্র আর একটি স্বর্ণপাত্র ভেসে যাচ্ছিল। স্বর্ণপাত্র মৃৎপাত্রকে ডেকে বলেছিল—'ওহে মৃৎপাত্র, এস একসঙ্গে পাশাপাশি ভেসে যাই।' মৃৎপাত্র বলেছিল—'হে স্বর্ণপাত্র, আমাকে মার্জনা কর, কারণ উভয়ে আকারে এক হলেও উপাদানে পৃথক; একসঙ্গে ভেসে যাওয়ার পথে তোমার সঙ্গে যদি কোনোক্রমে আমার সংঘর্ষ হয় তা'হলে আমার ধ্বংস অনিবার্য।' সেই আশঙ্কাতেই দূরে স'রে গিয়েছি বাবা। আর, যে সুধা পাত্রের উপাদানের তারতম্যে অশুচি হয়, গুণভ্রষ্ট হয়, সে হয়তো উৎকৃষ্ট রসায়ন হতে পারে, কিন্তু সে সুধা সত্যকারের সুধা অর্থাৎ অমৃত—যাতে মৃত্যুকে জয় করা যায়, তার রহস্য ভেদ করা যায়, সে বস্তু নয়। তার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমার না-আসার কারণ তাও বটে।

আমার কথায় সমবেত লোকগুলি স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই সন্ন্যাসীকে দেখে যে মানুষেরা ভয়ে ভক্তিতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আসে, বসে,

দেখে, তাঁর কথা শোনে, তাদের স্তম্ভিত হওয়ারই কথা। এই মানুষটি কি পারেন, কি জানেন তার হিসেব খতিয়ে না দেখেও তাঁর একটি সম্পদের কথা প্রত্যক্ষ। এই মানুষটি জরাকে শাসন করতে জানেন, আয়ুকে পরমায়ু করতে জানেন, মৃত্যুকে দূরবর্তী করতে জানেন। এই কয়েকটি সম্পদই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই মানুষের সঙ্গে এমনভাবে প্রত্যুত্তর করে এই ছন্নমতি ব্যক্তিটি কোন সাহসে ? আমি তখন সমাজে সংসারে ছন্নমতি ব'লেই সর্বজনবিদিত। সংসারে অনাসক্ত, বিষয় ব্যাপারে সম্পর্কহীন, রাজসরকারের প্রসাদ আমি মাটিতে নিক্ষেপ করেছি ; সুতরাং আমি ছন্নমতি ছাড়া আর কি! তারা আমার মুখের দিকে একবার তাকালে, তার পরই সে-দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ হ'ল সন্ন্যাসীর মুখের উপর। এইবার নিশ্চয় হবে অগ্ন্যুদ্গার।

কিন্তু সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়েই রইলেন, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার মুখের উপরেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর উত্তর শুনবার জন্য। সন্ন্যাসী কোনো উত্তরই দিলেম না, আমার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাঁর সম্মুখের অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিবদ্ধ করলেন। আমি এইবার পা বাড়িয়ে বললাম, নমো নারায়ণায়! সন্ন্যাসী দৃষ্টি না ফিরিয়েই হাতখানি ঈষৎ উত্তোলিত ক'রে প্রত্যভিবাদন জানালেন, নমো নারায়ণায়। সন্ন্যাসীর প্রণাম গ্রহণে অধিকার নেই, সন্ন্যাসী কোনো ব্যক্তিকেও প্রণাম করেন না। সেই কারণে প্রণাম জানাতে হয় তাঁর অন্তরস্থ নারায়ণকে, প্রত্যভিবাদনে তিনিও নতি জানান অভিবাদনকারীর অন্তরস্থ নারায়ণকে। অহং-এর স্থান এখানে নেই।

আমি চলে গেলাম। গিয়ে বসলাম শ্মশানের ধারে। বিশ্লেষণ করলাম, বার বার বিশ্লেষণ ক'রে দেখলাম, আমার এই বাক্যালাপের ন্যায় অন্যায়। কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির কথা স্মরণ ক'রে বিচার করলাম, না, অন্যায় কথা আমি বলিনি। রূঢ়তা আমার ছিল না। মৃৎপাত্র ও স্বর্ণপাত্রের উল্লেখের মধ্যে যে শ্লেষটুকু আছে সেটুকু

স্বাভাবিক অধিকারেই এসেছে. তিনিই আমাকে মৃৎপাত্র বলেছেন সর্বাগ্রে।

এই ঘটনার পর প্রায় মাস-পাঁচেক চলে গেল।

সন্ন্যাসী আর কয়েক দিন এখানে থেকে চলে গেলেন, আবার এলেন, আবার গেলেন, আবার এলেন। ধীরে ধীরে তাঁর একটি ভক্তমণ্ডলী গ'ড়ে উঠল। সে ভক্তদলের মধ্যে নারী পুরুষ সবই ছিল। এ সংসারে যাদের জীবনে বঞ্চনা যত বেশি, সে-বঞ্চনার প্রতিকারে যারা যত অসহায়, তারাই তত আকুলতার সঙ্গে খুঁজে বেড়ায় মহৎ এবং শক্তিশালী আশ্রয়। এ-দেশের লোক সেদিনও বিশ্বাস করত, যোগ-বিভূতিসম্পন্ন সন্ন্যাসীই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী, ঐ বিভূতিই শ্রেষ্ঠ মহত্ব। আজও অল্পবিস্তর আছে সে বিশ্বাস। রাজনৈতিক নেতারা অনেক পরিমাণে এই সন্ন্যাসীদের স্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের পরিচালনায় মূঢ়ের মত মিছিলে সভায় এ-দেশের মানুষ ভিড় করে বটে—তবুও তারাই ওই মিছিল থেকে ফেরার পথে সন্ন্যাসীর আস্তানা দেখলে সেখানে বসে পড়ে। মনোবেদনা জানায়।

এই কারণেই স্বাভাবিকভাবেই জীবনে বঞ্চিতা দুঃখিনী মেয়েরা তাঁর কাছে যেতেন, বিধবারা যেতেন। তাঁদের সঙ্গে যেতেন একটি মেয়ে, তাঁর নাম ছিল গোপালদাসী, ডাকনাম ছিল গুপ্‌লি। গুপ্‌লি ছিল আমারই সমবয়সী, হয়তো দু-এক বছরের বড়। কুলীনের ঘরের স্বামী-ঘর-বঞ্চিতা মেয়ে। প্রথম জীবনে বিবাহের পরই কয়েক বৎসর স্বামী আসতেন যেতেন; দুটি সন্তান হয়েছিল, প্রথমটি চার বছর বয়সে ফটন্ত দুধের কড়াইয়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পুড়ে মারা যায়, অবশিষ্ট একটি সন্তান। বর্তমানে স্বামী আর আসেন না, চিঠিপত্রেও সংবাদ নেই, পিত্রালয়ে বাপ-মাও গত হয়েছেন তখন, ত্রিসংসারে ওই সন্তানটি ছাড়া আপনার জন কেউ নাই। সে

সন্তানটিও নাবালক, বছর পনরো বয়স। পৈতৃক সম্পত্তি যৎসামান্য, তাতে নিতান্ত দুঃখে-কষ্টেই সংসার চলে। এই মেয়েটিও এই ভক্তমণ্ডলীর দলে ছিল। নিয়মিত যেত, আসত।

সন্ন্যাসী যখন সন্ন্যাস নেয়, তখন তাকে সব ত্যাগ করতে হয়। পরলোক, ভূলোক, ভূবর্লোক পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়। ইহলোকের মায়া-মমতা তো বটেই। কিন্তু মানুষ চিরকালই মানুষ, সন্ন্যাসীও মানুষ—মানুষের সংস্পর্শে এসে নিরাসক্ত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও কোনো দুর্বল মুহূর্তে কার মায়ার বন্ধনে যে ধরা দিয়ে বসে, সেকথা সে নিজেই বুঝতে পারে না। যখন জানতে পারে তখন সে বাঁধা পড়ে গেছে। তখন আর স'রে যাবার সময় থাকে না। এই অশীতিপর বৃদ্ধও এই আসা-যাওয়ার মধ্যে কখন বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন এই দুঃখিনী মেয়েটির মমতায়।

বড় মধুর প্রকৃতির মেয়ে ছিল গোপালদাসী, দেখতেও ছিল শ্রীমতী মেয়ে। হয়তো বা একটু কম ক'রে বলা হ'ল, গোপালদাসীকে সুন্দরী বলা চলত। এবং এমন হাস্যমুখী মেয়ে আমার জীবনে দু-চারটির বেশি আমি দেখিনি। তার হাসি ছিল জলের তরঙ্গের মত। মেয়েটি নিতাই প্রত্যূষে যেত ফুল্লরা দেবীর মন্দিরে; আরও মহিলারা যেতেন, দেবীকে প্রণাম ক'রে সন্ন্যাসীর আসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকত কিছুক্ষণ, তারপর একটি প্রণাম জানিয়ে চলে আসত। সন্ন্যাসী সেই প্রত্যূষেই প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নান পর্যন্ত শেষ ক'রে হোম শেষ করতেন; চোখ ফিরিয়ে কারুর দিকে তাকাতেন না। কিছুদিন পর মেয়েরা এই সন্ন্যাসীর কথা শোনবার জন্য দ্বিপ্রহরের শেষভাগে যেতে আরম্ভ করলেন। স্বল্পবাক্ সন্ন্যাসী বারণ করতেন না এবং যেতেও বলতেন না। তবু মেয়েরা যেতেন। এরই মধ্যে একদা প্রত্যূষে মেয়েরা দেখলেন, সন্ন্যাসী অসুস্থ। আসনে শুয়ে আছেন, উঠতে পারেননি। পরের দিনও তাই। পুরোহিত বিব্রত হয়েছেন। তিনি বললেন—দু'দিন ধ'রে কোনো আহার্য গ্রহণ করেননি, জল ছাড়া। তা ছাড়া—

তা ছাড়া দ্বিতীয় দিন রাত্রে অসুস্থতা হেতু উঠে দূরে যেতে পারেননি, নিজের আসনের কিছু দূরেই মলমূত্র ত্যাগ করেছেন।
পুরোহিত বললেন—দেখছেন না, আজ আর আসনে শুয়ে নেই। স'রে দূরে শুয়েছেন। এখন এই সবই বা মুক্ত করে কে— তাই হয়েছে সমস্যা। মেথর ডাকতে হবে।
গোপালদাসী নিজের হাতের ঘটিটি রেখে উঠে গেল দাওয়ার উপর। নীরবে সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার করলে। পরিষ্কার করবার সময়েই দেখলে—একটি পাত্রে পরিপূর্ণ পাত্র সাগু রয়েছে, সে সাগু সন্ন্যাসী স্পর্শ করেননি। বর্ণে গন্ধে সে এক অখাদ্য পানীয়। কালো দুর্গন্ধযুক্ত। গোপালদাসী সে পানীয় ফেলে পাত্রটি পরিষ্কার ক'রে এনে রেখে দিলে। তারপর ওই দেবীর স্থানেই স্নান ক'রে ফিরে এল। বাড়িতে সযত্নে পরিপাটি করে সাগু এবং বার্লি দুই-ই তৈরি ক'রে দুটি বিভিন্ন পাত্রে নিয়ে আবার এল দেবস্থলে। বললে—বাবা, কিছু খান। আমি খুব যত্নের সঙ্গে তৈরি ক'রে এনেছি। সাগু, বার্লি দুই-ই এনেছি। বলুন, কি খাবেন ?
সে আঁচলের খুঁট খুলে বের করলে একটি পাতিলেবু, দেবস্থলের ভাণ্ডারঘরে গিয়ে কেটে আনলে। রেখে দিল সন্ন্যাসীর সম্মুখে।
সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ ক'রেই বললেন, রেখে যাও। পরে খাব।
অপরাহ্ণে আবার গোপালদাসী গেল। দেখলে, বার্লির পাত্রটি শূন্য। পরের দিনও সেই সেবা করলে গোপালদাসী।
তার পরের দিন সন্ন্যাসী উঠে বসলেন, সুস্থ হয়েছেন অনেকটা। বললেন, নমো নারায়ণায়। তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণী।
গোপালদাসী হেসে ফেললে। অর্থ সে বুঝতে পারেনি।
সন্ন্যাসী বুঝলেন, তিনি ঈষৎ হেসে বললেন—নারায়ণ মাতৃরূপে আতুর আর্তের সেবা করেন। পূর্ণ মমতা হলেন তিনিই। তোমার মমতা অনেক মা।
গোপালদাসীর চোখে জল এল।
এর পর সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

সকরিগলিতে (ভাগলপুরের কাছে) সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। সেখানে গেলেন। তারপর আবার এলেন। এবার গোপালদাসী তাঁর কাছে এসে হাজির হ'ল দুধ এবং ফল নিয়ে। সন্ন্যাসী বললেন—মা নারায়ণী, আর তো আমার প্রয়োজন নেই।

গোপালদাসী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরল।

সন্ন্যাসী ডাললেন, শোন মা।

গোপালদাসী ফিরল।

সন্ন্যাসী বললেন, রেখে যাও মা।

গোপালদাসী স্মিত-হাস্যে বিকশিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। সযত্নে সেগুলি ঢাকা দিয়ে রেখে বসল কাছে।

এইভাবেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে গোপালদাসীর একটি সুমধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। গোপালদাসীকে সামনে রেখে গ্রামের অনেকগুলি বঞ্চিত দুঃখিনী তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সন্ন্যাসী কয়েকবারই বললেন—আমার কিছু নেই মা দেবার। কেন এসে তোমরা সময় নষ্ট কর?

মেয়েরা উত্তর দিতে পারলে না। কিন্তু আসাও বন্ধ করলে না। তারা কিছু পেত। নিশ্চয় পেত। দ্বিপ্রহরের মধ্যভাগ উত্তীর্ণ হতে-না-হতে গ্রামের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্থানে তারা এক এক ক'রে সমবেত হ'ত। গোপালদাসী আসল, হাতে তার দুধের পাত্র এবং কিছু ফল। অন্য যাঁরা ফল আনতেন, তাঁরা সে-ফল দিতেন গোপালদাসীরই হাতে। নিবেদন করবে সে-ই। দ্বিপ্রহরের গ্রাম্যপথ কলহাস্যে মুখরিত ক'রে তাঁরা দেবস্থল অভিমুখে যাত্রা করতেন।

কোনোদিন এ-বাড়ির কোনোদিন ও-বাড়ির জানালা খুলে যেত। বিজ্ঞ বিচক্ষণ জনেরা দেখতেন এই মিছিল। তাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। প্রশ্ন উঠল।

কোথায় যায় এরা?

কেন যায়?

কেন এত হাসি ?
যায় সন্ন্যাসীর কাছে।
দৃষ্টি বিচিত্র কুটিলতায় সংশয়-সঙ্কুল হয়ে উঠল।

২

এই জল্পনার কথা সন্ন্যাসীর কানেও অবশ্যই উঠেছিল। তিনি হেসেছিলেন কি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন জানি না। তবে তিনি বিচলিত হ'ন নাই, বিচলিত হবার মানুষ তিনি ছিলেন না। নির্ভয়ে সত্য-ভাষণ ছিল তাঁর আদর্শ, নির্ভয়ে সত্যের পথে চলতেই তিনি সমস্ত জীবন চেষ্টা করেছেন, এটা আমি নির্ভুলভাবেই জেনেছি।
এই প্রসঙ্গে অনেক দিন পরের একটি ঘটনার কথা বলছি। সে-সময় তিনি আমাদের গ্রামের সর্বপ্রধান ধনীর দেবালয়ে অতিথি হিসাবে অবস্থান করেছেন। তখন আমি তাঁর গুণমুগ্ধ। আমার সকল ক্ষোভ অভিমান কেটে গিয়েছে। আমি সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে যাই, বসি, আলাপ-আলোচনা করি। ওদিকে ধনীর নাট-মন্দিরে রামায়ণ গান চলছিল তখন। গ্রামের লোকেরা আসে, শোনে। সন্ন্যাসী নাটমন্দির থেকে একটু স'রে একখানি ঘরে আসন পেতেছিলেন। দু'চারজন লোক আসর থেকে উঠে আসে মধ্যে মধ্যে। চলে যায়। একদিন আমাদের আলোচনা চলছিল, কি নিয়ে আলোচনা চলছিল, আজ তা ঠিক মনে নেই। এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন ওই বাড়ীর প্রধান। এই প্রধান ব্যক্তিটি তখন ও-অঞ্চলে আধিপত্য-দর্পের প্রতিষ্ঠায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ বলে বিদিত। অপ্রিয় সত্যভাষণের আদর্শনিষ্ঠায় কণ্ঠস্বর রূঢ়, দৃষ্টি উগ্র, হাসি তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গের বক্রতায় অর্ধচন্দ্রবাণের ভঙ্গিতে বক্র। লোকে বলত দেবতাকেও তিনি খাতির ক'রে কথা বলেন না তিনি এসে আমাদের কাছেই আসন গ্রহণ করলেন এবং শুনতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করলেন—

মধ্যে মধ্যে দুটি চারটি কথা বলতে শুরু করলেন। সে কথাগুলি যেমন অসার তেমনি অবান্তর, অথচ কণ্ঠস্বরে ও ভঙ্গিমায় ঠিক উদ্ধত না হলেও কর্তৃত্বব্যঞ্জক। ক্রমশ আবহাওয়া খারাপ হয়ে উঠছিল। তিনি আমার গুরুজন, প্রতিবাদ আমার পক্ষে শোভনও ছিল না, মঙ্গলজনকও ছিল না। ভাবছিলাম উঠে যাই। এমন সময় বিচিত্র সংঘটন হ'ল। ধনীটি কি যেন অকাট্যরূপে প্রমাণিত করবার জন্য গীতার শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

জদা জদা হি ধর্মস্য ইত্যাদি।

তাঁর আবৃত্তি শেষ হতেই সন্ন্যাসী স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে বললেন, জদা নয় বাবা, ওটা যদা; যদার প্রথম অক্ষরটা বর্গীয়-জ নয়, ওটা অন্ত্যস্থ-য। দেবভাষা উচ্চারণ করতে হ'লে জিহ্বাকে সংস্কৃত করতে হয়। অন্তত আমার মত লোক যারা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা মনে করি—তাদের কাছে হয়।

আশ্চর্য ধীরতা এবং স্বাভাবিকতার সঙ্গে কথাগুলি বললেন, যাতে আমাদের একবিন্দু হাস্যোদ্রেক হ'ল না। ধনীটিও ক্রুদ্ধ হবার সুযোগ পেলেন না। শুধু বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলেন, 'জদা-জদা হি' নয়?

আমি এবার তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম জ ও য-এর প্রভেদ। কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ধনী ব্যক্তিটি। সন্ন্যাসী যেমন আমার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তেমনি স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা ক'রে চললেন। রূঢ় কিছু, অপ্রিয় কিছু সংঘটনের কোনো প্রকাশই আলোচনার স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলে না। কয়েক মিনিট পরে ধনী ব্যক্তিটি উঠে চলে গেলেন। এতেও সন্ন্যাসী ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে আমার 'দুই পুরুষ' নাটকের মধ্যে।

এমনি মানুষ সে সন্ন্যাসী। জীবনে সাধনায় এমনি ব্যক্তিত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন এবং সে ব্যক্তিত্ব এমন সুদৃঢ় সত্যবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তাঁকে বিচলিত করা, চঞ্চল করা সহজ ছিল না।

তিনি বিচলিত হননি। এ মানুষের তুলনা গিরিচূড়ার সঙ্গে। বাইরের ঝড় ঝঞ্ঝা তাকে নড়াতে পারে না, কাঁপাতে পারে না ; স্থির অবিচলিত গিরিচূড়া মগ্ন থাকে আপন তপস্যায়। সে নড়ে, সে কাঁপে, সে ভাঙে যখন গিরিগর্ভের তাপ পরিণত হয় বহ্নিতে ; যখন তার নিজের বুকের ভিতরে আগুন লাগে তখন। তার আগে নয়। সে-তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে বহ্নিতে পরিণত করে অন্তরের দুর্বলতা, মনের অপরাধবোধ।

এদিকে বাইরে গ্রামের মধ্যে মানুষের রসনার মুখরতা কুটিলতর এবং প্রবলতর হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের স্বভাবই এই। প্রতিবাদ না হলে চীৎকার তারা বাড়িয়েই চলে, বাড়িয়েই চলে। তারা শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করে। এ-কথা যারা তাদের শোনায়, তারা সমাজের এক বিচিত্র শ্রেণীর মানুষ। ধনসম্পদ অথবা বড় চাকরির অধিকারে সমাজে গণ্যমান্য সেজে বেড়ান, অন্তরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, তারই ছায়ায় তাদের দৃষ্টি বিকৃত। মুনিয়াকে সেই বিকৃত দৃষ্টিতে দেখে ব্যাখ্যা করে ফতোয়া জারি করে তারা।

ক্রমে গোপালদাসীও একটু বিব্রত বোধ করতে আরম্ভ করলে।

এ ঘটনার কথা তার কানে উঠতে খুব দেরি হয়নি। শুনেছিল সে অনেকদিন আগেই, কিন্তু গ্রাহ্য করেনি। অন্তরের তৃষ্ণা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল, এই ঘটনা শুনে থামবার বা থমকে দাঁড়াবার মত শক্তিই তার ছিল না। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটির কাছে সে অন্তর-তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির শান্তিসুধার অভ্যাস পেয়েছে। অসহায় জীবনে এক পরম সহায়ের অভয়ের ইঙ্গিত পেয়েছে। গোপালদাসীর সঙ্গে আর যে-সব মহিলারা সন্ন্যাসীর কাছে যেতেন, তাঁদের অধিকাংশই নিবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু দু-একজন নিবৃত্ত হননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন গ্রামের ওই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীটির পরমাত্মীয়া কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ। এই মহিলাটির মনেও আছে এক পরম তৃষ্ণা। ধন-সম্পদের অভাব কোনোদিন ছিল না, আজও নাই, সাজানো সংসার তখন, গৌরবান্বিত স্বামীর গৌরব, গুণগৌরব, কর্মগৌরব,

বহু-প্রশংসিত সন্তানগৌরব, সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী-গৃহিণী হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠাগৌরব কিছুরই অভাব তাঁর কোনোদিন ছিল না। তবু তিনি কোনো এক অজানার সন্ধানে কোনো ব্যাকুল তৃষ্ণায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন; একবার নয়, বার বার। প্রথম বেরিয়েছিলেন স্বামীকে সঙ্গী ক'রে। ক্রমে স্বামী ক্লান্ত হলেন: তারপর সঙ্গী করলেন সন্তানকে। সন্তানও ক্লান্ত হ'ল বা অসম্মত হ'ল —তাকে তখন টেনেছে তার কর্মজীবন, তখন তিনি একাই ঘুরেছেন। বদরীনাথ, অমরনাথ, মানস সরোবর, দ্বারকা, কামাখ্যা, কন্যা-কুমারী —আজও তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিব্রত বোধ ক'রে গোপালদাসী এঁরই সঙ্গে পরামর্শ করে একদা সন্ন্যাসীর কাছে সসংকোচেই সব নিবেদন করলে।

সন্ন্যাসী বললেন—মা, যে প্রদীপশিখা আলো দেয় সেই শিখার মাথায় কালি ওঠে। করবে কি মা? দৃষ্টিরও ধর্ম তাই। সত্যকে আবিষ্কার করতেই তার সৃষ্টি, কিন্তু মিথ্যাকে দেখবার জন্যই তার ব্যাকুলতা।

গোপালদাসী প্রশ্ন করলে, আমরা কি করব?

—যা তোমাদের ইচ্ছা। ভয় হলে এস না। ভয় না-পাও, এস।

গোপালদাসী বললে—আমাদের জন্যে ভয় তো পাইনে বাবা। ভয় পাই—। কথাটা তার মুখ থেকে বের হ'ল না।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, বাবা। এ আশ্রমের সেবায়েত হ'ল জমিদার। এ গাঁয়ে সবাই জমিদার। বিশেষ ক'রে যারা এই সব বেশী রটাচ্ছে, তারাও জমিদার। তা ছাড়া গ্রাম থেকে মাঠের পথ ভেঙে এতটা আমরা আসি। পথে লোকে টিটকারি দেয়, হাসে। আবার বলে, আপনাকে অপমান করবে।

—আমার জন্যে ভেবো না মা।

—না, বাবা। আমার মন মানছে না।

তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

দুরন্ত প্রলয়-বর্ষণে পাথর গলে না। কিন্তু চোখের জল বড় বিচিত্র বস্তু; পাথরের মত মানুষ দু'ফোঁটা চোখের জলে গলে যায়। জহ্নুমুনি নিঃশেষে পান করেছিলেন ভাগীরথীর ধারাকে। কিন্তু ভগীরথের দু'ফোঁটা চোখের জল তাঁকে এমন বিচলিত করেছিল যে, নিঃশোষিত ভাগীরথীর ধারা দ্বিগুণিত প্রবাহে জহ্নুমুনির বিদীর্ণ জঙ্ঘাপথে বেরিয়ে এসেছিল।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বললেন—আমাকে কি করতে হবে বল? এখান থেকে চলে যাব?

—না। আপনি আমাদের গ্রামের মধ্যে চলুন।

—গ্রামের মধ্যে কোথায়?

—এঁদের ঠাকুরবাড়ী।

গোপালদাসীর ইঙ্গিত তিনি বুঝলেন। ওই ধনী জমিদারের ঠাকুরবাড়ীতে যেতে বলছে। সেখানে প্রহরার অভাব হবে না। অন্য কোনো লোক সেখানে প্রবেশ করতে সাহস করবে না। অন্তত এই উদ্দেশ্য।

সন্ন্যাসী বললেন—না। তোমার যদি নিজের কোনো আশ্রয় থাকে সেখানে যাব আমি। কিন্তু ওখানে আমি যাব না। রক্ষীর রক্ষণাধীনে থাকা আর বন্দিশালায় বন্দী হয়ে থাকায় তো প্রভেদ নেই মা।

গোপালদাসী বললে—তাই চলুন। আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে।

আমাদের ঠাকুরবাড়ী অর্থে সাজার চণ্ডীমণ্ডপ। তাতে গোপালদাসীর অধিকার অত্যন্ত অল্প; বিষয়ীর হিসাবে পয়সা-খানেক। এই ঠাকুরবাড়ীটি আমাদেরই বাড়ীর সংলগ্ন এবং আমাদেরই অংশ সেখানে আট আনা।

সন্ন্যাসী এবার আর আপত্তি করলেন না, এসে উঠলেন আমাদেরই ওই সাজার ঠাকুরবাড়ীতে; দুর্গাঘরের মধ্যে নিজের হোমকুণ্ড জ্বেলে আসন পাতলেন।

গ্রামের লোক স্তম্ভিত হ'ল। এটা তাদের চোখে স্পর্ধা বলে মনে

হ'ল। এত বড় সন্দেহকে উপেক্ষা ক'রে ওই অসহায়া মেয়েটা সন্ন্যাসীকে নিয়ে গেল নিকটতম সান্নিধ্যে ?

* * *

আমি নিজে চিরকালই উঠি খুব প্রত্যূষে। অন্নুদয়ে, প্রায় ঊষাকাল বললেও অত্যুক্তি হয় না। "ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা—খনা বলেন—সেই হ'ল ঊষা।' এই সময়ে উঠে আমি যেতাম প্রাতর্ভ্রমণে। ঠাকুরবাড়ীতে সন্ন্যাসীর আগমনের কথা জানতাম না। প্রথম দিন ভোরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। দেখা হ'ল না, তাঁকে দেখলাম। দেখলাম ঘরের মধ্যে আসনের উপর সন্ন্যাসী শীর্ষাসনে যোগে বসেছেন।

পরের দিন—উঠতে আমার একটু দেরি হয়েছিল। সেদিন দেখলাম, যোগাসনের ক্রিয়া শেষ ক'রে ধ্যানে বসে আছেন।

তার পরদিন দেখলাম—সদ্য স্নান ক'রে ফিরছেন। আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

অগত্যা আমি গৃহী হিসাবে প্রথমেই তাঁর অন্তরস্থ দেবতাকে নমস্কার করলাম—নমো নারায়ণায়।

তিনিও বললেন—নমো নারায়ণায়।

সঙ্গে-সঙ্গেই আমি পা বাড়ালাম। তিনিও প্রবেশ করলেন দুর্গামন্দিরে।

এর পর আমি প্রাতর্ভ্রমণের দিক পরিবর্তন করলাম।

কয়েকদিন পর একদিন—তখন বেলা প্রায় এগারোটা, আমি আমার অভ্যাসমত উদ্দেশ্যহীন প্রান্তর ভ্রমণ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরছি; গ্রামে ঢুকেই দেখলাম, গ্রামের এক প্রতাপশালী গৃহস্থ জমিদারের কাছারিবাড়ীর সামনে পথের উপর একটি জটলা। এই প্রতাপশালী গৃহস্থটি গোপালদাসীর পিতৃকুলের জ্ঞাতি ; শুধু জ্ঞাতিই নয়, অভিভাবক বললেও এঁরাই। গোপালদাসীর পৈতৃক সম্পত্তি সামান্যই, যেটুকু আছে তাও এঁদেরই হাতে। গৃহস্থ কর্তাব্যক্তিদের জন-দুয়েক দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের দাওয়ার উপর। আর পথের

উপর দাঁড়িয়ে আছেন গ্রামেরই জন চারেক (চারজনকে মনে পড়ছে আমার) প্রবলপ্রতাপ ব্যক্তি।

প্রতাপ বস্তুটাই ব্যক্তিগত। প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে কর্মের উপর, অর্থনৈতিক সাফল্যের উপর, কিন্তু প্রতাপ নির্ভর করে ব্যক্তিগত দুর্দান্তপনার উপর। দেহের শক্তি, গলার শক্তি, অপ্রিয় ভাষা এবং কঠোরতা ছাড়া প্রতাপশালী হওয়া যায় না। অর্থ থাকলে দেহের শক্তি না থাকলেও চলে, অর্থবলে নিযুক্ত করা পাইক চাপরাশী দিয়ে ও-কাজটি চলে যায়। এর উপরে যদি গুণপনা বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যুক্ত হয় তবে তো আর কথাই থাকে না। বোঝার উপরে শাকের আঁটি এমন ক্ষেত্রে লোহার ভাণ্ডার বাণ্ডিলের মত গুরুভার হয়ে ওঠে। ধনবানের হাতে গিল্টির আংটিতে ঝুটো পাথরের মত কৃত্রিম মূল্যে মূল্যবান হয়। লোকে তখন লক্ষ্মী-সরস্বতীর একত্র মিলন দেখে কল্পনানেত্রে।

সেদিন রাস্তার উপর যে চারজন প্রতাপশালী ব্যক্তি জটলা পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন এমনি ধরনের প্রতাপশালী ছিলেন। দু'জন ছিলেন সরকারী কর্মচারী, কলকাতায় থাকতেন চাকরি উপলক্ষে, তৃতীয় জনই মুখপাত্র ; এঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল এবং ব্যবসায়ে কৃতী পুরুষ, কলকাতায় আপিস, সুতরাং গুণে ও জ্ঞানে ষোলোকলায় পরিপূর্ণ তাতে সন্দেহ কোথায় ? চতুর্থ জন ছিলেন গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা—নেশায় আসক্ত, নিজের বোধ ও বুদ্ধিমত ধর্মে অনুরাগী, সরল, সোজা মানুষ। আমার চোখে ইনিই ছিলেন সত্যকারের প্রতাপশালী। অপার সাহস, দুর্দান্ত ক্রোধ, বিপুল দৈহিক শক্তি সবই তাঁর ছিল, তাঁর দৃষ্টিতে এবং মতে যা অন্যায় বলে মনে হয়েছে তার প্রতিবাদ, সক্রিয় প্রতিবাদ করতে কখনও দ্বিধা করেননি। বোধশক্তি দুর্বল, যে যা বুঝিয়েছে তাঁকে তাই তিনি বুঝেছেন, বিশ্বাস করেছেন, নইলে লোকটি সত্যই ভালো লোক। আমার রচনার মধ্যে বহুস্থানে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন শূলপাণি নামে।

যাই হোক, সেই দিনের কথাই বলি। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যাব, এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, এই যে! এই লোকটি!

অগত্যা দাঁড়াতে হ'ল। এবং প্রশ্নও করতে হ'ল, কি ব্যাপার?

—Sir, তুমি আমাদের মত বারো মাস বাইরে থাক না। এখানে তুমি প্রায়ই রয়েছ। গ্রামের কোথায় কি অন্যায় হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। প্রতিবিধান করা উচিত।

তখনও আমি সত্যই বুঝতে পারিনি হাওয়া কোন দিকে বইছে। কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ব্যাপারেই এঁরা ছিলেন গীতার সেই "যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি" শ্লোকের দুষ্কৃতি-বিনাশ-কারী পুরুষটির মতো। এঁরা গ্রামে এলেই সমাজ ইউনিয়ন-বোর্ড নিয়ে অন্তত খান-কয়েক বেনামী দরখাস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে গিয়ে হাজির হ'ত। দুটো একটা ব্যক্তিগত দেনা-পাওনার সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠত। কাজেই কোনো অন্যায়, কোনো পাপের জন্য ধর্মক্ষেত্রে এমন রথী সন্নিবেশ হতে চলেছে সে কেমন ক'রে বুঝব?

প্রশ্ন করলাম, অন্যায়? পাপ? সে তো সমাজে রয়েইছে। কোন—

বাক্য শেষ করতে হ'ল না আমাকে। মধ্যপথেই কথা কেড়ে নিয়ে একজন বলে উঠলেন—Are you blind? Are you deaf?

অন্য একজন বললেন—তোমার বাড়ীর দোরে, তোমাদের পৈতৃক দেবালয়ে পাপের লীলা চলছে, তুমি জান না?

—একটা সন্ন্যাসীকে নিয়ে যুবতী মেয়ে একেবারে গ্রামের ভিতরে কেলেঙ্কারি কাণ্ড করছে, তুমি শোননি? তোমার বাড়ীর দোরে, তুমি দেখনি?

ইঙ্গিতটি বুঝবামাত্র আমার অন্তর একদিকে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, মনে পড়ল অশীতিপর যোগাভ্যাসী সন্ন্যাসীর মূর্তি, তাঁর ধ্যানমগ্ন মূর্তি, যে কয়েকবার তাঁকে আমি দেখেছি সব কয়েকবারের ছবিই আমার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর প্রতিবাদ করে উঠল। সে প্রতিবাদ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল; আমি বললাম,

এসব কথার উত্তর দেবার আগে আমি প্রশ্ন করব, তোমার কি কেউ এ সন্ন্যাসীকে দেখেছ?

—দেখবার কি আছে এর মধ্যে?

—আছে। যে পাপের উল্লেখ তোমরা করছ তার একটা বয়স আছে। এই সন্ন্যাসীকে আমি দেখেছি। তাঁর মুখ দেখে, তাঁর আচরণ দেখে আমার যে ধারণা হয়েছে সে ধারণার কথা থাক, তোমাদের কাছে বলতে গিয়ে উপহাসাস্পদ হব না। কিন্তু তাঁর বয়সের কথা অবশ্যই বলব। তাঁর বয়স আশীর ঊর্ধ্বে, তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অবাস্তব অসম্ভব বলেই আমি মনে করি।

তাঁরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

আমি বাধা দিলাম। বললাম, আরও একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হ'ল—অধিকারের প্রশ্ন। হিন্দু সমাজে গুরু কার নাই? সকলেরই আছে। কার গুরু বৎসরে দু-একবার শিষ্যবাড়ি না আসেন? সকলের বাড়িতেই গুরুর পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়ে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরু পুরুষরূপেই আসেন। গুরুপত্নী আসেন না। গুরু যখন আসেন তখন কার পত্নী গুরু-সেবা না করেন? এবং এই সেবার কালে ক'জন অভিভাবক উপস্থিত থাকেন পাহারা দিতে? আমি অধিকারের কথাই বলছি—কোনো ক্ষেত্রেই কলুষ আরোপণের চেষ্টা করছি না। জানতে চাচ্ছি—গোপালদাসী এই সন্ন্যাসীকে গুরুপদে বরণ ক'রে ঘরের কাছে চণ্ডীমণ্ডপে তাঁকে স্থান দিয়ে কোনো অধিকার-বহির্ভূত কাজ করেছে? সকলের যে অধিকার আছে সমাজে—সে অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে কোন অপরাধে? সে অভিভাবকহীনা, দুর্বল, দরিদ্র, এইটেই কি তার অপরাধ? যাঁর অভিভাবক আছে—তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কে করতো শুনি? সমস্ত জটলার কোলাহল কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালাম। কয়েক পা এসেছি এমন সময় পিছনে যেন বিস্ফোরণ হয়ে গেল।

শূলপাণি চীৎকার করে উঠল—অপরাধ অধিকার বুঝিয়ে দেবো আজ! আজই! হাঁ, হামারা নাম শূলপাণি।

একজন বললেন—ঠিক বলেছ। আজই বেটা ভণ্ড সন্ন্যাসীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে—ঘাড়ে ধরে—গ্রাম থেকে বের করে দাও। ঘা-কতক দেবে—আচ্ছা ঘা-কতক।

আমি আবার দাঁড়ালাম। বললাম—তা হ'লে সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি বাধা দেব।

বলেই আমি চলে এলাম।

পিছনে শূলপাণি চীৎকার করতে লাগল। আমাকে শোনাবার জন্যই চীৎকার। চীৎকার ক'রে নানা কুৎসিত ইঙ্গিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় প্রদর্শন।

৩

শূলপাণির ক্রোধকে আমাদের ওখানকার লোকে ভয় করে। শূলপাণির রোষ-চীৎকার শূন্যগর্ভ কুম্ভনাদ নয়। চিরকালের দুর্দান্ত শূলপাণি। সাহসও যত, ক্রোধও তত। ক্রুদ্ধ হলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে শূলপাণি। ভূত প্রেত সাপ বাঘ কাউকে সে ভয় করে না; সত্য-সত্যই করে না। সে গোখরো সাপ ধরত খেলাচ্ছলে। দাঁত ভেঙে বাচ্চা গোখরো পকেটে কাগজে মুড়ে রেখে দিত। রহস্য করে হঠাৎ লোকের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে হি-হি ক'রে হাসত। প্রথম যৌবনে সামান্য অজুহাতে লোকজনকে মারধর করাই ছিল নিত্য কর্ম। সেই সময় একদিন নিজেদের বাড়ির খিড়কিতে নেমে সামনে পেয়েছিল একটা ঢোঁড়া সাপ। সাপটাকে সঙ্গে-সঙ্গেই পাকড়াও করে বাড়ি এনে বউদিদিদের সামনে সেটার খেলা দেখাতে গিয়ে কৌতুকভরে এক বউদিদির গায়ে সেটা ফেলে দিয়েছিল। ঢোঁড়া সাপ বিষহীন কিন্তু তবুও সাপ। বউদিদি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। সেই চীৎকারে

শূলপাণির দাদা ছুটে এসে ঘটনা দেখে দুরন্ত ক্রোধে শূলপাণিকে নিষ্ঠুর প্রহার শুরু করে দিয়েছিলেন। শূলপাণির দাদা শূলপাণি অপেক্ষাও বলিষ্ঠ ব্যক্তি তখন। শূলপাণি প্রহারের প্রতিশোধ দৈহিক শক্তিবলে নিতে অক্ষম হয়ে বের করেছিল ছুরি এবং সেটা দাদার বুকে বসিয়ে দিয়েই বেরিয়ে পালিয়েছিল। তখন বর্ষার সময়—আমাদের গ্রামপ্রান্তের কোপাই নদী তখন দু'কূল পাথার। সেই নদী সাঁতরে পার হয়ে কিছুদিনের জন্যে সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ভাগ্য করে বেশী ভাল জানি না—ছুরিটা ছিল কলমকাটা ছুরি. ফলাটা খুব বড় ছিল না, তাই দাদাও বেঁচেছিল—শূলপাণিও ফাঁসির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।

যে সময়ের কথা—সে সময়ে শূলপাণি বোধ হয় তার জীবনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদ্ধত এবং উগ্র হয়ে উঠেছে। কারণ তখন, ক্লম্বর ছোট ভাই হয়েছে আই-বি ইনস্পেক্টর এবং সেই সময়টা ১৯৩০ সালের পরবর্তী কাল. তখন বাংলাদেশ আই-বি পুলিশের দ্বারাই শাসিত। সুতরাং শূলপাণির ক্রোধ তখন বৈশাখের কালবৈশাখী মেঘের বজ্র বিদ্যুতের মতো অবাধ অধিকারে স্ফুরিত হয়। তার উপর সেদিন তার পিছনে ছিল—উত্তাপ ও ঝঞ্ঝার সহযোগিতার মতো গ্রামের দুই বিশিষ্টজনের পৃষ্ঠপোষকতা।

আমার সম্বল ছিল আমার আদর্শবাদের অভয়। এ অভয় বিচিত্র. অমোঘ. অপরাজেয়। রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যে যে অভয় কামনা ধ্বনিত হয়েছে এ অভয় সেই অভয়, "তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছে নিজে, প্রত্যেকের করে দিয়েছ শাসনভার, রাজ অধিরাজ।" এ অভয় সেই অভয়। সেই অভয় আমাকে মুহূর্তে করে তুলেছিল অচঞ্চল, স্থির। আমি দৃঢ় পদক্ষেপেই বাড়ী ফিরে এলাম। বেলা তখন বোধ হয় বারোটা। স্পষ্ট মনে রয়েছে আজও মনে আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। মন আমার তখন সংকল্পে স্থির। আমি স্থির করেছি, আমাদের বাড়ির যে দরজায় ঠাকুরবাড়ি সেই দরজার মুখে আসি বসে থাকব। এখানে বসলে যেই দিক

দিয়ে যেই আসুক আমাদের ঠাকুরবাড়িতে—আমার দৃষ্টির অগোচর থাকবে না। যে মুহূর্তে যে কেউ আসবে আমি তার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়াব। আমার চেতনা এবং শক্তি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর গায়ে হাত দিতে পারবে না। এবং এও জানি আমার রক্তপাত হলে তাতেই আক্রমণকারীর আক্রমণপিপিসা মিটে যাবে। তাকে ফিরে যেতে হবে। নিঃশেষিত বীর্য নিঃশেষিত-ক্রোধ হয়ে ফিরতে হবে।

একথা আমার জীবনদেবতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত ভাবেই বলছি যে, সেদিন সেই সংকল্পে স্থির অথবা প্রতিষ্ঠিত হতে আমাকে এক বিন্দু চেষ্টা করতে হয়নি। চিন্তা ক'রে দেখতে হয়নি—আমার কর্তব্য কি? চোখের উপর আঘাত উদ্যত হলে চোখের পাতা যেমন আপনি চোখকে ঢেকে নেমে আসে তেমনিভাবেই ঐ চোখের পাতার মতই আমি এ আঘাতকে প্রতিহত করবার জন্য সন্ন্যাসীকে আড়াল ক'রে দাঁড়াবার সংকল্পে স্থির হ'য়ে ছিলাম। কোনো প্রশ্ন ছিল না, কোনো প্রশংসার লোভ ছিল না, কোনো মহৎ-কর্ম সাধণের গৌরববোধ ছিল না। স্বতোৎসারিত একটি জীবন-বেগ।

বোধ করি এই কারণেই আমি তন্ময় হয়ে গেলাম এই কর্তব্যপালনের চিন্তায়। বাড়িতে ছোটখাটো কয়েকটা কাজ ক'রে বেড়াচ্ছি যন্ত্র-চালিতের মতো; কিন্তু আমার সমগ্র অন্তর-কল্পনা ওই চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। ঝড়ের আঘাত সহ্য করবার জন্য স্তব্ধ পৃথিবীর মতো আমার চিন্ময়লোকের অবস্থা। বস্তু-জগতের যেটুকু আমার চোখের সম্মুখে সেটুকু অর্থহীন—তার সঙ্গে কোনো সংযোগ আমার নেই, আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আছেন ওই সন্ন্যাসী; সেই তেমনি হোমবহ্নির দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে স্থির বৃদ্ধ বসে আছেন।

আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—আমার এই স্তব্ধ তন্ময়তা তাঁর চোখ এড়ায় নি। আমি অসংলগ্নভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন।

স্ত্রীও লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেন নি—ভেবেছিলেন হয় বুলুকে ভাবছি, নয় লেখার ভাবনায় মগ্ন রয়েছি।

আমার নিজের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

পরে বুঝেছি—আমার নিজের বিশ্লেষণে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি, এ সেই তন্ময়তা, সেই ধ্যানযোগ যে যোগের আকর্ষণে বিচিত্র আপনাকে প্রকাশ করেন মানুষের সম্মুখে।

যাক্, বিশ্লেষণের কথা থাক্। ঘটনার কথা বলি। তার মধ্যে দিয়েই সে আসে এবং সেদিন সে এসেছিল। যেমন একদিন রাত্রে এসে আমাকে দেখা দিয়ে মৃত্যু যবনিকার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল।

হঠাৎ এক সময় কার ডাকে মুখ তুলে দেখলাম —গোপালদাসী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সে আমাদের বাড়িতে এসে আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসেছে।

গোপালদাসী না হেসে কথা বলতে পারত না, জানত না।

সেদিন দেখলাম গোপালদাসী বিষণ্ণ : শঙ্কাকাতর তার দৃষ্টি, ঠোঁট দুটি কাঁপছে।

কোনো রকমে আত্মসম্বরণ ক'রে সে বললে, আমি এসেছি তোমার কাছে।

তখন আমি আমার চিন্তায় মগ্ন। সেই মগ্নতার মধ্য থেকেই উত্তর দিলাম, উত্তরে তাকে প্রশ্নই করলাম—কেন বল তো ?

—কি হবে ? চোখে তার জল টলমল ক'রে উঠল।

—কিসের ?

গোপালদাসী বিস্মিত হয়ে বললে—তবে যে শুনলাম তুমি ছিলে সেখানে। তোমার সঙ্গেই কথা হয়েছে। তুমি তাদের বলে এসেছ —তারা যদি বাবাকে অপমান করতে আসে, কি মারধর করতে আসে, তবে তুমি বাধা দেবে।

—ওঃ। আমার এতক্ষণে বোধগম্য হ'ল। পৃথিবীতে ফিরে এলাম। হেসে বললাম, হ্যাঁ, বলেছি। আর বাধা আমি দেব। তুমি ভয় ক'রো না। তবে সাবধানে থেকো।

মুহূর্তে আর একটা কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল—গোপালদাসী

যখন বিদ্রোহ করেছে তখন বিদ্রোহের চরম ক'রে দিক! নিয়েই যখন এসেছে গ্রামের মধ্যে তখন বাইরের দেবালয়ে কেন? গুরু বলে শরণ নিয়েছে; বাবা বলে স্নেহের প্রত্যাশায়, অভয়ের আশায় সেবা করেছে, অখন ঘরেই বা নিয়ে যাবে না কেন? আর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যখন এতটাই স্বীকার করেছেন, বন্ধনকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন, তখন তিনিই বা যাবেন না কেন? গৃহীর গৃহ? হলেই বা। তিনিও তো আশ্রমে চারখানা দেওয়ালের মধ্যে আচ্ছাদনের তলেই থাকেন। তাঁর পদার্পণে গৃহীর গৃহকেই তিনি আশ্রম ক'রে তুলুন না। তাঁকে যদি অপমানিত লাঞ্ছিত হ'তে হয় তবে সেইখানে দাঁড়িয়েই তিনি তা মাথা পেতে গ্রহণ করুন। পরম দেবতার যে শাসনদণ্ডের অধিকার আমি পেয়েছে, সেই দণ্ড হাতে আমি গোপালদাসীর দরজাতেই গিয়ে দাঁড়াব।

বললাম সেই কথা গোপালদাসীকে। বললাম, আমি বলি—তোমার গুরুকে তুমি তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাও।

গোপালদাসী প্রদীপ্তের মতো জ্বলে উঠল, বললে—যাব? নিয়ে যাব?

—কেন যাব না? তোমার গুরু। কার গুরু ঘরে না আসেন?

—তুমি একবার আসবে? বাবাকে বলবে?

—না। তোমার গুরু, তুমি বলবে। আমি কেন বলব?

-তোমার নাম কিন্তু করব আমি।

-না। তা ক'রো না।

গোপালদাসী কথাটা না-তুলেই চলে গেল। স্নান করে খেতে বসেছি এমন সময় খবর পেলাম—সন্ন্যাসীকে গোপালদাসী নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছে।

ঘণ্টাখানেক পর—গোপালদাসী আবার এল। বললে—আবার এলাম।

—কেন?

—বড় বাড়ীর ছোট গিন্নী কথাটা বলে পাঠিয়েছিলেন—বাবুদের

কাছে। ওঁরা বলছেন—দু'জন চাপরাশী পাঠিয়ে দেবেন—রাত্রে পাহারা দেবার জন্যে।

—সে কথা শুনে আমি কি করব?

গোপালদাসী বললে—কিন্তু বাবা বলছেন—চাপরাশী পাহারার মধ্যে তিনি থাকবেন না। তা' হ'লে আজই চলে যাবেন। তা' তুমি যদি একবার এস, বাবাকে একটু বুঝিয়ে বল তো ভাল হয়।

বললাম—সে বলতে আমি যাব না গোপালদাসী। তোমার গুরুকে রক্ষা করতে কোনো লোকের দরকার নাই। চাপরাশীরও নাই—আমারও নাই। এ মানুষকে রক্ষা করবার জন্য মানুষের দরকার হয় না। ওঁর অপমান করতে, গায়ে হাত দিতে কারও শক্তি নাই। মিথ্যে গুরুর কাছে খেলো হ'য়ো না। বাড়ি যাও।

গোপালদাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। বুঝলাম—বুঝেও ওর মন বুঝতে চাইছে না। সে দুর্বল, সে অসহায়, তার উপর এমন উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা;—সমস্ত মিলে তাকে এমন অবুঝ ক'রে তুলেছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের আশ্বাসেও আশ্বস্ত হবে না, তাঁর বুঝিয়ে বলাতেও ওর অবুঝপনা ঘুচবে না।

* * *

মনে রয়েছে—শুক্ল পক্ষ চলছিল তখন।

ঠিক কি মাস সেটা মনে নাই তবে আকাশ ছিল নির্মেঘ এবং বড় নির্মল। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই জ্যোৎস্না ফুটে উঠত ঝরা-শিউলিতে-আচ্ছন্ন নিকানো অঙ্গনের মতো। সন্ধ্যা হ'তে না-হ'তেই মাটির উপর নিজের ছায়া পড়ত। ক্রমশ সে ছায়া গাঢ় হ'ত। আকাশের নীল ঝলমল করত। সেদিন বিকেলে বাইরে যাই নি। আমার হারানো-মেয়ের সন্ধানে নিত্য শ্মশানে যাওয়া সেই দিন বোধ করি প্রথম বন্ধ রইল। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দিরে দাঁড়ালাম।

এখান থেকে গোপালদাসীর বাড়ী দূরে। ঠাকুরবাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়ালে—সামনে পড়ে গোপালদাসীর সদর দরজা।

উত্তর দিকে গলিপথে একটা প্রবেশ-পথ আছে গোপালদাসীর বাড়ীতে—সেখানটা এখান থেকে দেখা যায় না; তা' না যাক, আক্রমণকারী কেউ এলে সন্ন্যাসী চীৎকার করবেন না কিন্তু গোপালদাসী চীৎকার করবে।

দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

আগে যে বলেছি—ঝড়ের সম্মুখীন হতে পৃথিবীর স্তব্ধতার মতো স্তব্ধ হয়ে যে প্রতীক্ষা, তেমনি প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। সময় হিসাব করিনি।

মা যখন ডাকলেন তখন রাত্রি প্রায় দুপুর। ওই বড়বাবুদের বাড়িতে এবং রাইস মিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি পেটা হ'ত। মা বললেন—এগারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। প্রথম দুটো প্রহর যখন কেটে গেছে তখন ফাঁড়া কেটেছে আজকের মতো। এরা যাই হোক—ডাকাত বা খুনে নয়। এর পর আর তারা আসবে না।

বাড়ি গেলাম। কিন্তু রাত্রে ঘুম হ'ল না। জেগেই রইলাম।

পরের দিনও কাটল।

তৃতীয় দিনে শুনলাম—ঝড় ও উত্তাপ মিলিয়ে গেছে। বাবু দুটি কলকাতা চলে গেছেন। সেইদিন অপরাহ্নেই শুনলাম, শূলপাণি বলেছে—যার যা খুশি করুক গে, আমার কি? তারাশঙ্কর এ কথাটা তো সত্যিই বলেছে, কার বাড়িতে গুরু না আসে? আর সন্ন্যাসীর কথা যা বলেছে তাও সত্যি—ও মানুষ এমন হয় না। ওই ওরা এসে ধুয়ো তুললে—তার কি বলব? মদ-টদ খেলাম। তখন ওরা যা বললে তাই সত্যি মনে হ'ল। যাক গে। মরুক গে।

চতুর্থ দিনে শূলপাণি সন্ন্যাসীর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেল।

সেই দিনই অপরাজেয় গোপালদাসী এল আমার কাছে।—তোমাকে বাবা একবার ডাকছেন।

আমি বললাম—না। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ো। আমি যাব না। আমার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল—যার জন্য গোপালদাসী দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে পারলে না। শুধু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে—যাবে না?

—না। আমাকে মাপ করতে ব'লো।

সে চলে গেল। আবার এল কিছুক্ষণ পর। বললে—তিনি বিশেষ করে বলেছেন; একবার তোমাকে যেতেই হবে।

বললাম—না। বলেই আমি বেরিয়ে চলে গেলাম। অনিচ্ছাটা দৃঢ়তার সঙ্গে জানাবার জন্যই চলে গেলাম। মনের মধ্যে যে অভিমান বা ক্ষোভ ছিল তাকে অস্বীকার করে নিজেকে নিজেই বললাম—আমি আমার কর্তব্য করেছি। কোনো প্রতিদানের আশা তো করি নি। সুতরাং কেন যাব? আমার কর্তব্যপালনের গৌরব বল গৌরব, পুণ্য বল পুণ্য, সেইটুকুকেই বা কেন ক্ষুন্ন বা ম্লান করব?

চুপ করে একা কিছুক্ষণ বসে রইলাম বৈঠকখানা-বাড়ীতে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। উঠলাম। যাব শ্মশানের দিকে। কিন্তু জুতো পায়ে দেবার জন্যই বাড়ী ফিরতে হ'ল। বাড়ির দরজায় মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখবামাত্র আমার হাত ধরে বললেন—আয়।

—কোথায়? বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম। মা যে এইভাবে আমাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে যাবেন এ কল্পনাও আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বললেন—গোপালদাসীর গুরুর কাছে।

—না। আমি দাঁড়ালাম থমকে।

মা বললেন—আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তোমাকে নিয়ে যাব, আমি কথা দিয়ে এসেছি। এর পরও তুমি না বলবে?

এক মুহূর্তে তুই থেকে তুমি হয়ে গিয়েছি। কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হয়ে উঠেছে। আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। গেলাম মায়ের সঙ্গে।

গোপালদাসীর ঘরে তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। প্রদীপ জ্বালছে গোপালদাসী। মা আমাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললেন—বাবা তারাশঙ্কর এসেছে।

—এসেছে? অগ্নিকুণ্ড-নিবদ্ধ দৃষ্টি মুহূর্তে ফিরল। প্রসন্ন কণ্ঠে আমাকে বললেন—এসেছ? বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অগ্রসর হয়ে এলেন দু-পা, দীর্ঘ দুই হাত বাড়িয়ে আমার দক্ষিণ হাতখানি টেনে নিয়ে

জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমার কাছে আমার অপরাধ জমা হয়ে আছে। তুমি আমাকে মার্জনা কর।

সমস্ত ঘরখানাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

৪

ঘরখানাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। বাস্তব সত্য হয় তো আমিই এমন স্তম্ভিত হয়েছিলাম যে আমার মনে হয়েছিল ঘরখানাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এবং সেটা বাস্তব সত্য না হলেও আমার কাছে পরম সত্য। কেন বলছি সেই কথাই বলি। গোপালদাসীর সে ঘরখানা টিনের চালের ঘর। ঘরখানা গোপালদাসীর নয়, গোপালদাসীর খুড়োর। খুড়তুত ভাইয়েরা সক্ষম। তারা দুই ভাই কলিয়ারী অঞ্চলে থাকে, গোপালদাসীর খুড়ো খুড়ী বউ নাতি নাতনীরাও সেখানে। দু'বছর চার বছর অন্তর একবার আসে, কোনো কোনো বার আরও বিলম্ব হয়। তাই গোপালদাসীর কাছে চাবি থাকে, ঘর ঝাড়বে মুছবে, তার উপর মাটির ঘর—ইঁদুরে কাটবে; তাতে মাটি দিতে হবে। দরজায় জানালায় উই ধরবে—ছাড়াতে হবে। এই ঘরেই গোপালদাসী সন্ন্যাসীকে স্থান দিয়েছিল।

টিনের ঘরের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন টিনের ঘরে কেমন শব্দ হয়। একবার দিনের উত্তাপে উত্তপ্ত হলে—আর একবার রাত্রের হিমে ঠাণ্ডা হলে শব্দ আরম্ভ হয়—গরমে টিন বাড়ে; রাত্রের ঠাণ্ডায় সে আবার কমে আসে সশব্দে। সে যেন মনে হয় টিনের চাল মাহেন্দ্রক্ষণে গড়া ঘরের মতো কথা বলছে। বরাহমিহিরের গল্পে আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের একটা বিচিত্র বাড়ি ছিল। মধ্যরাত্রি হলেই কে যেন বলত—পড়ম্ পড়ম্। এর কারণ নির্ণয় হয় নি। এমন কি, বরাহাচার্যের মতো গুণীও নাকি পারেন নি। খনা এবং মিহির যখন রাজসভায় এলেন তখন তাঁদের পরিচয় বরাহাচার্যের কাছে অজ্ঞাত।

তাঁদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে বরাহাচার্য সেই পরিত্যক্ত বাড়ীতে স্থান দিলেন। রাত্রে শব্দ উঠতে লাগল—পড়ম্ পড়ম্। খনা তৎক্ষণাৎ বুঝলেন—এ-ঘর বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে আরম্ভ হয়েছে মাহেন্দ্রলগ্নে, শেষও হয়েছে মাহেন্দ্রলগ্নে। এর ফল অদ্ভুত। খনা বললেন পড়, কিন্তু আমাদের শয্যাটুকু বাদ দিয়ে। ঘর পড়ল। বিপুল শব্দ হ'ল। নগরবাসী সে শব্দে চকিত হয়ে উঠে এসে দেখলে ইট কাঠ মাটি পাথর—সব সোনা হয়ে স্তূপীকৃত হয়ে আছে: তার মধ্যে একপাশে ঘুমুচ্ছে সেই বিচিত্র আগন্তুক দম্পতি।

টিনের ঘর পড়ম্ পড়ম্ বলে না, পড় বললে পড়েও না। কিন্তু ওই সন্ধ্যায় এবং ভোরে অবিরাম বলে—কাটাং কাটাং। কট কট কট। সেই সন্ধ্যার সময় যখন গোপালদাসীর ঘরে সিঁড়ি ভেঙেছি তখনও সেই শব্দ শুনেছি। কিন্তু যে মুহূর্তের কথা বলছি সেই মুহূর্তে সে শব্দ ছিল না, আমি শুনি নি। আমার পৃথিবী তখন ওই ঘরখানির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাহিরের জগত, বাহিরের জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যেন নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি স্তব্ধ, আমার মা স্তব্ধ, গোপালদাসী স্তব্ধ, তার হাত থেকে সদ্যজ্বালা প্রদীপটি পড়ে গেল মেঝের উপর, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল, ঘরখানা মুহূর্তে ভ'রে গেল অন্ধকারে। আমি যেন মুহূর্তে মুহূর্তে হারিয়ে ফেলছি আমাকে। আমার অন্তরের মধ্যে প্রচণ্ড কম্পনে সব যেন ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় অশীতিপর সন্ন্যাসীর মাথা যেন ঊর্ধ্বলোক থেকে সস্নেহে আনত হয়ে আমার মস্তক আঘ্রাণ করছেন বলে মনে হ'ল।

বোধ হয় মিনিটখানেক, তার বেশী নয়, কিন্তু আমার স্মৃতিতে সে যেন একটা কাল মনে হয়েছিল, যেন জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যায় সিদ্ধিফল আমার হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রথমেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন আমার মা। তিনি বলে উঠলেন—প্রণাম কর, প্রণাম কর! তারপর অনুযোগ করে বলে উঠলেন—এ আপনি কি করলেন বাবা?

আমি তখন প্রায় আত্মবিস্মৃত। আমি প্রণাম করব বলেই আনত হ'তে গেলাম, সন্ন্যাসী বললেন না! এভাবে নয়। তুমি ত জান প্রণাম পদ্ধতি, সম্ভাষণ—বল, নমো নারায়ণায়।

আমি তাই বললাম—নমো নারায়ণায়।

মা বললেন—না—না। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কর।

—না মা। না। আমি বলছি। বস, আগে বস।

গোপালদাসী আলো জ্বাললে এতক্ষণে। ঘরখানি প্রসন্ন মৃদু আলোয় ভরে উঠল। সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—সেদিন তোমাকে আমি কঠোর কথা বলেছিলাম। আমি শ্রান্ত ছিলাম পথশ্রমে। আমার যোগের সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। চিত্তও অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তখন আমি চাইছিলাম নির্জনতা, সেই সময় তুমি ওই কথা বললে। আমি বিচার না করে তোমাকে পরীক্ষা না করেই বললাম ওই কথা।

স্মিত হেসে বললেন—ভালই করেছিলাম। আমার মা যশোদা গোপালদাসীর পথ—আর তোমার পথ তো এক নয়। আমি ভালই করেছি। তোমাকে দীক্ষা দিলে আমি ভুল করতাম। না হ'ত তোমার প্রকৃতিগত পথে সাধনায় সিদ্ধি, না হ'ত তোমার মন্ত্রজপে পরিতৃপ্তি। তোমাকে যেদিন আমি ডেকে বলেছিলাম, তুমি মন্ত্রদীক্ষা চেয়েছিলে কিন্তু কই তারপর আর এলে না কেন? সেদিন তুমি আমাকে যে উত্তর দিয়েছিলে—তাতেই আমি তোমার প্রথম আঁচ পেয়েছিলাম। অনেক কৌতূহল হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন কাউকে করিনি। বাবা, যখন প্রথম নিন্দা উঠল গ্রামে তখন কয়েকবার এও মনে হয়েছে যে, এর মধ্যে তারাশঙ্কর নাই তো? তোমার সেদিনের কথার মধ্যে তোমার যে পরিচয় ছিল তাতে চমকে উঠেছি, মুগ্ধ হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু উত্তাপের আঁচ পেয়েছি। অভিমান হোক, ক্ষোভ হোক—যা হোক একটা ছিল। ও বস্তু যে ভয়ানক বাবা। ফসলের ক্ষেতে আগাছার মতো ওর বৃদ্ধি। ফসল বাড়ে একগুণ, আগাছা বাড়ে দশগুণ। তাই বাবা, সেদিন মা গোপালদাসী

এসে যখন বললে, তারাশঙ্কর বলেছে সত্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না। যে মিথ্যা গ্রামের লোক বলেছে তার সে প্রতিবাদ করেছে—বলেছে—গোপালদাসীর সাধু বাবাকে অপমান করতে হ'লে তাকে অপমান করতে হবে আগে—তাকে নির্যাতন করতে গেলে সে আগে দরজা রুখে খাড়া হয়ে যাবে, আমি মনে মনে বললাম—তারাশঙ্কর জিতে গেল! মানুষকে এমনি জিততে দেখলে মন বড় খুশী হয়। বড় আনন্দ হয়। তবে তুমি একটা মিথ্যা কথা বলেছ।

—মিথ্যা বলেছি? সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ। আমাকে সেদিন বলেছ তুমি মৃৎপাত্র। হাসতে লাগলেন তিনি।

—মৃৎপাত্র না-হলেও স্বর্ণপাত্র আমি, এ অহঙ্কার বা বিশ্বাস আমার নাই। আমার খাদ অনেক।

—সেই তো বাবা। তোমাকে তাই তো অনেক দহনে দগ্ধ হ'তে হবে।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

—আমি শুনেছি তোমার একটি কন্যা মারা গিয়েছে। বড় আঘাত পেয়েছ।

চোখ দিয়ে আমার জল গড়িয়ে এল।

—তুমি শ্মশানের ধারে গিয়ে বসে থাক। কি খোঁজ? মেয়েকে?

উত্তর দিতে পারলাম না। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলাম।

—মেলে না ভাই। ও দেখা মেলে না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার বললাম—কিন্তু মন মানে না। না গিয়ে পারি না।

—পারবে। পারতে হবে। আর ভাই, দেখা যদি মিলবার হয় তবে কি শ্মশানেই মিলবে, ঘরে মিলবে না? তবে আর সে কি মেলা?

আমার গায়ে হাতখানি রাখলেন, বুলিয়ে দিলেন জননীর স্নেহে। বললেন—এ বুড়ো সাধুর বাত রাখবে বাবা। শ্মশানে যাবে না। কেমন? গেলে আমি দুঃখ পাব।

আমি হেসে বললাম—আমি চেষ্টা করব। না যাবারই চেষ্টা করব।

—বাস্। বাস্। ওতেই হবে। আর এক বাত ভাই, দুনিয়াতে এই সত্যকে মাথায় ক'রে চলবে ভাই। যাচাই না-ক'রে কাউকে বলো না আমাকে দীক্সা দাও। দীক্সা তোমার হয়ে গিয়েছে। এ বাত আমার কাছে শুনে রাখ। যদি কোনোদিন এ দীক্সায় সাধন তোমার অসাধ্য হয়, সেদিন গুরু তোমার আপনি মিলবে। আর এক বাত শুনো। আপনা পথ মে চলো, পথ দেখানেওয়ালা তোমার পথে খাড়া আছে।

আমি সেদিন বিগলিত হয়ে গিয়েছি এমন অবস্থা আমার। আমার অহঙ্কার ছিল না, অভিমান না, অতৃপ্তি না ; সে এক অদ্ভুত অবস্থা। দুটি চোখ যেন ঘুমে ভরে আসছে। মনে হ'ল সেইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সন্ন্যাসী বললেন—আমি ভাই এখন একবার জপে বসব। আমার কাছে এস, আচ্ছা ভাই, যখন খুশী হবে তখন আসবে।

আমি হাত জোড় করে বললাম—নমো নারায়ণায়।

—নমো নারায়ণায়। সন্ন্যাসী বললেন—আজ তো ভাই, ঠিক ঠিক 'নমো নারায়ণায়' হল। বলে উঠে তিনি আমাকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হয় শূন্য নয় পূর্ণ মন দিয়ে গোপালদাসীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। আজও সেই অনুভূতিকে আস্বাদন করেই বলছি—শূন্যতায় মনের অবস্থা এক। সমস্ত বিশ্ব-সংসার মনের মধ্যে এসে ধরা যখন দেয় তখন বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্বই থাকে না। অসীম শূন্যের মধ্যে তখন মানুষ একা। তাও সে ঘুমন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন, সে অপার প্রসন্নতাতেই হোক, সীমাহীন বিষণ্ণতাতেই হোক।

বাইরেও সেদিন যেন পৃথিবী পরিপূর্ণতায় ঝলমল করছে। পূর্ণিমা সেদিন। জ্যোৎস্নার এমন আকর্ষণ আর কখনও অনুভব করি নি। ভিতরে বাহিরে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে বলে মনে হ'ল। আমি

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে যেন বাধ্য হলাম। কানের পাশে যেন শুনলাম সন্ন্যাসীর কথা। এ বুড়ো সাধুর একটি কথা রাখবে বাবা!

যেখানে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকেই একটা পথ চলে গিয়েছে শ্মশানে, একটা গিয়েছে পশ্চিম মুখে। পশ্চিম মুখে কিছু দূরেই আমাদের সেই বাগান, যে বাগানের কথা এর আগে বলেছি। বাবার প্রতিষ্ঠিত তারামায়ের আশ্রম। যার কথা আমার ধাত্রী দেবতার প্রথমেই আছে।

—শ্মশানে যাবে না বাবা?।

দিক পরিবর্তন করলাম। আপন অজ্ঞাতসারে পূর্ব মুখেই পা বাড়িয়েছিলাম। দিক পরিবর্তন ক'রে পশ্চিম দিকের পথ ধরে বাগানে ঢুকে অবারিত প্রান্তর সামনে রেখে এসে বসলাম।! স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। দৃষ্টি রুদ্ধ হয়েছিল, শোনবার শক্তি রুদ্ধ হয়েছিল, স্পর্শ-শক্তিও বোধ করি ছিল না। এমনি বিচিত্র অবস্থায় একটি অস্পষ্ট স্মৃতি আজ স্মরণ হচ্ছে। এমনি অবস্থার মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যেন বুলুকে আমার ফিরে পেয়েছিলাম বলে মনে হয়েছিল। তার স্পর্শ অনুভব করি নি, তাকে ছুঁই নি, তার কথা শুনি নি, আমি কিছু বলি নি, তাকে চোখে দেখি নি, তবু যে এমন কি করে কেন মনে হয়েছিল সে আমি জানি না। কারণও আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে মনে হয়েছিল—আমি তাকে পেয়েছিলাম, অনুভব করেছিলাম—সকল মন দিয়ে, পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে আত্মার ইন্দ্রিয় যদি থাকে—তাই দিয়ে তাকে পেয়েছিলাম। এবং শুধুই কেঁদেছিলাম। অনর্গল চোখের জলে মুখ বুক ভেসে গিয়েছিল। সে পাওয়ার আনন্দ পুলক অপূর্ব অপরূপ, প্রতিটি রোমকূপ শিহরণে শিহরণে সে আনন্দ আস্বাদন করেছিল, তার স্মৃতি আজও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

আকাশের চাঁদ মাথার কাছে এল প্রায়। দক্ষিণে পূর্বে ঢালু জমি

চলে গিয়েছে নদীর কূল পর্যন্ত; নদীর ওপারে গ্রাম বনরেখা, পশ্চিমেও উঁচু প্রান্তর, প্রান্তরের মধ্যে সেই উদাসী পুকুর। পুকুরের পাড়ের উপর সারি সারি তালগাছ। দুধ সাগরের মতো জ্যোৎস্নার বন্যা বয়ে যাচ্ছে এই সবের উপর দিয়ে। সব মনে রয়েছে। সব স্পষ্ট। তার মধ্যে এই অনুভূতিও স্পষ্ট।

জীবন এবং মৃত্যুতে যেন একাকার। সেতু বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সেই সেতুর মুখে বসে ছিলাম আমি। সেতু বেয়ে যেন এসেছিল বুলু। মহা বিচিত্র যেন তুলে দিলে তার যবনিকা।

কতক্ষণ? অন্তত তখন এগারোটা। এসে ডাকলে যেন কে। বোধ হয় শচী। শচী বলে একজন চাকর ছিল। সে এবং আরও একজন— অমর। আমাদের বাড়ীতে থাকত, বাড়িতে খেয়ে ইস্কুলে পড়ত। তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই বাড়ী ফিরে এলাম। তারই মধ্যেই খেলাম। শুলাম। অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠলাম। মনে হয় এমন প্রসন্ন জীবন দীর্ঘকাল আমি পাইনি। জীবনের ক্ষোভ অভিমান শোক শান্ত হয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে, জুড়িয়ে গেছে। বুলু যেন হারায়নি। কেউ যেন কখনও আমাকে দুঃখ দেয়নি। এমনি প্রসন্ন জীবন। ফুলেভরা বাগানের মতো আনন্দে তৃপ্তিতে ঝলমল মন।

এমন পাওয়া কখনও আমি পাইনি।

সেদিন সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন— কাল শ্মশানে যাও নি তো বাবা?

—না।

—আনন্দে রহো। খুশী হয়েছি। ভাল করেছ। কাল গেলে— তুমি হয়তো ভয় পেতে।

—ভয় পেতাম? বিস্মিত হলাম।

—হ্যাঁ বাবা। ওখানেই তো তোমার কন্যার শেষকৃত্য হয়েছে। পূর্ণিমা গিয়েছে কাল। হয়তো গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্না দেখে মনে হ'ত কন্যা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেতে। বাবা—মৃত মানুষ

—হোক পরম প্রিয়জন—তাকে হঠাৎ দেখলে—মানুষ ভয় পায়। না পেলে—কাছে গিয়ে দেখতে কন্যা নয়—ছায়া। দুঃখ বাড়ত। ভাল করেছ। ও নিয়ে দুঃখ আর ক'রো না।

অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললাম—না, দুঃখ আমার আর নাই!

--রাম—রাম! সীতারাম। সীতারাম।

৫

এরও অনেক দিন পর তিনি আমাকে বলেছিলেন—বাবা, সেদিন শ্মশানে গেলে তোমার ভয় পাওয়ারই কথা ছিল। ভয় যদি নাও পেতে—তবে শ্মশানের আকর্ষণ তোমার বাড়ত। তার অনিবার্য পরিণতি ছিল সন্ন্যাসী হয়ে যেতে তুমি। কিন্তু তাতেও তো তোমার কাজ হ'ত না। তাই বারণ করেছিলাম।

এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওই ঘটনার পরও কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে এসে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে যে আস্বাদন পেয়েছিলাম—সে আস্বাদন অমৃতের। আমার যে কন্যার শোকে আমি প্রায় উদাসী হয়ে উঠেছিলাম, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব এবং রহস্য অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা শ্মশানে কাটিয়ে এসেছি অথচ কোনো সন্ধানই পাইনি, যে অবস্থাটাকে বলতে পারি শোকাচ্ছন্নতা শাস্ত্রমতে যা নাকি মূঢ়তার সামিল—তাই থেকে মুক্তি পেলাম—এক পূর্ণিমা রাত্রের অমৃত আস্বাদনে। কেমন ক'রে হয়েছিল তা জানি না তবে হয়েছিল। হয়তো বা সবটাই মনের খেলা, ভ্রান্তি। সেদিন ঐ সন্ন্যাসীর মতো এক মহিমময় পুরুষ আমার কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন—আমাকে মহৎ বলে স্বীকার করেছিলেন, আমার অহং পরিতৃপ্ত হয়েছিল, সেই কারণেই হয়তো সেদিন এমন তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করেছিলাম, এবং সেই পরিতৃপ্তির মাদকতার মধ্যেই কন্যাশোক বিস্মৃত হয়েছিলাম

এমনও হ'তে পারে, অন্তত কেউ যদি এমন ব্যাখ্যাই করেন তাতে বাদ প্রতিবাদ করব না, এমন কি বিজ্ঞভাবে বলব না—There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, তার সঙ্গে যোগ করে দেবো and science, এ ক্ষেত্রে আমার একমাত্র বক্তব্য হ'ল—ছলনা হোক—ভ্রান্তি হোক—আমার সেদিনের আনন্দ সত্য, অমৃতের আস্বাদন-স্মৃতি আমার কাছে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এর পর আমার ভাগ্যে আরও তিনটি সন্তানবিয়োগ ঘটেছে—কিন্তু তাতে আমাকে আর এমনভাবে অভিভূত করতে পারেনি।

শেষ সন্তানবিয়োগ ঘটে, বোধ করি ১৯৩৮ সালের পূজার পরই কোজাগরী পূর্ণিমা বা তার পরদিন; বেলা এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় ছেলেটি মারা যায়—সৎকার ইত্যাদি শেষ হ'তে বেলা আড়াইটে বেজে গেল, চারটে নাগাদ বন্ধু বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে ডেকে নিয়ে গেলেন—চল বেড়াতে যাই। হেসেই বললাম—চল। বেরিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি এসেছি—দেখা হ'ল স্টেশনের রাজা মিয়ার সঙ্গে; রাজা মিয়া স্টেশনের একমাত্র হাতে-কলমে কাজ করবার লোক; সিগন্যাল টানে—তোলে, লাইন ক্লিয়ার দেয়, বাতি জ্বালে, তেল পোরে, আবার টেলিগ্রাম এলে তাও বিলি ক'রে আসে। রাজা মিয়া আমায় সেলাম করে একখানি টেলিগ্রাম হাতে দিলে। টেলিগ্রাম করেছেন—আমাদের নলিনীদা, হাস্যরসিক—রসরচনায় সিদ্ধহস্ত—গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার। "কাজী নজরুল এবং আমি আজই রাত্রে তোমার ওখানে যাচ্ছি।"

হেসেই বাড়ি ফিরেছিলাম বন্দোবস্ত করবার জন্য। বন্দোবস্ত ক'রে রান্না করিয়ে রাত্রে স্টেশনে গেলাম। কাজী আর নলিনীদা নামলেন, প্রসন্ন মুখেই অভ্যর্থনা জানালাম। তাঁরাও আমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেই হঠাৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—কাজীই বলেছিলেন—যাক্, বাঁচলাম। ছেলেটি তা হলে ভাল আছে।

ছেলের অসুখের সংবাদ তাঁরা কলকাতায় সজনীকান্ত এবং সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েই গিয়েছিলেন—কিন্তু এমন সময় পেয়েছিলেন যে, তাঁদের প্রোগ্রাম পাল্টাবার সময় ছিল না। কাজী ওখানে গিয়েছিলেন বাতের ঔষধের জন্য। তাঁর স্ত্রী কঠিন বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু, (আজও তিনি পঙ্গু) তখন প্রায় বৎসর কয়েকই চলে গেছে, কোনো চিকিৎসাতেই কোনো উপকার হয়নি, কলকাতার কোনো বড় চিকিৎসক বাদ যাননি ; এ্যালোপ্যাথি, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি—হেকিমী তারও কোনোটা বাদ পড়েনি—শেষে দৈব ঔষধে ভরসা করেছেন—এবং বেলের ধর্মরাজের ওখানকার বাতের ঔষধ সংগ্রহের জন্য আমার ওখানে গেছেন। আমাদের ওখানের সম্পর্কে কাজীর ধারণা খুব ভাল নয়, বলতেন—গোকর্ণের কাছাকাছি ও অঞ্চল সবটাই গোকর্ণ—ওখানে কে কার মেসো ? কবি বলে সমাদরের কোনো সম্ভাবনা নেই। তার কারণ আছে—সে থাক। তার উল্লেখে সুর কাটবে। যে কথাটা বলতে চাইছিলাম—সেটা হ'ল এই, একেবারে প্রায় যাওয়ার ঠিক আগেই খবরটা পেয়ে—তাঁরা যাওয়া স্থগিত রাখতে পারেননি, মনে মনে সন্তানটির আরোগ্য কামনা করেছিলেন, আর ভেবেছিলেন— নেহাত যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে—তবে তাঁরা আমাকে বলবেন, ডাকবাংলায় ব্যবস্থা করে দিতে। স্টেশনে নেমে আমার সঙ্গে কথা বলে আমার কথাবার্তায় কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য না ক'রে, সহাস্য মুখেই তাঁদের অভ্যর্থনা করতে দেখে তাঁরা ভেবেছিলেন ছেলেটি ভাল আছে।

এইটুকু আমার ওই অমৃত আস্বাদনের ফল বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাই বলছি—ভ্রান্তিই হোক, মিথ্যাই হোক, ছলনাই হোক, তার মধ্য থেকেই যা পেয়েছি তার প্রভাব মিথ্যা নয়। শোকে উদাসীন অবশ্যই হই। কিন্তু মুহ্যমানতা থেকে আত্মসম্বরণের শক্তি ওই থেকেই আমি পেয়েছি। এই ছাড়াও কিছুদিনের জন্য এই জ্ঞানযোগীটিকে পেয়েছিলাম নিবিড়ভাবে।

এই পাওয়ার মধ্যে একটি কথা বুঝেছিলাম। বলেছিলেন তিনিই। নানা কথার মধ্যে মহাত্মার কথা রবীন্দ্রনাথের কথাও হয়েছে, বড় বড় মহাপুরুষের কথাও হয়েছে, এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, দেখো ভাই, এই সব মানুষের ভিতর ভগবানের লীলার প্রকাশ হয়। খুব বড় বন দেখেছ? দেখনি? দেখো ভাই, অরণ্য দেখে এসো। এক-একটি গাছ দেখবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তার ফুল দেখো, ফল দেখো, একেবারে সমারোহ। ভগবানের মহিমার সেও প্রকাশ। মানুষের ভিতর তার প্রকাশ আলাদা। সে প্রকাশ হ'ল মহিমার প্রকাশ। সব মানুষের মধ্যেই চলছে সেই প্রকাশ; যে শক্তিকে তুমি অন্ধকারের পথে চালাও—সে হবে, হতে চাইবে অজগর; আবার আলোর পথে চালাও, সে হবে ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কৈলাস।

এমনি একটি মহিমার প্রকাশ তাঁর মধ্যেও ছিল।

তিনি বলেছিলেন—ভাই, বনে যাই, নির্জনে নিজের অন্তরের মধ্যে মহিমাকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিতে। এই সংসারের ঘটনার আকর্ষণ থেকে বাঁচিযে রাখতে নিজেকে। ভাই, যে ঘটনায় তুমি নিজেকে জড়াবে তার ফল তার ক্রিয়া তোমার ভিতরে হতেই হবে। বৃক্ষের বীজ, জীবনের বীজও নিষ্ফলা হয় কিন্তু কর্মের বীজ অমোঘ। তার অঙ্কুর উদ্গত হবেই, সেই পাতা মেলবে, ফুল হবে ফল হবে। বিষবৃক্ষের বীজ হয়, তার ফল তোমার মধ্যে তোমার বংশের মধ্যে ফলবেই। সেই তো ভাই, সেই জন্যেই তো সাধন দরকার। তুমি সৎকর্মের সাধন করো, তোমর বংশের মধ্যে থাকবে তার পুণ্য। তুমি ভয়ঙ্করের সাধন করো, তোমার বংশের মধ্যে থাকবে তার খেলা। কর্ম হারায় না ভাই।

এই কথাটি আমি পদচিহ্নের মধ্যে এক সন্ন্যাসী চরিত্রের মুখ দিয়া বলেছি। তিনি বলেছেন কর্ম হারায় না বাবা, কর্মের শেষ কর্মফলেই নয়, তার ফলেও ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেও দেয় ফল, তাতে হয় নূতন ক্রিয়া; আর যে কর্ম তুমি কর তার মূল উদ্ভবও আজ নয়, পিছনে খুঁজলে পাবে শত সহস্র বৎসরের কর্মের পর কর্ম। তাই

তো আমরা জন্ম-জন্মান্তরে কর্মসূত্রে গাঁথা। সেই জন্যই তো কর্ম থেকে মুক্তিই নির্বাণের সিংহদ্বার। কিন্তু কর্মরোধ তো বাসনা অন্তরে থাকতে হয় না। বাসনা অন্তরে থাকতে কর্মরোধ আলস্য।
সন্ন্যাসী আমাকে বলেছেন—শক্তির প্রকাশ আলোয় অন্ধকারে, সত্ত ভাবে সাধনা কর ভাই—জীবনে সূর্যোদয় হবে, তম ভাবে সাধনা কর অন্ধকার নামে। বনের জানোয়ার বাঘ ভাল্লুক অজগর এদের কর্ম-সাধনার প্রশস্ত কাল তাই রাত্রি। মানুষের জগতেও সেই খেলা, সেই লীলা চলছে অহরহ। আলোর সাধনা করতে করতে মতিভ্রমে একটি পাপ কর—অন্ধকারকে বারেকের জন্য আশ্রয় কর—দেখবে ওই হয়ে গেল—গ্রহণ লাগল, ওই রাহু তোমার জীবনে অধিকার পেয়ে গেল। দেখবে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ রাহু হাঁ করে এসে তোমার সূর্য চন্দ্রকে গিলবে। এ থেকে মুক্তি বড় কঠিন। ওই গ্রহণ যে লাগে সে শুধু তোমার কর্মহেতুই নয়—কেন ভূতকালে তোমরা কোনো পূর্বপুরুষ কোনো কর্ম করেছিল তার সঙ্গে তোমার ওই কর্ম করার যোগ আছে। তাই তো ভাই, যে মানুষ জীবনে আলোর সাধনা করে তাকে বলে কুলপ্রদীপ, আর যে অন্ধকারের সাধনা করে তাকে বলে—কুলাঙ্গার—অঙ্গার তো কালো ভাই।

বোধ করি তিন চার বৎসর তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছে, এমনি ধরনের অনেক কথা তার কাছে শুনেছি। দেখেছি তাঁর মধ্যে এক জ্যোতির্ময়ের প্রকাশের আভাস।
তাকে আমি তন্ত্র-সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম
তিনি নিজে ছিলেন যোগী এবং সাধনা ছিল একেবারে বৈদিক। শুদ্ধতার শুচিতার সাধনা। কোনো অলৌকিক শক্তিলাভের জন্য ব্যগ্রতা তাঁর ছিল না। যে শক্তি তার মধ্যে দেখেছি তা তার বার্ধক্য এবং জরা-জয়ের মধ্যে দেহের সক্ষমতার দীপ্তিতে এবং চিত্তের দৃঢ়তায়, মাধুর্যে, তেজস্বিতায় প্রকাশমান দেখছি।

॥ তৃতীয় পর্ব ।

১

তন্ত্রের কথায় তিনি বলেছিলেন, একটু হেসেই বলেছিলেন—এ দেশ তো তোমাদের ভাই তান্ত্রিকের দেশ। সবাই দেখি তান্ত্রিক। মহাপাঠে যায়, ছিলেমের পর ছিলেম গাঞ্জা খায়। মদ খায়। মুখে অশ্লীল কথা বলে, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা পরে। কেউ কেউ রুদ্রাক্ষের মালা ভি পরে—আর তারা তারা কালী কালী বলে চীৎকার করে। তোমারও দেখি তন্ত্রে টান রয়েছে। থাকবারই কথা তাই। দেশের প্রভাব, তোমাদের বংশের প্রভাব—ওই ভাই কর্মের জের। তন্ত্র বড় কঠিন কথা ভাই। সব সে সিধা পথ—আর সব সে কঠিন পথ। মনে ভেবে নাও ভাই, অমাবস্যার রাত্রি—এমন অমাবস্যা যে আকাশে নক্ষত্র পর্যন্ত নাই, অগ্নি নাই, এই অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে জ্যোতিকে ফুটাতে হবে। সূর্য চন্দ্রের জ্যোতি নয়, কালোর মধ্যে যে আলো আছে জ্যোতি আছে সেই জ্যোতি। কালোর মধ্যে আলোর সন্ধান কি সহজ রে ভাই? তা হ'লে তো জন্তু জানোয়ার চোর ডাকাত সাপ খোপ সবাই সিদ্ধ হ'ত রে দাদা। ও অন্ধকারের মধ্যে আসন করে বসলেই অন্ধকারের নেশায় পেয়ে বসে। দেখ না ভাই, আলোর সাধনা যারা করে—তাদের আলোর নেশা কেমন? সূরয দেবতার আলো সে জানালা এঁটে রোধ করে ঘরের মধ্যে বিজলী বাতি ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে বসে থাকে। মহাশক্তি যখন অন্ধকারের মধ্যে লীলা করে তখন তার মতো হিংস্র, তার মতো ভয়ঙ্কর, তার মতো উন্মাদিনী আর কিছু নাই, হয় না, কল্পনা করতে পারে না। ও পথ তোমার নয় রে ভাই। তুমি নিজে একটা পথ ধরে নিয়েছ আর ওপথের দিকে তাকিয়ো না। ভাই, তোমাকে আমি শ্মশানে যেতে বারণ করেছিলাম। মনের ক্ষুধা তোমার বড় প্রবল—সেই ক্ষুধার টানে ওই দিকে পা বাড়ালে ওই সুধা—ওই সুধা ব'লে

তুমি ছুটতেই, সন্ন্যাসী হয়ে যেতেই, অথচ আঁধার তোমার সহ্য হ'ত না, পাগল হয়ে যেতে নয় তো আঁধারের নেশায় হয়ে যেতে বাঘ কি সাপের মতো জীব। চৈতন্য হারিয়ে যেত ; জীবন ডুবে যেত তান্ত্রিক ভোগের মধ্যে, জীবজন্তু বনে যেতে। জীবজন্তুর মতই মানুষও বড় অসহায় রে ভাই। মনে হয় তাদের চেয়েও মানুষের দুঃখ বেশী। জীবজন্তুর ভিতর মহাশক্তি পাগল খেলা আছে। লড়াই নাই! মানুষের ভিতর আছে লড়াই। মহাশক্তি যে কী উন্মত্ত খেলা খেলে তাদের মধ্যে—আঃ—তা থৈ তা থৈ নাচনরে দাদা! কত ঋষি কত মুনি কত সাধক কোটী কোটী বরষ ধ'রে কত তপ কত হোম কত যজ্ঞ করে, অজ্ঞান তামসীর মধ্যে থেকে চৈতন্য শূন্যতার অন্ধকারের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলে চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ সত্তাকে মানুষের মধ্যে তিনিই আত্মা ; আদিত্যবর্ণ পুরুষ মহাশক্তি তাকে অহরহ অবসন্ন করে দিতে চাইছে। পাপ পুণ্য ওসব কথা বাদ দাও ভাই। আসল লড়াই ওইখানে। ওই চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ পুরুষের সঙ্গে তমিস্রা রূপিণী মহাশক্তির। দেখ না ভাই, আকাশে তাকিয়ে—যেখানেই মহাশূন্যে মহাতমিস্রার মধ্যে সৃষ্টি, সেইখানেই দেখতে পাবে দীপ্তির স্ফুরণ আদিত্যবর্ণ বিন্দু ছটা—পৃথিবীতে জীবনকে আশ্রয় করে সে সৃষ্টি ফুটেছে জীবদেহের মধ্যে ; উদ্ভিদের মধ্যে ; উদ্ভিদে তার জ্যোতি পুষ্পে ফলে। জীবদেহে জ্যোতি রূপে এবং সেখানে তার প্রকাশ আরও স্পষ্ট চেতনায়, তারপর চৈতন্যে। চৈতন্যের মধ্যেই আছে সেই জ্যোতি। এই পৃথিবীর সৃষ্টি ধ্বংস হবার আগে মানুষ যদি চৈতন্যময় পুরুষকে অমর করতে পারে—তবে তো ভাই মানুষের তন্ত্রসাধন হ'ল সার্থক। ভাইরে কালীকে হতে হবে মহালক্ষ্মী-তা হ'লে তো শুধু এই পৃথিবী নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁচল, পেয়ে গেল পরম অবস্থা। নইলে চলল খেলা! চলল! কাল অনন্ত—কালীর নাচন অবিরাম! তা থৈ—তা থৈ—তা থৈ—তা থৈ! আদিত্যবর্ণ পুরুষ তারই মধ্যে কখনও তাদেরই মধ্যে মিশে যাচ্ছেন, ঘুমিয়ে পড়ছেন কি গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো কালীর কুক্ষিগত হচ্ছেন—আবার কখনও

জাগছেন কি জন্ম নিচ্ছেন কালীর কুক্ষি থে:ক—আর কালী জন্তু-মাতার মতো তাকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছেন ; লাগছে লড়াই আবার। তাঁর সকল কথা ঠিক প্রকাশ করতে পারলাম কি না নিজে ঠিক বুঝতে পারছি না আজ। তবে তাব কাছে শোনা কথাগুলি আমার মনের ভাবনার বৃক্ষে এই ভাব পুষ্পের রূপেই বিকশিভ হয়েছে—তাই বললাম।

জীবনে বিচিত্র প্রত্যঙ্গের বা অনুভবের কথাবস্তের প্রথমেই আমি লিখেছি এই ষড়ৈশ্বর্যশালিনী বিশ্ব-পৃথিবীতে অনন্ত রূপ রহস্যের নিরন্তর যে বিচিত্রের আত্মপ্রকাশ চলেছে তার ভিতরে মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশ আমাকে আকৃষ্ট করে বেশী। একটি পুষ্পিত বৃক্ষ অথবা কোটী কোটী কীট-পতঙ্গের ঐক্যতান-মুখরিত অথচ মহাশূন্যের মতো স্তব্ধ শান্ত গভীর অরণ্যের মধ্যে বা মহাতরঙ্গের মতো লীলায়িত মহিমায় বহু যোজন বিস্তারি পাবত্য প্রদেশের মহিমার মধ্যে যে বিচিত্রের আকর্ষণ অন্যে আকর্ষণ করেন আমি ঠিক তেমনিভাবেই বিচিত্রের আকর্ষণ অনুভব করি জনারণ্যের মধ্যে। একথা আমি আগেই বলেছি।

মানুষের মধ্যে তার .সই এক প্রকাশের কথাই এবার বলব। এবং ওই সন্ন্যাসী আমাকে .য কথাগুলি বলেছিলেন—তারই প্রভাবে আমি একে দেখেছি। আমার কাছে বিচিত্রের এক বিস্ময়কর প্রকাশ বলে প্রতিভাত হয়েছে। অন্যের কাছে হয়তো তা মনে না হতে পারে ; হয়তো শুধ একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা বলেই মনে হবে কিন্তু আমি বিচিত্রের সন্ধান এরই মধ্যে পেয়েছি।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—যে ঘটনা ঘটে সে সুন্দরই হোক, কল্যাণ-করই হোক আর ভয়ঙ্কর অকল্যাণকরই হোক—তার মূল আছে ভূত কালে, পরিণতি আছে ভবিষ্যতে—অর্থাৎ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কর্মের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারই মধ্যে চলেছে ওই উন্মাদিনী কালীরূপিণী মহাশক্তি ও চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ পুরুষের দ্বন্দ্ব। একবার অন্ধকারকে আশ্রয় করলে আর নিস্তার নাই,

বার বার সে রাহুর মতো আসবে, গ্রাস করবে জীবনের জ্যোতির্ময়কে। জ্যোতির্ময় মুক্তি পাবেন কিন্তু আবার আসবে রাহু তাঁকে গ্রাস করতে; আবার অসহায়ের মতো তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরই মধ্যে কত মানুষ কত মানুষের বংশধারা আকাশের মতো নক্ষত্রের মতো নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে; আবার কত নীহারিকা ক্রমে দ্যুতিমান হয়ে উঠছে বাষ্পময় অবস্থা থেকে।

আজ থেকে, সাতচল্লিশ বৎসর আগে। ১৯০৬ সালের মে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের লাভপুরে। আমার বয়স তখন আট বৎসর।
একটি খুন হয়ে গেল লাভপুরে। ডাকাতির সঙ্গে খুন। একেবারে লাভপুর থানার সামনে একশো ফুটের মধ্যে। এই পঞ্চাশ গজ স্থান একেবারে খোলা—কোথাও কোনো বাধা বন্ধ নাই। চৌরঙ্গী রোডে মেট্রো সিনেমার সামনে এসপ্ল্যানেডের ময়দানের মধ্যে কয়েকটা ছোট গাছ আছে, একটা লোহার রেলিং আছে, এখানে তাও নেই। থানার বারান্দার পরেই খোলা খানিকটা জায়গা, তারপর বিশ ফুট রাস্তা, রাস্তার উপরেই পাশাপাশি তিনখানি বাড়ি। তিনখানি বাড়িরই সামনে এক-একটি বাঁশের খুঁটি দেওয়া খড়ো চাল বারান্দা—আমাদের দেশে বলে পিঁড়ে। তিনখানা বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান 'পানিপাতনের' জায়গার অর্থাৎ খড়ের চালের জল পড়বার জায়গার। ও দেশে পানিপাতনের জায়গার পরিমাণ নির্দিষ্ট পাঁচ পোয়া অর্থাৎ এক হাত ও এক হাতের সিকি—বিশ ইঞ্চি হাতের মাপে পঁচিশ ইঞ্চি, প্রত্যেক ঘর তৈরীর সময় এই জায়গাটা চালের জল পড়বার জন্য ফেলে রেখে বনিয়াদ পত্তন করতে হয়। কেউ কেউ সাত পোয়াও রেখে থাকেন। এই হিসাবে প্রতি বাড়ী ও বারান্দা থেকে অন্য বাড়ী ও বারান্দার ব্যবধান পঞ্চাশ ইঞ্চি থেকে সত্তর ইঞ্চি—সওয়া চার ফুট থেকে কিছু-কম ছ'ফুট পর্যন্ত; তার বেশী নয়।
তিনটি বারান্দাতে তিনটি বাড়ীর গৃহকর্তা তক্তাপোষের উপর

শুয়ে থাকেন। সামনে থানা। ভরা বাজারের একেবারে মধ্যস্থলে সদর রাস্তার উপর; সেই রাস্তায় ভোর তিনটে থেকে রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্ত দশ মিনিট পনরো মিনিট অন্তর গরুর গাড়ী চলে; ওদিকে মুরশিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা থেকে এদিকে দুম্‌কা পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তা; এদিক থেকে আসে মাষকলাই, ছোলা, মসুর, লঙ্কা, কুমড়ো, পেঁয়াজ, নানা রবি ফসল এবং ওই অঞ্চলের ধান চাল এই পথ ধরে যায় আমদপুর পর্যন্ত; ওদিক থেকে মাল আসে নটকোণের, আমদপুর স্টেশনের, আর আসে দুম্‌কা থেকে শালপাতা, শালের কাঠ, কাঠের তৈরী জিনিস, গাড়ীর চাকা, জানালা দরজা ইত্যাদি। সুতরাং বারোটা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত তিন চার ঘণ্টা রাস্তা জনহীন হয়। কিন্তু একশো ফুট দূরে সামনে থানা রয়েছে। সুতরাং চোর-ডাকাতের ভয় আদৌ কেউ করত না। আর একটু আছে। লাভপুরে এর আগে গত তিনশো বছরের মধ্যে কখনও ডাকাতি হয়েছে বলে কেউ শোনেনি।

দুশো তিনশো কি তারও আগের একটি কাহিনী প্রবাদের মতো প্রচলিত ছিল—তাও ভয়ের কথা নয়, ভরসার কথা। লাভপুরের একমুখে মা ফুল্লরা আছেন—তাঁর স্থান অতিক্রম করে একদল ডাকাত লাভপুর প্রবেশ করতে গিয়ে নাকি সকলেই অন্ধ হয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বসেছিল।

এই পাশাপাশি তিনটি বাড়ী এবং বারান্দার পূর্ব দিকেরটির মালিক হ'ল এক মোদক, মাঝেরটির মালিক—দত্ত, পশ্চিম দিকেরটির মালিক হ'ল এক প্রামাণিক - সেও জাতিতে গন্ধবণিক—দত্তের স্বজাতি এবং কুটুম্ব, দত্তের দৌহিত্রীর সঙ্গে প্রামাণিকের এক ছেলের বিয়ে হয়েছিল—ছেলের বয়স আট দশ কি বারো—মেয়ের বয়স তিন। মোদকের মিষ্টান্নের দোকান, পাড়াগাঁয়ে মিষ্টান্ন খুব বেশী কাটে না, কাটে মুড়ি মুড়কি পাটালি বাতাসা, পূজার্চনার জন্য মণ্ডা, এর উপর জিলিপি এবং রসগোল্লা, বাসী তেবাসী হয়ে দোকানে সাজানো থাকে।

মাঝের ওই দত্তের সামান্য নূন তেলের দোকান—সেটা গৌণ এবং নেহাৎ বসে থাকতে হবে, সময় কাটবে না ব'লে করা—নইলে দত্তের আসল কারবার গহনা বন্ধক রাখবার; মোটা সুদে, নির্দিষ্ট সময়ের ওয়াদা রেখে টাকা দেয়; সময়ের মধ্যে টাকা শোধ না হলে গহনা সে গালিয়ে দেয়। কারবার অনেক টাকার।

প্রামাণিকের দোকান নটকোণের। ঝাল মসলা নূন তেল—বেনেতীর দোকান।

খুন হ'ল এই মাঝের দোকানের মালিক—ওই দত্ত।

চীৎকার হ'ল না, কেউ বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলে না। থানা না, মোদক না, সকালে দেখা গেল আধখানা গলা কাটা অবস্থায় দত্ত বারান্দায় তক্তাপোষ থেকে গড়িয়ে সদর রাস্তার উপর পড়ে আছে, দেওয়ালে ফোয়ারার ধারার মতো রক্তের ছিটে লেগেছে, পথের ধুলো জমাট বেঁধে রয়েছে।

গ্রামখানি চঞ্চল চকিত হয়ে উঠল। আমি সেদিন সকালবেলা বাড়ীর লোককে লুকিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম এই খুন দেখতে। খুন—খুন—শব্দটা শুনেছিলাম। উচ্চারণের ভঙ্গিতে বর্ণনার ধারায় মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করত। সেই আতঙ্কের আকর্ষণেই সেদিন গিয়েছিলাম। জীবহত্যা এর আগে দেখেছি। পাঁঠা মহিষ মেষ কাটতে দেখেছি, ছিন্নমস্তক জীবগুলির কবন্ধ নেড়েছি, রক্তের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করেছি। গুলি করে মারা পাখী কুকুর দেখেছি। কিন্তু ছিন্নকণ্ঠ মানুষ সেই প্রথম দেখলাম। সে কী ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্করকে চোখে ক'জন দেখে? এমনই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মধ্যেই তার অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করে মানুষ। আমার সেদিন মনে হয়েছিল গভীর রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে যারা হত্যা করেছিল বা যে হত্যা করেছিল তাদের মূর্তি কল্পনা করতে গিয়ে মনশ্চক্ষে ভয়ঙ্করকে দেখেছিলাম; দেখেছিলাম তাদের অবয়ব আকার মানুষের মতো হলেও সেই অবয়ব ও আকার সর্বাঙ্গে—দৃষ্টিতে অধরোষ্ঠে ঈষৎ প্রকাশিত কয়েকটি দাঁতের ভঙ্গিমায়, তাদের হাতের মুঠির নিষ্ঠুর কাঠিন্যে—নিষ্ঠুরতায় হিংস্রতায়

এমন একটি আতঙ্ককর আকৃতি দান করেছে যে তার রূপ আর মানুষের রূপ নাই—সে রূপ মহাভয়ঙ্করের রূপ। কত রাত্রি যে ঘুমাতে পারিনি এই ঘটনার পর—তার হিসেব নাই মনে হ'ত যদি শিয়রে সে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। বনের মধ্যে গভীর রাত্রে মানুষের সামনে বাঘ বা ক্রূর নিমেষহীন দৃষ্টি অজগরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ মিল আছে। খাদ্যের লোভ ও হিংসার সঙ্গে আরও একটু কিছু আছে, যার পরিচয় পরিস্ফুট তার নিঃশব্দ পদক্ষেপে, অনুসরণে, অসতর্ক মুহূর্তের আক্রমণে, আর সঙ্গে এই হত্যাকারী মানুষের রাত্রের অন্ধকারে নিঃশব্দ আক্রমণের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ ব্যাখ্যায় এটা আত্মরক্ষার বুদ্ধির প্রেরণা। ওই সন্ন্যাসী আমাকে যেকথা বলেছিলেন—সে অনুযায়ী এর ব্যাখ্যায় আরও কিছু আছে। বাঘ সাপের বেলা সেটা কিছু অপরিস্ফুট কিন্তু মানুষের বেলা সেটা পূর্ণ পরিস্ফুট। ওই অচেতন উন্মাদিনী শক্তি তার চৈতন্যময় আদিত্যবর্ণ জ্যোতির প্রকাশকে তমসায় স্তব্ধতায় উন্মত্ততায় আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছে রাহুগ্রাসের মতো।

উনিশশো ছ সালের মে মাসে এই খুন হয়েছিল

আজ উনিশশো বাহান্ন সাল। উনিশশো বাহান্ন সালের দশই সেপ্টেম্বর পূর্ণ ছেচল্লিশ বৎসর পর আর একটি খুন হয়েছে লাভপুরেরই প্রান্তভাগে।

এরই মধ্যে সেই বিচিত্র এবার মহাতামসী ভয়ঙ্করী রূপে প্রকটিত হলেন আমার দৃষ্টির সম্মুখে। আমি তাঁকে যেন আভাসে অনুভব করলাম—হয়তো গভীর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তের কৃষ্ণ মেঘের মতো চকিত হাস্যে বিস্ফারিত দেখলাম। এবং দেখলাম—এই মহাতামসী- এই ছেচল্লিশ বৎসর ধরে একটি মানব বংশকে অনুসরণ করে আসছে—তাদের অন্তরলোকের মধ্যেই তাদের হীনবল ক্ষীণ জ্যোতি আদিত্যবর্ণ পুরুষকে রাহুর মতো গ্রাস করে আসছে।

তার আগে বলব এই দশই সেপ্টেম্বরের খুনের কথা।

এবার পরাভূত-চৈতন্য হত্যাকারী নিজেই স্বীকার করেছে পুলিশের

কাছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। একটি সতেরো-আঠারো বছরের কিশোর ওই দত্তের বাদিকের প্রতিবেশী মোদকের পৌত্র।

২

দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর কাল—অর্ধশতাব্দী কাল মানুষের জীবনে কম কাল নয়। মানুষের আয়ু শতাব্দীর সীমারেখায় পূর্ণ হলে জীবনের অর্ধেক। এ কালের মধ্যে মানুষের সাধনা সমাপ্ত হয়। এক পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষের পর্যায়ে নূতন সাধনা শুরু হয়। মাঝখানের পুরুষের সাধনার ফলে—পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের জীবনধারায় সাধনার পন্থায় অনেক পার্থক্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু আদিশক্তি তামসীরূপ ধারণ করবার হেতু পায় যে রক্তধারার মধ্যে সেখানে সে ভয়ঙ্করী আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকট করে মানবজীবনের সকল জ্যোতি সকল বিভূতিটুকু গ্রাস না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না—ক্ষান্ত হয় না। এদিক দিয়ে সে ক্ষমাহীনা, সে অমোঘা। কদাচিৎ কোনো বংশের রক্তে পূর্বকালের মহাপুণ্য সঞ্চিত থাকলে তাকে স্থির শান্ত হ'তে হয়। এক পুরুষের আকস্মিক কোনো কর্মে মহাতমসা জাগ্রত হলেও পূর্বপুরুষের সেই মহাপুণ্য পরমপুরুষকে রক্ষা করে। মহাতমসা তাকে গ্রাস না করে তাকে নিষ্কৃতি দেয়।

দত্তের হত্যায় যে ভয়ঙ্করী মহাতামসী জাগ্রত হয়েছিল সে-ই আমার দৃঢ় ধারণা— সেই আঠারো বছরের একটি কিশোরকে উন্মত্ত ক'রে তুললে। সে কিশোর মোদকের পৌত্র এবং ওই মোদকের পরিবারে দত্তের হত্যার পর বহু বিপর্যয় ঘটেছিল। সেকথা পরে আসবে। শুধু একটি কথা বলব—মোদক এর পর বৈষ্ণব সাম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল; জন্মগত জাতি পরিত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী জীবে দয়া নামে প্রেমকেই করে তুলতে চেয়েছিল জীবনের তপস্যা। বলতে পারি না—তবু মনে হয়, সে বোধ হয় এর প্রয়োজন অনুভব করেছিল—মহাতামসীর আভাস সে যেন অনুভব করেছিল

সূর্যাস্তকালে প্রান্তরচারী একক পথিকের মতো অনুভব করেছিল—তাকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে নেমে আসছে রাত্রির অন্ধকারের মতো ওই তামসী। তাই সে নিয়েছিল এই মন্ত্র, এই দীক্ষা। মোদকের ছোটছেলে মাধু। মাধুও বৈষ্ণব। তার জীবনে ওই দ্বন্দ্ব। একদিকে জ্যোতির সাধনা—অন্যদিকে তমসার আক্রমণ। এমন সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। মাধুর জীবনের এই দ্বন্দ্ব আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাকে নিয়ে লিখেছি 'তামস তপস্যা' উপন্যাস। তামস তপস্যার শেষটা ছিল কল্পনা। মানুষ যা চায়—যে পরিণাম কাম্য কল্যাণকর তাই কল্পনা করে আমিও তাই করেছিলাম। ভাবতে পারিনি অনিবার্য মহাপরিণাম। গত দশই সেপ্টেম্বর সেই পরিণাম ঘটল।

ওই মোদকের ছোট ছেলে মাধু বৈষ্ণব—তার ছেলে দুলাল দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব। নিকষের মতো কালো কিন্তু সে কালো রঙে আছে যেন এক প্রসন্ন লাবণ্য; পাতলা ছিপছিপে শরীর—সরল তেজালো কচি বাঁশের মতো লম্বাটে; ষোলো-সতেরো বছর বয়স—দুর্লভ মুখশ্রী এবং দেহশ্রী। ছোট কপাল আয়ত চোখ, বাঁশীর মতো নাক, পাতলা দুটি ঠোঁট, সুন্দর সুগঠিত দাঁতের সারি, এমন সুন্দর কালো মানুষ কদাচিত চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়—ওই কালো ছেলেটির কণ্ঠস্বর সুন্দর, প্রসন্ন, মিষ্ট—কাজকর্ম সুন্দর—পরিচ্ছন্ন নিখুঁত—সবচেয়ে সুন্দর ছিল হাসি এবং বিষণ্ণতা; হাসলে বড় ভাল লাগত, তিরস্কারে বিষণ্ণ হ'ত, এক মুহূর্তে যেন কচি লতার ছেঁড়া ডগার মতো ভেঙে পড়ত, তিরস্কারকারীর মনও বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। আবার ডেকে একটি স্নেহের কথা বললেই সে হেসে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

এই দুলাল দাস; সেই মোদকের পৌত্র—মাধুর ছোট ছেলে। বছর-খানেক আগে সে এল আমার কলকাতার বাড়ীতে। চাকরি করবে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। মাধুর বিয়ে তিনটি কি চারটি দুলালের মা নেই। তার মায়ের মৃত্যুর পর মাধু অনেকদিন বিয়ে করেনি, দুলালই ছিল আনন্দদুলাল; আগেকার স্ত্রীপুত্রদের পৃথক

করে দিয়ে দুলালকে নিয়েই ঘর বেঁধেছিল স্বতন্ত্রভাবে। তারপর আবার মাধু হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসেছে। দুলালের বয়স তখন বছর বারো। এখন দুলালের বয়স ষোলো। এখন আর নন্দর সঙ্গে বাপ-মায়ের বনছে না। বাপ দুর্দান্ত ক্রোধী। সে ক্রোধ আমার ধারণায় সেই মহাতমসারই ভ্রূকুটি। দুলালেরও দুরন্ত ক্ষোভ। সেই ক্ষোভে সে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। মাধু অবিচার করেনি, সে তার সম্পত্তি বাড়ী-ঘর ছেলেদের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে—ছেলেদের এক এক ভাগ দিয়ে নিজে এক ভাগ মাত্র নিয়েই নূতন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে স্বতন্ত্রভাবে। বিক্ষুব্ধ দুলাল সে সম্পত্তি, সে ঘর ফেলেই চলে এসেছে। দুলালের বিয়েও দিয়ে দিয়েছে। বউ অবশ্য আট-ন বছরের, সে বাপের বাড়ীতেই থাকে, ছেলেটা সেখানেও যায়নি। সে খেটে খাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

চাকরি করতে করতেই সে একদিন বললে—আমি মোটর চালানো শিখব, ড্রাইভার হব, যদি—। যদি আমার বাড়ী থেকে সে একবেলা ক'রে ছুটি পায়। পুরো একবেলা নয় অবশ্য, দিনে ঘণ্টা চারেক ছুটি। খাওয়া-দাওয়ার পর—দুটো থেকে ছ'টা।

আমি খুশী হয়ে মত দিলাম। বেশ তো—তাই যাবি।

আমার কাছেই তার মাইনের টাকা জমা ছিল—বোধ করি একশো কত টাকা, সে টাকাটা চাইলে—যে গ্যারেজে ড্রাইভিং শিখবে তাদের লাগবে। তাও নিয়ে গেল। কাজ শিখতে লাগল। মাস তিনেক পর হঠাৎ আমার গ্যারেজে চুরি হ'ল। আমার ড্রাইভার, সেও আমার দেশের লোক, ওই দুলালের মতই এসেছিল চাকরের কাজ নিয়ে—তারপর ড্রাইভিং শিখেছে; সে তখন ছুটিতে ছিল দেশে; একজন অস্থায়ী লোক কাজ করছিল তখন। চুরিটা হ'ল আমার স্থায়ী ড্রাইভার ফিরে আসবার দিন তিনেক আগে। তারপর ড্রাইভার ফিরল এবং মাস দেড়েক পর আবার চুরি হ'ল। এবং মধ্যে মধ্যে এটা ওটা হারাতে লাগল। একটু-আধটু কল বেগড়াতে শুরু হ'ল। এবার আমার ড্রাইভার দুলালকে ধরলে। চুরির মধ্যে সে আছে এবং

গাড়ীর কল বেগড়ায় তারই নাড়াচাড়ায়। সে ড্রাইভিং শিখছে, সে-ই স্বাভাবিকভাবে নাড়েচাড়ে। এবং ঠিকমতো নাড়াচাড়া না হয়ে বেঠিক হলেই কল মাথা নাড়া দিয়ে বিগড়ে বসে।

এই নিয়েই আমি তাকে জবাব দিলাম। যা মাইনে বাকি ছিল মিটিয়ে দিয়ে বললাম - তুমি অন্যত্র যাও। এখানে আর রাখতে পারব না।

ছেলেটা বিষণ্ণ হয়ে চলে গেল। বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। ফিরল সন্ধ্যাবেলা, অস্নাত, অভুক্ত। বিষণ্ণতায়, অনাহারে, শেষ শ্রাবণ কি প্রথম ভাদ্রের রৌদ্রে ধূলায় যেন শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় স্নান করে খেলে, তারপর শুয়ে পড়ল। পরদিনও ঠিক তাই। তৃতীয় দিনে আবার তাকে ডেকে বললাম—বেশ, যেমন কাজ করছিলে কাজ কর। খুশী হয়ে উঠল।

এর ঠিক দিন-কুড়ি পর আবার একদিন গাড়ী বেগড়াল। সেদিন আর বাড়ীতে ড্রাইভারের হাতে সোজা হ'ল না। পরদিন গাড়ী গ্যারেজে গেল। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে ফিরে এসে বললে—দুলালেরই কাজ এটা। ও থাকলে গাড়ী ঠিক রাখতে পারব না আমি।

ছেলেটা চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

আমিও কিছু স্থির করতে পারলাম না। ছেলেটার উপর অবিশ্বাস আমি যেন কিছুতেই করতে পারছিলাম না। আমার সন্দেহ হচ্ছিল —এ সবের সঙ্গে দুলালের সংশ্রব ছিল না। হয়তো ড্রাইভারের অহেতুক সন্দেহ। হয়তো দুলাল ড্রাইভার হয়ে উঠলে তার সমকক্ষ হয়ে উঠবে—এমন কি তার স্থানও অধিকার করে নিতে পারে অবচেতন মনের এমনই ঈর্ষা ও আশঙ্কার তাড়নায় সে নিজে সন্দেহ করে আমাকেও সন্দেহ করাতে চেয়েছিল। সেদিনও এ কথাটা আমার মনে হয়েছিল—তাই চুপ করেই ছিলাম। পরদিন সকালে ১০ই সেপ্টেম্বর আমি কাজ করছি—হয়তো বা 'বিচিত্র' পর্যায়ের লেখাই লিখছি—হঠাৎ কানে এল মারপিটের শব্দ এবং আমার স্ত্রীর সতর্ক কণ্ঠস্বর—এ কি করছ? এ কি? ছাড় —ছাড়

দুলাল, করালী! আমি উঠে গেলাম। দেখলাম। দুলাল আর করালী (ড্রাইভার) যে ঘরে থাকে সেই ঘরে একদিকে ক্রুদ্ধ করালী দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্যদিকে দুলাল বসে কাঁদছে। আমার এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসছে—তার আয়ত সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে ভরে উঠছে এবং সে দুটি ঈষৎ রক্তাভ। আমার সামনেই সে জল চোখের কিনারা ছাপিয়ে মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে মেঝের উপর ঝরে পড়ল। ঝরতেই থাকল। গলায় একটা ক্ষতচিহ্ন। করালীর হাতের নখে চিরে গিয়েছে।

শুনলাম দুলাল গাড়ি পরিষ্কারের কাজ করতে অস্বীকার করায় ঝগড়া হয়েছে। সে বলেছে—গাড়ী খারাপ ক'রে দেওয়ার অপবাদ নিতে হচ্ছে যেখানে সেখানে ও কাজ কিছুতেই আমি করব না। এবং এই নিয়ে কথান্তরের মধ্যে ছেলেটা হঠাৎ বলেছে—তোমাকে আমি খুন করে দেবো একদিন!

করালী বলিষ্ঠ; করালী সাহসী; দুঃসাহসী। সে সহ্য করবে কেন? সে চড় মেরেছে। দুলালও আঘাত করতে গেছে কিন্তু পারেনি। করালী তার গলা টিপে ধরেছিল। সেই মুহূর্তেই আমার স্ত্রী গিয়ে পড়েছিলেন—সেই কারণেই আর অগ্রসর হতে পারেনি এ দ্বন্দ্ব।

আমার ওই কথাটাই খারাপ লাগল—খুন করে দেবো!

আমি ছেলেটাকে বললাম—তোমাকে জবাব দিলাম আমি। কুড়ি দিনের মাইনেও দিয়ে দিলাম। বললাম—তুমি চলে যাবে আজই। নইলে, তুমি যে না খেয়ে-দেয়ে ঘুরে-ফিরে আসবে—পড়ে থাকবে, আমাকে একটা কঠিন বিচারের মধ্যে ফেলবে, সে হবে না। চলে যাবে আজই। এবং স্নান করে খেয়ে তবে যাবে।

ছেলেটা আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল।

চোখের জল তখন শুকিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ উঠল—উঠে বেরিয়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছিস?

—আসছি। মৃদু অনুদ্ধত স্বরেই সে বললে। মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল।

আমার নিজের সেদিন কিছু কাজ ছিল সরকারী দপ্তরখানায়। আমার স্নান-আহারের সময় সাধারণত একটা থেকে দেড়টা। সেদিন ওই কাজের জন্যেই এগারোটায় স্নান করে খেতে বসলাম। আমার বাড়ীর খাওয়াদাওয়ার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই; ঠাকুর-চাকর থেকে বাড়ীর লোক একসঙ্গে একই ঘরে বসে খাওয়ার নিয়ম। আমার সঙ্গেই একদিকে দুলাল এবং করালী খেতে বসল। খাওয়া শেষ করে কাপড় জামা প'রে নিচে নেমে এলাম—ঠিক সেই মুহূর্তেই দুলাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, পরিষ্কার একখানি ধুতি, একটি পরিষ্কার নীল ষ্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট—পায়ে স্যাণ্ডেল এবং কাঁধে একটা হাল আমলের ঝুলি ঝুলিয়ে নিঃশব্দে কিন্তু একটু ত্বরিত গতিতেই বেরিয়ে চলে গেল। হাতে তার সুটকেশ বা বাক্স ছিল না। আমি ভাবলাম বোধহয় কাজের দোকানে গেল। হয়তো কাজ আছে। বিড়ি কিনবে বা ধার মেটাবে। কি কিছু।

বাড়ী ফিরলাম অপরাহ্নে।

কি কাজে বিস্মৃতি বশত দুলালকেই খুঁজলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল, দুলালকে জবাব দিয়েছি। মনটা বিষণ্ণ হ'ল। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম—দুলাল চলে গেছে?

ঠাকুর বললে—না। জিনিসপত্র রয়েছে। সে গিয়েছে তার দাদার কাছে, কাল এসে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবে।

দুলালের বৈমাত্রেয় দাদা পুলিসে চাকরি করে। টালিগঞ্জ থানার কনেষ্টবল। দুলাল সেখানে গেছে। মনে হ'ল আশ্রয় খুঁজতে গেছে। তার ড্রাইভারি লাইসেন্স পেতে আর বেশী দেরি হবে না, মাস দুয়েক কি মাসখানেকের মধ্যেই লাইসেন্স পাবে; এই সময়টা থাকবার জন্যেই সে তার দাদার কাছে গেছে। তার বৈমাত্রেয় দাদা তার থেকে বছর দুয়েকের হয়তো বড়, তার বেশী নয় এবং দুলালের সঙ্গে তার প্রীতির সম্পর্কও আছে। মধ্যে মধ্যে আমার বাড়ীতে আসত ভাইকে দেখতে; দুই ভাইয়ে প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে গল্পও করত। কখনও কখনও টেলিফোনেও ভাইকে ডাকত। কথা বলত।...

আবার আমার মনটা বিষণ্ণ হ'ল। ছুটো মাসের জন্যে ছেলেটাকে আশ্রয়চ্যুত করা উচিত হয়নি। খুন করব বললেই খুন করে না মানুষ। খুন করতে যে নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন তেমনি নিষ্ঠুর তো মানুষ নয়! যে উন্মত্ততায় আচ্ছন্ন হলে মানুষ সেই আদিম জান্তব বা পাশব আক্রোশ ফিরে পেতে পারে—সে উন্মত্ততা তো সহজে আসে না।

ছেলেটার কিন্তু তাই এসেছিল। সে স্বীকার করেছে পুলিসের কাছে আদালতে—তা-ই তার এসেছিল। ওইটুকুতেই এসেছিল। তারই স্বীকার করা উক্তি শুনে সেই ঘটনাই বলছি। আর বুঝতে চেষ্টা করছি—কি ভাবে কেমন করে হ'ল। ওই একটি নমনীয় দেহ কমনীয় কান্তি কিশোর—এমন ভয়ঙ্কর সে হ'ল কি করে? ভাবছি আর মনে হচ্ছে মহাতামসীর কাণ্ড।

মহাতামসীর সৃষ্টিগ্রাসী ক্ষুধা। সৃষ্টিকে গ্রাস করেই সে অন্ধ বধির নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র মহাতামসী। সে যার মধ্যে বা যে বংশের রক্তধারার মধ্যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নায় জাগে তার মধ্যে সে আশ্রয় নেয়, তার দেহে মনে সর্বাঙ্গে, দেহের কোষে নিজেকে বিস্তার করে রাখে। চৈতন্য-সাধনারত মানুষের সমাজের প্রতিক্রিয়াতে তামসীর আসন হয় দৃঢ়। এইখানেই তান্ত্রিকের তন্ত্রসাধনায় এই মহাশক্তির পূজার প্রভেদ। তান্ত্রিক নিজের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ ক'রে সজাগ রেখে নিজের বক্ষরক্তে পূজা দিয়ে মহাশক্তিকে মহচৈতন্য করে তোলে। বহু সহস্র বৎসর ধরে সমষ্টিগত সাধনায় মানুষ যে চৈতন্যে যে অনুভূতিতে যে বিভূতিতে উপনীত হতে পারবে—সেই চৈতন্য সেই অনুভূতি সেই বিভূতিতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে আনন্দময়ী হয়ে ওঠে। আর সাধারণ অসহায় মানুষ, তার কোষে কোষে বিস্তৃত এই তামসী—সামান্যতম আন্তর-প্রকৃতির বিপর্যয়ে ক্রোধে ক্ষোভে দুঃখে হিংসায় লালসায়—যাতেই হোক, আন্তর-প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটলেই কালো কুয়াশার মতো জেগে উঠতে থাকে —আচ্ছন্ন ক'রে দেয় চৈতন্যকে এবং সর্বশেষ চেতনাকে পর্যন্ত।

তখন থাকে শুধু ক্রোধ ক্ষোভ লালসা বা হিংসা। সে তখন অন্ধ—সে তখন বধির।

দুলালের কোষে কোষে বিস্তৃত সেই তামসী সেদিনের ওই ক্রোধে এবং ক্ষোভে সম্ভবত অকস্মাৎ জেগে উঠেছিল। কুন্নালী তাকে গলায় টিপে ধরেছিল সে তাকে চড় মেরেছিল, তার জন্য ক্রোধ। এবং আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম—আমার উপর তার বিশ্বাস ছিল, আমাকে সে আশ্রয় করতে চেয়েছিল, আমি তাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তার বিশ্বাসের প্রতিদানে হতাশ্বাস করেছি তার জন্য ক্ষোভ। দুলাল যে কেমন ভাবে, চেমন চেহারা, কেমন দৃষ্টি নিয়ে বেরিয়েছিল—সেটা লক্ষ্য করিনি তাই আপসোস হয়। মনে হয় আচ্ছন্নের মতো দৃষ্টি নিয়ে নীরব স্তব্ধভাবে সুদীর্ঘ পথটা অতিক্রম করেছিল। সুদীর্ঘ পথ—একশো আঠারো মাইল। টালিগঞ্জ সে যায়নি। সে এখান থেকে হাওড়ায় ট্রেন ধরে গিয়েছিল লাভপুর। সন্ধ্যে সাতটা বা সাড়ে সাতটা তখন। ১০ই সেপ্টেম্বর, সেদিন ছিল আকাশে ঘন মেঘ—সে মেঘে ছিল বর্ষণ। বড়ো এলেমেলো বাতাস। সাইক্লোনিক আবহাওয়া। সে তাই বলেছে। দুলালের স্বীকারোক্তি। বাঁকা তীক্ষ্ণ ফোঁটায় বৃষ্টি।

বাতাসে গাছের মাথায় আছড়াআছড়ি চলছে। সোঁ সোঁ শব্দ উঠছে।

এর মধ্যে দুলাল নেমে নির্জন রেললাইনের পথ ধরে চলেছিল। তার আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রোধ, ক্ষোভ, আর আছে সেই আদিম কালের আরণ্য চাতুর্য, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং ভয় থেকে তার উদ্ভব। সবই মহাতামসীর ইঙ্গিত তারই চালনা। নন্দ শুধু চলেই ছিল। অসহায়, আচ্ছন্ন, মায়ামমতা স্নেহ ভালবাসা প্রেম সব জমে প্রস্তরীভূত হয়ে আসছে। বোবা হয়ে গেছে।

ছেলেটা বলেছে, সেই ঝড়ো হাওয়া আর বর্ষণের মধ্যে সে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল তার বাপের বাড়ীর পাশে।

৩

গ্রামের একপ্রান্তে মাধু বৈষ্ণবের ঘর এবং দোকান। মাধু—সেই মোদকের ছেলে। সেও এই মহাতামসীর আক্রমণে আক্রান্ত—সে সমাজ চায়নি। সহায় চায়নি। পৃথিবীর কাউকে ভয় করেনি, চোরকে না—ডাকাতকে না, সাপকে না, মৃত্যুকেও তার ভয় ছিল না; মানুষকে হত্যা করতেও তার অপ্রবৃত্তি ছিল না, শুধু দণ্ডকে ভয় করত বলেই করেনি। তাও ভোগকে ভালবাসত বলেই মৃত্যুদণ্ডকে ভয় করত। গ্রামের প্রান্তে, বসতি থেকে দূরে প্রান্তরের মধ্যে তার বাড়ী। বাড়ীর পাশে একটা পুকুর। বহুকালের প্রাচীন মজা একটা পুকুর—মাধুই তার পঙ্কোদ্ধার ক'রে চারিপাশে বাগান লাগিয়েছে। সেই বাগান এখন একটি ঘন জমাট ছায়ার রাজত্ব। থম থম করছে অন্ধকার। দুলাল বলেছে, সে তারই ভিতরে গিয়ে গাঢ়তম অন্ধকার ঠাঁইটিতে স্তব্ধ নিস্পন্দ সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে। যেন মিশে গিয়েছে। ভিতরের মহাতামসীর ছায়া পড়েছে বহির্লোকে—সেই লোকে দুলাল বসে আছে সমুদ্রতলের হিংস্র শ্বাপদের মতো। মধ্যে মধ্যে ফস ক'রে দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়েছে—টেনেছে। কিন্তু প্রতি বারেই চকিত হয়ে উঠেছে ওই নিজের জ্বালা দেশলাইয়ের কাঠির শিখার ছটায়। ত্রস্ত হয়ে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে। বিরক্ত হয়েছে। হবেই যে! আলোর ছটায় শুধু ধরা পড়ার ভয়ই নয়—ওর মধ্যে চৈতন্যেরও আহ্বান আছে। বাহিরের আলোর ছটায় ভিতরে আলো জ্বলতে চেয়েছে। মহাতামসী ভ্রূকুটি করেছে। ত্বরিত ফুৎকারে আলো নিবিয়ে শান্তি পেয়েছে সে।

হঠাৎ ডাকল পেঁচা। ওদিকে প্রান্তরে প্রান্তরে উঠল শিবারব। প্রহর ঘোষণা করে গেল।

দুলাল বোধ হয় তখন একবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তারপর আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল। বাতাস তুলছিল গাছে গাছে শব্দ।
সরীসৃপও নিশ্চয় সঞ্চরণ করছিল। দুলাল ঈষৎ বক্র দৃষ্টিতে স্থির হয়ে তাকিয়েছিল। হয়তো তার সুন্দর দাঁতগুলি কুটিল আক্রোশে নিঃশব্দে বিকশিত হয়েছিল বার বার।
পুলিসের কাছে এবং নিচের আদালতে সে বর্ণনা করেছে সে-দিনের কথা। বর্ণনা করেছে যা ঘটেছিল সেইটুকু। কিন্তু যে বা যা তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে অসহায়ের মতো অথবা উন্মত্তের মতো যাকে দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল তাকে সে অনুভব করতে পারেনি, সেই উন্মত্ত অবস্থার ভয়াবহতার স্মৃতি তার কাছে আজ ঝাপসা, হয়তো বা সে স্মরণ করতেই পারে না বা পারবে না। যিনি ক্রোধ রূপে সর্বভূতের মধ্যে বিরাজমানা—যিনি ভ্রান্তিরূপে সর্বভূতের মধ্যে বিরাজমানা—তিনিই কালরাত্রি, তিনিই মহাতামসী। মহাক্রোধ বা নিদারুণ ভ্রান্তিরূপের মধ্যেও সেই মহাশক্তি বলে তাকে যে চিনতে বা অনুভব করতে পারে—তার অন্তরে মহাতামসী সেই মুহূর্তেই চৈতন্যময়ী হয়ে ওঠেন। সেই মুহূর্তেই সে লীলা উপলব্ধি করে ধন্য হয় এবং মহাশক্তিকে প্রণাম করে বলে—

যা দেবী সর্বভুতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

তখন সে নিষ্কৃতি পায়।
নিতান্ত হতভাগ্য। সতেরো-আঠারো বছরের কিশোর। তার উপর জীবনের আলোক সাধনা পুরুষানুক্রম মহাতামসীর প্রভাবে ক্ষয়িত অপচয়িত; প্রায়ান্ধ মানুষের মতোই তার অবস্থা; সে আলো চেনে না তাই অন্ধকারের রূপও জানে না। সে চিনবে কি করে এই তামসীকে? যে অন্ধ সে অন্ধকারের প্রচণ্ডতাকেই বা বুঝবে কি করে? অমাবস্যার অন্ধকার ঘোর মেঘাচ্ছন্নতায় সূচীভেদ্য হলেই বা তার কি? সেই আচ্ছন্নতায় সে তখন আচ্ছন্ন।
সে নাকি গভীর রাত্রে সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আকাশে মেঘ ছিল, গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। সে এসে তার

বাপের বাড়ীর দরজাটা বল্লমের ডগা দিয়ে ছাড়াতে শুরু করে। সে যে ঘটনা স্বীকার করেছে—তা সত্য হলে তখন তার রক্তের মধ্যে প্রতি কণায় কণায় রক্তবীজের বিনাশ কালে চামুণ্ডার জিহ্বায় যে রক্ততৃষ্ণা জেগেছিল—সেই রক্ততৃষ্ণা জেগেছিল ; হয়তো বা সেই ভয়ঙ্করীরূপের ছায়া তার বাহ্য অবয়বের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ক্রোধ, দেহের প্রতিটি পেশীতে অমানুষিক কাঠিন্য। চামুণ্ডার 'শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা' রূপের প্রতিফলন তার সর্বাঙ্গে। বিখ্যাত গ্রন্থ ডাঃ জেকিল এণ্ড হাইডের ডাঃ জেকিল যে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করতো সেই বিচিত্র বিষ পান করে—সেই যন্ত্রণা পার হয়ে সে যে হ্যা হ্যা শব্দ করত—সেই শব্দ তার সঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের।

বাপের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ও শব্দে। নিচে ওই শব্দ কিসের ? চোর ! এবং শব্দের ধারা অনুসরণ করে তার অনুমান করতে ভুল হয়নি যে চোরই, ডাকাত নয় ; চোর একজন বা দু'জন, বড় জোর তিনজন থাকে। তারা ক্ষীণবল—ভীরু। মানুষের সাড়া পেলেই তারা পালায়। বাপ তার বাল্যকাল থেকে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বহুবার ভয়ঙ্করের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। দুর্দান্ত সাহস তার বুকে ; প্রচণ্ড শক্তি তার দেহে। সে সারা জীবন ধরে নিষ্ঠুর আক্রোশে ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র। মুহূর্তে সে মাথার শিয়রের লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে দিয়ে নেমে চলে গেল। তার এই ঘরেই একবার ডাকাত পড়ার কথা আগে বলেছি। সে ডাকাতদের দরজা ভাঙার শব্দ পেয়েই হাতে একখানা হাঁসুয়া নিয়ে বেরিয়ে এসে লড়াই দিয়েছিল। সে লড়াইয়ে সে জিতেছিল। জীবনে হাঁসুয়া তার পরম প্রিয় সঙ্গী। দিনের বেলা বাইরে চালের কাঠে গোঁজা থাকে ; রাত্রে থাকে মাথার শিয়রে বালিশের তলায়। কিন্তু ওই দিন কি কারণে জানি না, সে কারণের কথা বেঁচে থাকলে সে বলতে পারত, সে খালি হাতে নিচে নেমে এসেছিল। মাথার কাছে হাঁসুয়াখানা ছিল না ? কোনো কারণে অকেজো হয়েছিল ? খুঁজে পায়নি ?

অথবা সামান্য একটা কি দুটো ছিঁচকে চোরের সম্মুখীন হতে তার মতো শক্তিশালী শক্তিগর্বীর অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না ভেবেই সে উপেক্ষাভরে হাঁসুয়া নিয়ে আসেনি কে জানে ! জানত সে।
স্বীকৃতির মধ্যে ছেলেটা বলেছে যে, তখন সে দরজার পাল্লা দুটোর মুখের তক্তাখানাকে নাকি ছাড়িয়ে—সেই ফাঁক দিয়ে একখানা হাত ঢুকিয়ে খিলটা খুলবার চেষ্টা করছিল। সেই মুহূর্তে বাপ এসে চেপে ধরেছিল তার হাতখানা। বাপের শক্তির কাছে এই কিশোর ছেলেটার শক্তি নগণ্য। তবু কিন্তু ছেলেটা মুহূর্তে হাতখানা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। বাপের অসাবধানতা? তার প্রৌঢ়ত্বের শিথিলতা তরুণ ক্ষিপ্রকারিতার কাছে হার মেনেছিল? অথবা আঙ্কিক নিয়মে বাপ তার হাতখানা দৃঢ়বলে ধরবার আগেই টেনে নিয়েছিল কে জানে! শুধু তাই নয়, মহাতামসীর তমসাচ্ছন্নতায় অন্ধ উন্মত্ত ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে ওই দরজার ফাঁক দিয়ে হাতের বল্লমটা বাপের পেটে আমূল বিদ্ধ করে দিয়েই টেনে বের করে নিলে। বল্লমের ফলায় আটকে সেই টানে বেরিয়ে এল পেটের অন্ত্র।
বোধ করি বাপ সেই মুহূর্তে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিল। ওই দরজার ফাঁক দিয়ে আততায়ীকে দেখেছিল মৃত্যু মূর্তিতে। সে বিহ্বল হয়েই ছুটে গিয়েছিল উপরে। সর্বাগ্রে কোনো একটা কিছু দিয়ে তার পেটের ক্ষতটাকে বাঁধতে চেয়েছিল। ওই বল্লমের আঘাতে দীর্ণ পেটের ক্ষতমুখে অন্ত্রগুলি নাকি বেরিয়ে আসছিল ক্রমশ। উপরে গিয়ে একখানা মশারি টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে তার স্ত্রীকে বলেছিল—বাঁধ তো, দে তো বেঁধে।
ইতিমধ্যে উন্মত্তের মতো এসে হাজির হয়েছিল তমসাচ্ছন্ন উন্মত্ত ছেলেটা। তামসী তখন বলি চায়। রক্তের স্বাদ তখন সে পেয়েছে। প্রথমেই আক্রমণ করেছিল নাকি বিমাতাকে।
বিমাতা হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছিল—জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু দেবে কে? মহাতামসী ক্ষমাহীনা।
আঘাতের পর আঘাত। আঘাতের পর আঘাত। ছাব্বিশটা

আঘাত। হাতে, মাথায়, মুখে, পিঠে, বুকে, উর্ধ্বাঙ্গের সর্বত্র। বছর-খানেক বয়সের একটি মেয়ে নাকি—আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিল। নিষ্ঠুর ভোজালির আঘাতে তার একখানা হাত কেটে ঝুলে গেল। মুহূর্তে শিশু হতচৈতন্য হয়ে গেল পড়ে। বিমাতাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। মৃত ভেবেই সে তাকে ছেড়ে দিয়ে পড়েছিল বাপের উপর। বহুপ্রচণ্ডতার দুর্দান্ত নায়ক —তামস-তপস্যার তপস্বীর জীবনাবসান হয়ে গেল অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে। গলাখানাকে কুপিয়ে কুপিয়ে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল।

তারপর রক্তাক্ত কলেবরে নেমে এসেছিল।

বোধ করি থর থর করে কাঁপছিল সে তখন—উন্মত্ত তামসী তখন তার দেহের কোষে নর্তনশীলা। সে-চরণপাতে কাঁপবে বইকি দেহ। বোধ করি সেই কম্পমানতার মধ্যে দেহের ভারসাম্য রাখবার জন্যেই একখানা রক্তাক্ত হাত দিয়ে দেওয়ালটাকে আশ্রয় করতে চেয়েছিল। রক্তাক্ত হাতের ছাপের মধ্যে থেকে গেল তার পরিচয়। এও বোধ করি মহাপ্রকৃতির নির্দেশ।

* * *

তারপর।

স্বীকার করেছে ছেলেটা যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্নান ক'রে রক্তাক্ত জামা কাপড় ছেড়ে ভোজালি বল্লম টর্চ জামা কাপড় গেঞ্জি পুকুরের মধ্যে পাথর বা ইঁট চাপা দিয়ে রেখে সেখান থেকে আবার রওনা হয়েছে। এবার পদব্রজে। আট মাইল পথ। আকাশে মেঘ, জনহীন দীর্ঘ আট মাইল পথ। এবার সে চলেছে আত্মরক্ষার প্রেরণায়। সাপ যেমন দংশন ক'রে গর্তের সন্ধানে ছোটে, বাঘ যেমন শিকার ধরে গভীর অরণ্য-আশ্রয়ে ছোটে, এ হাঁটাও ঠিক তেমনি।

মানব জীবন-সাধনার সকল পুণ্য সকল দ্যুতি নিঃশেষ হয়েছে। তামসী তার কর্ম করিয়ে নিয়েছে। সে প্রসুপ্ত হয়েছে। এবার জৈব প্রেরণায় জীব ছুটেছে প্রাণপণে। ঐ তামসী এবার মৃত্যুভয়রূপিণী

হয়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। চল—চল—চল। পালা—পালা—পালা!

আট মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ই-আই-আর লাইন।

শেষ রাত্রি তখন। রাত্রির সকল ট্রেনগুলি চলে গেছে। সে নাকি স্টেশনের ওভারব্রিজের উপর বা তলায় লুকিয়ে বসেছিল। সকালে ট্রেন। সেই ট্রেনে সে এসে পৌঁছুল কলকাতায়।

৪

এগারোই সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা। আমার বাড়ীর দরজার রাস্তা, ঘরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম নীরবে মাথাটা হেঁট করেই ও এসে বাড়ী ঢুকল। বেশ সন্তর্পণেই পাশ কাটিয়ে গিয়ে চাকরদের থাকবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি কোনো প্রশ্ন করলাম না। করবার কোনো কারণও ছিল না। বরং প্রশ্ন না করারই হেতু ছিল। ওকে স্নেহ করতাম। কিন্তু তবুও ওর রীতচরিত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে আর ওকে রাখা চলে না। জবাব দিয়েছি। কথা বলতে গেলে ছেলেটা যদি আবার বলে—আর আমি কিছু করব না, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না—তা হলে হয়তো আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। এই কারণেই কথা বলিনি। এর। পর গিয়েছিলাম জাতীয় সংস্কৃতি সংঘের অধিবেশনে। ফিরলাম তখন রাত্রি ন'টা। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার সময় শুনলাম মেয়েরা যেন বিরক্ত হয়েছেন কিছু নিয়ে, ওদিকে ঠাকুর ডাকছে, ওঠ্—ওঠ্—! ওরে, শুনছিস্!

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

শুনলাম যে, ছোঁড়াটা সেই বিকেলে এসে যে ঘরে ঢুকে শুয়েছে, আর ওঠেনি; ডাকলে সাড়া দেয়নি, চা খায়নি এবং এখনও তাই। ডাকলে সাড়াও দিচ্ছে না উঠছেও না; ঠাকুর ওর জন্যেই রান্নাশালের কাজ চুকিয়ে শেষ করতে পারছে না।

আমার মনে হ'ল ছেলেটা ধূর্তামি করেই হোক আর অক্ষম হৃদয়ের ক্ষোভের জন্যই হোক না-খেয়ে পড়ে রয়েছে। আমি বা আমরা গিয়ে ডাকব; স্নেহে বিচলিত হয়ে বলব—আচ্ছা—থাক। আর যেন এমন কাজ করিসনে।

মনটা আমার বিষিয়ে উঠল। এ কি উপদ্রব!

আমি গেলাম চাকরদের ঘরের মধ্যে। একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। ছেলেটা এ কেমনভাবে পড়ে রয়েছে? এ যেন জন্তুর আত্মগোপনের প্রয়াসের মতো। ঘরের দেওয়াল এবং মেঝের সংযোগ-স্থলে যে কোণ সেই কোণে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠখানা মেঝের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নাই, একটা স্থূলকোণের সৃষ্টি করেছে। এবং এই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকাটা আমার মনকে আরও তিক্ত করে তুললে।

আমি তাকে ডাকলাম। তিরস্কার করলাম। এই বলেই তিরস্কার করলাম যে, এইভাবে না-খেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থেকে কোনো লাভ হবে না। আমি আর তোকে রাখব না। তোকে কাল আমি জবাব দিয়েছি। কালই তোর এ বাড়ী থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। আজ বিকেলে তোকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। শুধু দেশের লোক বলেই কিছু বলিনি। এসেছিস যদি —তবে উপোস ক'রে থেকে গৃহস্থকে বিব্রত করার চেষ্টা কেন তোর? এসেছিস্—খাওয়া-দাওয়া কর। কথা কারও সঙ্গে বলতে ইচ্ছা না হয় বলিসনে, কিন্তু এমন ক'রে শোকার্তের মতো উপুড় হয়ে পড়ে কেন? একি! ওঠ্। খাওয়া-দাওয়া কর্। আর কাল সকালেই যেন তোর জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবি তুই। কিছুতেই আমার বাড়ীতে আর থাকবি না কাল।

এতক্ষণে ছেলেটা উঠল। চোখ দুটো লাল। মনে হ'ল কেঁদেছে। ঠিক ওই মনে হওয়ার জন্যেই আমি আর সামনে থাকলাম না। চলে গেলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর। ভোর বেলায় ওঠাই অভ্যাস আমার। রোজই

চাকর-ঠাকুরদের ডেকে দিয়েছি। তাকেও ডেকেছি। সেদিন ভোরবেলা উঠে দেখি সে উঠেছে এবং তার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নীরবেই বেরিয়ে গেল। কথাও বললে না, যাওয়ার সময় চলিত নিয়মমতো প্রণামও করলে না।

১৫ই সেপ্টেম্বর সকালে সিউড়ী জুবিলী লাইব্রেরির নিমন্ত্রণে আমি সিউড়ী গেলাম। শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি। পরদিন জেলা ইস্কুলের রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে সভা। তারপর গেলাম মশানজোড়। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার রূপায়ণ দেখতে। পরের দিন বিকেল বেলা সিউড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম আমদপুর ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরব। কিন্তু গ্রামে যাবার জন্যে মন উতলা হ'ল। এবং সেখানেই শুনলাম—আমার ছোট ভাইয়ের একটি সন্তান জলে ডুবে মারা গেছে।

কলকাতায় না ফিরে গেলাম লাভপুরে।

লাভপুর স্টেশনে নামলাম। আমার ছোট ভাই, আর আমার বৈবাহিক স্টেশনেই ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বাড়ীর পথে চলবার সময় আমার ছোট ভাই বললেন—ডুলাল সবই স্বীকার করেছে।

স্বীকার করেছে? কি স্বীকার করেছে? গাড়ীতে বালি দেওয়া? চুরি?

ছোট ভাই সবিস্ময়ে বললে—কেন? তুমি শোনোনি? চিঠি পাওনি?

—কিসের চিঠি? কার চিঠি?

—আমার।

—আমি তো রবিবার রাত্রে বেরিয়েছি কলকাতা থেকে। তার মধ্যে তো কোনো চিঠি পাইনি।

—তা হলে তুমি কিছু জান না? এখানে দাস খুন হয়েছে। তার ছেলে পুলিসের কাছে স্বীকার করেছে যে সে-ই খুন করেছে।

বাড়ী যেতে যেতে সমস্ত বিবরণ শুনলাম। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার কল্পনাশক্তি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া, সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে পারলাম না।

এ কি হ'ল?

সেই কচি সুন্দর মুখ ছেলেটাকে দিয়ে এমন ভয়ঙ্কর ভীষণ অনুষ্ঠান

কি ক'রে সম্ভবপর হ'ল? বাড়ী গিয়ে হতবাক হয়েই বসে রইলাম। আমার বাড়ীও শিশুটির অপঘাত মৃত্যুতে শোকার্ত। কিন্তু কাউকে কোনো সান্ত্বনাও দিতে পারিনি আমি। ভাবলাম। শুধুই ভাবলাম। এই সময়েই এলেন থানার দারোগাবাবু।

তাঁর কাছে শুনলাম আর বাকিটা।

১০ই খুন হয়েছে বাপ। বিমাতাটি এখনও বেঁচে আছে। ছোট মেয়েটিও বেঁচে আছে। হাসপাতালে রয়েছে। বিমাতা না কি বলেছে —আমাদের ছেলের মতো মনে হ'ল।

মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। এবং ভয়ার্ত মেয়েটি বোধ করি সাহস করে তাকাতেও পারেনি। কিংবা সেই তামসীর প্রভাবে ছেলেটার সুন্দর রূপ এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে মেলাতেই পারা যায় না দুটো মুখ। ডাঃ জেকিল এবং মিস্টার হাইডের মুখ সত্যই মেলে না।

এর পর ১২ই বেলা দেড়টায় ছোঁড়া এসেছে কলকাতা থেকে।

আমদপুর স্টেশনে তাকে দেখে আমাদের ওখানকার কেউ ভেবেছে, বুঝি সে সংবাদটা পেয়েই কলকাতা থেকে আসছে।

তাকে বলেছে—সংবাদটা পেয়েছে বর্ধমান স্টেশনে।

আর-একজনকে বলেছে—আর এক রকম।

লাভপুরে নেমে একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে—সংবাদ পেয়েছে আমদপুরে।

স্টেশন থেকে কিছুদূর এসে একজনকে বলেছে—লাভপুর স্টেশনে নেমে শুনলাম।

এইভাবে প্রতিটি জনকে বলেছে—ভিন্ন কথা।

পুলিস তার বিমাতার কথায় প্রথমটা খুব আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু এই সঙ্গতিহীন উক্তিগুলির কথা জানতে পেরেই তাকে এসে প্রশ্ন করে। সে এবার বলে—বাড়ী এসে সংবাদ জেনেছে সে। দারোগা তাকে জেরা শুরু করেন।

তারপর তাকে এ্যারেষ্ট করে থানায় নিয়ে নির্জন হাজতঘরে রেখে বলেন—ভেবে দেখ। এত বড় পাপ করে আর মিথ্যে বলে

পাপ বাড়িয়ো না। সত্য স্বীকার করলেও ভগবানের দয়া পাবে। ভেবে দেখ।

আধঘণ্টা পরেই সে আনুপূর্বিক ঘটনা স্বীকার করে।

হ্যাঁ, সে করেছে। এইভাবে করেছে।

সিউড়ী চালানের সময় নাকি দু'একজন জিজ্ঞাসা করেছে—তুই? তুই করেছিস?

সে নত মুখেই বলেছে—হুঁ।

একথাটা বললে আমাকে আমদপুরের স্টলওয়ালা।

আমি সেই রাত্রেই কলকাতা ফিরলাম।

স্তম্ভিত—হতবাক্।

শুধু ভাবছিলাম—কি ক'রে? কি ক'রে হ'ল? কেমন ক'রে হয়? হয় হয়তো। কিন্তু কি ক'রে? সুন্দর এমন ভয়ঙ্কর হয়? কোমল এমন নিষ্ঠুর হয়?

শান্ত এমন রুদ্র হয়?

ট্রেনে চেপে বসলাম। মনে হতে লাগল—জানালার পাশে পাশে ছুটে চলেছে সেই ছেলেটার মুখ।

সমস্ত রাত্রি ট্রেনে এসে সকালবেলা হাওড়া পৌঁছুনো। কামরায় আমি একা। ছুটন্ত ট্রেনের জানালার ওপাশে সেই ছেলেটার মুখ। সে যেন ট্রেনের ফুটবোর্ডে চড়ে চলেছে অথবা শূন্য-লোকে ভেসে চলেছে। আমি নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে রয়েছি। মনের চিন্তার গতি, স্মরণ করার শক্তি—সব হারিয়েছি।

এর মধ্যে কোনো বিচিত্র রহস্যই নেই। প্রচণ্ড কিছু, সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য কিছু আকস্মিকভাবে ঘটলে মানুষ এমনি বিস্ময়-স্তম্ভিতই হয়ে থাকে। ছেলেটার মুখ আমারই মনের প্রতিচ্ছবি তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বর্ধমান এসে পৌঁছুলাম যখন তখন মধ্যরাত্রি, বোধহয় একটার কাছাকাছি। বর্ধমানে আমার এই বিস্ময়ের ঘোর স্তম্ভিত ভাবটা যেন কাটল—আলোর ছটায়। এতক্ষণে মনে পড়ল যে—বাড়ী থেকে বের হবার সময় মা খাবার দিয়েছেন, একটা

বোতলে জলও দিয়েছেন, খাওয়া হয়নি, খেতে ভুলে গিয়েছি। একবার চেষ্টা করলাম খাবার, কিন্তু ইচ্ছে হ'ল না।

বর্ধমানে ট্রেনখানা ঘণ্টা দুয়েক কি তিন ঘণ্টার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর নাম বদল করে লোকাল ট্রেন হয়ে আবার রওনা হয় হাওড়া। কামরাটার দরজা-জানলাগুলি বন্ধ করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। অন্ধকারে শুয়ে ঘটনাগুলি ভাবলাম।

মনে হ'ল ছেলেটার ক্রোধ তো ছিল আমার এবং ড্রাইভারের উপর। সে যেভাবে কলকাতা থেকে একশো আঠারো মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এসে এই ভীষণ রক্ততাণ্ডব খেলে গেছে—তার চেয়ে তো কলকাতার মতো বিরাট জনারণ্যে প্রতীক্ষা ক'রে রাত্রে আমার বাড়ীতে এসে আমাদের উপর এই খেলা খেলে যাওয়া সহজ ছিল? তা সে কেন করলে না? সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও বাপ যে বাপ। বহু মমতার স্মৃতিও তো তার সঙ্গে জড়ানো আছে!

আশ্চর্য বোধ করি এইটুকু যে, এই মুহূর্তে মনের মধ্যে ওই ছেলেটা এসে দাঁড়িয়ে এর জবাব দিলে না। ছেলেটার বদলে মনের মধ্যে এসে আসন গ্রহণ করলেন আর-একজন। তিনি ওই সন্ন্যাসী। সেই অশীতিপর সবল সক্ষম দেহ যোগী—গোপালদাসীর গুরু। তাঁকেই আমার মনে পড়ে গেল, না। কথাটা ঠিক অভিব্যক্ত হ'ল না। বাস্তববাদী বলুন, মনে পড়ে গেল। আমি বলব তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার মনে। তাঁর কথা শুনলাম, তাঁর সম্মুখের হোম-কুণ্ডের অগ্নির শিখার দীপ্তি গন্ধ উত্তাপ অনুভব করলাম। ক্ষীণ স্মিতহাসি তাঁর মুখে। তিনি বললেন, ন্যায়; এ বিশ্বে ন্যায় ও অন্যায়ের যে অমোঘ নীতি আছে—সেই নীতির ন্যায় ছিল তোমার দিকে। তাকে সে লঙ্ঘন করতে পারেনি। তোমার পুণ্যবল ক্ষীণ হয়নি অন্যায়ের দ্বারা। তাই মহাতামসী তার মুখ ফিরিয়েছিল তার বাপের দিকে—সেইখানে ছিল তার অন্যায়ের উপর শোধ নেওয়ার অধিকার। সেইখানে ছিল তার জীবনের সকল বন্ধনের গ্রন্থি। সেই গ্রন্থির আকর্ষণ তাকে প্রবলবেগে টেনেছিল।

মনের মধ্যে তাঁর আবির্ভাবে বা সন্ন্যাসীকে মনে পড়ায় আমি একবিন্দু বিস্ময় অনুভব করিনি। একবারও প্রশ্ন করিনি নিজেকে —বা তাঁকে—এঁকে দেখছি কেন বা আপনি কেন এলেন—কই ডাকি নি তো! তাঁর কথার উত্তরে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম— মহাতামসীর কথা আপনি বলেছিলেন আমার মনে আছে। তখন বলেছিলেন মহাতামসীর ধর্ম হ'ল জ্যোতির্ময়তায় তার আত্ম-প্রকাশকে গ্রাস করা। সেখানে ন্যায়ের বাধাই বা দাঁড়ায় কোথায়? পুণ্যের প্রশ্নই বা আসে কি ক'রে? এই ভারতবর্ষের মহাপুণ্যের মূর্তমান প্রতীক, অহিংসার সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে কি ক'রে?

তিনি বললেন—ভুল করছ ভাই। তোমাদের গান্ধীজির হত্যায় মহাতামসীর লীলা নাই। যে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে —তার সঙ্গে এই বাচ্চার তুলনা কর ভাই। একটার পিছে ক্রোধের সঙ্গে কত বুদ্ধি, কত বিচার, কত খেল দেখ। আর এই লোকটিরও একটা জ্যোতি ছিল; যুদ্ধের মধ্য দিয়ে, হত্যার ভিতর দিয়ে বহুজনের পুণ্য সাধনের একটা পথ ছিল। এখানে শক্তি তো সচেতন ভাই। সচেতন কিন্তু ভ্রান্ত! যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ—নমস্তস্যৈ—নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। একথা ভুলে যেয়ো না ভাই। ভ্রান্তিরূপে তাঁর যে খেলা ভাই সে খেলায় আলো নিবিয়ে দেন না; আলোকে জ্যোতিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন, মৃত্যু অমৃত হয়ে যায় তারাশঙ্কর। আর এ হ'ল—কাল রাত্রির্মহারাত্রি-র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা। এর মধ্যে সব ডুবে যায় দাদা। এ রূপ কোথা হয় জান ভাই, যেখানে সাধনার মধ্যে পাপের বীজ থাকে সেইখানে। রক্তবীজ তপস্যা—তার যত বিন্দু রক্ত তত সংখ্যক রক্তবীজে বেঁচে উঠার বর সে আদায় করেছিল—পাপ করবে বলে, অন্যায় করবে বলে। চণ্ড মুণ্ড দুই ফৌজদার—তাদেরও তাই। তাই সেখানে মহাতামসী শক্তির দেহ থেকে বেরিয়ে আসেন—চামুণ্ডারূপে। অট্টহাস, শুষ্কমাংসাতি ভৈরবা নাদাপুরিত-

দিংমুখা। এই বাচ্চাটার বংশে পাপের বীজ তিন পুরুষ ধয়ে খেলা করছে ভাই। লগন পেয়ে সে খেলার প্রকাশ হয়ে গেল। খেলার মজাটা দেখ ভাই। মহাতামসী লোভরূপে রয়েছে কামরূপে রয়েছে, ক্রোধরূপে রয়েছে, ক্ষুধারূপে রয়েছে, তৃষ্ণারূপে রয়েছে, পুষ্টিরূপে রয়েছে, ত্যাগরূপে রয়েছে, বুদ্ধিরূপে রয়েছে, ভ্রান্তিরূপে রয়েছে, মেধারূপে রয়েছে, বোধিরূপে রয়েছে, চৈতন্যরূপে রয়েছে, সবেই আছে। সে নিজের সঙ্গে চলছে তার নিজের লড়াই। এই লড়াইয়ে যখন কাম ক্রোধ লোভ প্রধান হয়ে ওঠে তারাই তখন চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ আবার তাদেরই তিনি বিনাশ করেন ওই চামুণ্ডা-রূপে। ছেলেটা মারলে বাপকে—বাপের ভিতর ভাই সেই তামসীর খেলায় ছিল শুধু লোভ কাম ক্রোধ। সেই পাপের বীজে সে মহাপ্রবল হয়ে দৈত্য হয়ে উঠেছিল। আবার এই বাচ্চাটার দশা ভাব।

—তার ফাঁসি হবে খুব সম্ভব।

—সে তো তার নিজের ভিতরের খেল্ নয় দাদা। সে খেল্ আলাদা খেল্। সে ভাই মানুষের বুদ্ধির খেল্। তাতে তো ওই খেলের গতি পাল্টাচ্ছে না। কেটে দেওয়া হচ্ছে। ভাই, বাচ্চাটা যদি পাকড়া না যেত, কি বাচ্চাটা যদি খালাস পায় তবে তো ভাই এই লীলাভূমি ঠিক দেখতে পাবে। ধরতে পারবে। কি হবে ধ্যান করো ভাই। তুমি তো পারবে ধ্যান করতে। তুমি তো ভাই উপাখ্যান বানাও, সে তো সহজ নয়, জীবনের ধ্যান না হলে তো উপাখ্যান হয় না। করো ধ্যান।

এরই মধ্যে খানিকটা ঘুমও এসেছিল। জেগে যখন উঠলাম তখন রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল সারারাত্রির শ্রমে। বাথরুমে গেলাম। সামনেই আয়নাটায় নিজের ছবি দেখে শিউরে উঠলাম। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, এক শীর্ণমুখ—সারা রাত্রির এই মানসিক যন্ত্রণায় শীর্ণতর দেখাচ্ছে—মনে হ'ল আমি যেন পাগল হয়ে যাব।

তাড়াতাড়ি কল খুলে মুখ হাত ধুয়ে প্রচুর জল ঢাললাম মাথায়।

ফিরে এসে আবার চোখ বুজলাম ক্লান্ত ভাবে। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পেলাম না, মনের মধ্যে এবার এসে দাঁড়াল ওই ছেলেটা।

নির্বাক স্তব্ধ—চোখ দুটো রক্তাভ—মুখ বিশীর্ণ, দেহ শীর্ণ, অসীম অসহ্য কোনো যন্ত্রণায় তার প্রাণপুরুষ অধীর হয়ে উঠেছে। শীর্ণ শুষ্ক ঠোঁট দুটো থর থর ক'রে কাঁপছে, চোখের রক্তাভায় মনে হচ্ছে বহু অশ্রু ঝ'রে পড়ছে, কিন্তু সেবাইরে নয়, অন্তরে অন্তরে। বাইরে তাতে অঙ্গারের জ্বালা। তাকে ডাকলে সে সাড়া দেয় না—চমকে ওঠে, হাসে না—আরও বিশুষ্ক হয়ে ওঠে। চৈতন্য মুছে গেছে—জৈব চেতনা তাও অতি ক্ষীণভাবে প্রবাহিত। যে দুর্দান্ত সাহস শক্তি তার জন্মগত বংশগত সে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে, আছে শুধু ভয়—চমক—বিরক্তি।

* * *

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাও ঝেড়েমুছে নিয়ে কথাটা অস্বীকার করবেন না আমি জানি। এর প্রতিক্রিয়ায় আনন্দদুলাল বলে ওই ছেলেটির পাগল হওয়াই স্বাভাবিক। পাগল হয়েই যাচ্ছে সে—বা গিয়েছে।

তাতে আমার ঝগড়া নেই। কেউ বাদ-প্রতিবাদ করতে এলেও করব না। আমি যা অনুভূতিতে উপলব্ধি করেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, তাই প্রকাশ করেছি।

সকল রিপুকে জয় করতে না পারলে পূর্ণ চৈতন্যে উপনীত হওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে তবুও আকস্মিকভাবে বিচিত্র ঘটনা সংস্থানে বিপরীতধর্মী ভাবসংঘাতের মধ্যে সৌভাগ্যবশে বা পুণ্যবলে যদি নিজেকে মানুষ জীবনাসনে স্থির রাখতে পারে—তবে মুহূর্তে ধ্যানস্থ হয়ে যায় এবং সেই মুহূর্তটিতে চৈতন্য জ্যোতির ঝলকের মতো জীবনকে ধন্য ক'রে মহারহস্যের একটা আভাস দিয়ে যায়। সেই মুহূর্তের দেখা মিথ্যা হয় না। যে দেখে তার জীবনে ওই দেখার স্মৃতি মহাসম্পদ।

ঠিক এই কারণেই আমি যান্ত্রিক নিয়মে কঠোর শাসনে শৃঙ্খলার অভ্যাসে লোভরূপিণী কামরূপিণী মোহরূপিণী হিংসারূপিণী. আদিম

শক্তিকে—কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রিকে, কৃষ্ণবর্ণাকে, ধূম্রবর্ণা অতিরৌদ্র মহাভীষণাকে—প্রসন্না লজ্জারূপিণী শান্তিরূপিণী শ্রদ্ধারূপিণী দয়ারূপিণী তুষ্টিরূপিণী মেধারূপিণী বোধিরূপিণী অমৃতময়ী চৈতন্যময়ী জ্যোতির্ময়ী গৌরী দিবারূপিণীতে রূপান্তরিতা করা যায় না বলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তার জন্য প্রয়োজন তপস্যার, সাধনার। শাসনের ভয়ে অভ্যাসের বশে ওই প্রবৃত্তিরূপিণী আদিম শক্তিকে বিনাশের কল্পনা করে বাতুলে।

আদিম জীব-জীবন থেকে মানুষের জীবন পর্যন্ত রূপান্তরে সাধনার যে ব্যগ্রতা যে আকুলতা যে তপস্যা—তেমনি তপস্যা। সেই তপস্যায় সে মন পেয়েছে, মনন পেয়ে চিন্তাশক্তিকে পেয়েছে—চিত্তকে আবিষ্কার করেছে; সেই চিন্তার সেই চিত্তের পরিবর্তন সম্ভব তপস্যার শুদ্ধির মধ্যে।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া

একথা এই বিজ্ঞানের যুগে বলা লজ্জা এবং উপহাসের কথা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা এবং এই শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে আপন চিত্তশুদ্ধির জন্য আপন অন্তরের শক্তির কাছে প্রার্থনা জানানো আমি লজ্জার কথা মনে করিনে। বলি—তুমি প্রসন্ন হও। অতিরৌদ্রা তুমি অতি সৌম্যা রূপে আবির্ভূত হও।

মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি! নমোঽস্তুতে !!

আদি অন্তহীন বিশ্বশক্তি যা না কি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মহাশূন্যে অপার রহস্যরূপিণী অনন্ত বৈচিত্র্যে অনু-পরমাণু থেকে গ্রহমণ্ডলে ব্যাপ্ত প্রসারিত—তারই মধ্যে মানুষ অন্তরলোকে বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে তাকে আবিষ্কারে ব্যাপৃত। জড়শক্তির মধ্যস্থায়িনী শক্তি জড়কাঠিন্যের নিয়মে আবদ্ধ; তাকে আঘাত করলেই যোজনায় বিচ্ছিন্নকরণে সে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, সমান বেগে কল্যাণ অকল্যাণ বহন করে আনে। তার চেয়েও বিচিত্র সজীব জীবনের মানুষের

চিত্তলোক। সে এই বিচিত্রকে আবিষ্কার করে, অনুভব করে। সেই অনুভবের মধ্যেই আবার তার প্রকাশ হয় নবরূপে।

"মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধাতৃষ্ণা। নিদ্রাতৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রিত্বুরাত্যয়া।"

তিনিই মানুষের সাধনায় হন—

"মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্‌সরস্বতী। আর্যাব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদ-গর্ভা চ ধীশ্বরী।"

সেই তাঁকে প্রণাম করি। আর কামনা করি—মহপঙ্কে মহান্ধকারে মহাগর্তে যে পড়ে—বিশেষ করে ওই ছেলেটা, সে যেন খুঁজে পায় পরিত্রাতাকে যিনি এর মধ্যেও দিতে পারবেন মুক্তির মন্ত্র।

মনের আয়নায় নিজের ছবি

একালের আত্মসমীক্ষার আয়নায় নিজেকে দেখে নিজের ছবি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'সেল্‌ফ্‌ পোর্ট্রেট' তা আঁকায় বিপদ আছে। আমার পক্ষে তো অসম্ভব। কারণ যে যুগে মানুষের সংজ্ঞা শুধু জীব (জন্তু কথাটা খাতির করে নেই বললাম), অবশ্য বুদ্ধিমান বা যুক্তিবাদী জীব, সে যুগে আত্মসমীক্ষার আয়নায় এই মানুষের ভিতর থেকে একটি জন্তুর চেহারা দেখা যাক বা না-যাক, বের করতেই হবে। না হলে বিদগ্ধ সমাজে সেটা সত্য হবে না। এ যুগের শিক্ষিত ভারতবর্ষের মন পুরোপুরি ইউরোপের কাছে শিক্ষা নিয়েছে; তাতে বেদ মাত্র দুটি—একটি ফ্রয়েডীয় বেদ, অপরটি মার্ক্সীয় বেদ। একটির কথা হ'ল সবের বীজ কাম, ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো, মার্ক্সবাদের বীজ হ'ল অর্থ বা ওয়েল্‌থ্‌। ধর্ম ছিল এদেশের মূল কথা —সেটাতে ঢেঁড়া দাগ দিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

গান্ধীজী রামনাম করতেন, তাঁর অহিংসার ও সব কর্মের মেরুদণ্ড ছিল

ঈশ্বর। ধর্মকে ঈশ্বরের কান বলতে পারি, কান টানলে মাথা আসার মতো ধর্মের সঙ্গেই ঈশ্বর আসে। এ যুগে ঈশ্বর বাতিলের সঙ্গে মাথার সঙ্গে কানের মতো ধর্ম গেছে। ধর্মের মধ্যেই ছিল অহিংসা; কানের মাকড়ির মতো পরানো ছিল; কান গেছে মাথার সঙ্গে, কিন্তু মাকড়ি দুটো খুলে নেওয়া হয়েছে—মনুষ্যরূপী জন্তুর নাকে পরানো হয়েছে ভালুকের নাকে পরানো দড়ি-বাঁধা মাকড়ির মতো। তাকে অহিংস করে বিশেষরূপে সভ্য করবার জন্য। এই মতই বড় রাষ্ট্রনেতা থেকে ক্ষুদে ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক সবাই পোষণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের শ্রেষ্ঠ অংশ ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, তার মধ্যে সুরের তারিফে আমরা গদগদ, রচনাকৌশলে বিমুগ্ধ, শুনে বা পড়ে হায় হায় করেও আমরা ঈশ্বর ও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দরিয়ায় ভাসিয়ে ড্রাম বাজিয়েছি। সেও বড় সাহিত্যিক, ছোট সাহিত্যিক, শিল্পী থেকে সবাই, কে নয়? কেমন করে কোন চক্রান্তের ফাঁকে এর মধ্যে আমি টিকে আছি জানিনে।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন আছেন তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে, দেখে বুঝতে পারি—চক্রান্তের ফাঁক এটা নয়: চাকার দাঁতে ভাঙা যায়নি বলেই আছে। সেই কারণেই ভরসা করে বলতে পারছি য, ঠিক এইভাবেই আত্মসমীক্ষার আয়নায় আবার সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন কোনো একটি জন্তুকে আবিষ্কার করা আমার পক্ষে শক্ত বললে কিছুই বলা হবে না, বলতে হবে সম্ভবপরই নয়। এতে ফ্রাস্ট্রেটেড বা হতাশা-পীড়িত বললে তাই, কেউ বুর্জোয়া বললে তাই, কেউ ফ—ল বললে তাই। তবে এ দিয়ে আমি ভারতবর্ষীয় এ নাকচ করা যাবে না। কিন্তু আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি যে কোনো সাফল্য বা সার্থকতা, যাকে সাকসেস্ বলে, তা খুব উঁচু ডালে আছে আর আমি নীচে দাঁড়িয়ে 'ঈশ্বর ওটাকে ফেলে দাও' বলে তো ডাকিনে। এবং গরীব, গৃহস্থ, ধনী, অলেখক, যে কোনো লেখকের, বড় লেখকের সঙ্গে মেলামেশায় তো আমি কোনো কম্যুনিস্ট লেখকের থেকে আলাদা নই। সুতরাং ও সংজ্ঞাগুলো আমাকে স্পর্শ করে না বা আমার সম্পর্কে খাটে না।

আমার জন্ম ১৮৯৮ সনে, চার-পাঁচ বছর বয়স থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি। নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাইনি। মিথ্যা হয়ে গেছে, কারণ ঈশ্বরের মতোই একটি সত্তার হাতছানিতে আবার বিশ্বাসেই ফিরে এসেছি। তাকে খুঁজেছি, ডেকেছি, আজও খুঁজি, আজও ডাকি; মনে মনে সরবে না হোক, নীরব একটা ইশারা পাই। আত্মসমীক্ষা আমি প্রতি পদে করি; কিন্তু বাজারের কেনা আয়নায় আমার চেহারা ভাল নয় এটা জেনেও এবং মুখে বলে, লেখায় লিখে প্রায় ঘোষণা করেও নিজের সঙ্গে কোনো জন্তু-জানোয়ারের চেহারার মিল দেখতে পাইনে।

বাইরের চেহারা আমি বাজারে আয়নায় যত ভাল করে দেখেছি—মনঃসমীক্ষার আয়নায় মনের চেহারা আমি তার চেয়ে বেশী ভাল করে দেখেছি। যদি বলি মনের চেহারাকে দেখতে দেখতে আত্মাকে দেখেছি কখনও—চকিতের মতো, তবে মিথ্যা বলব না। বিশ্বাস কেউ না করেন, বলব না—অঘটন আজও ঘটে বা There are more things in heaven and earth ইত্যাদি। সে যাক।

বাইরের আয়নায় আমার শ্রী নেই দেখে একটা সুযোগে আমি নামের আগে 'শ্রী' পরিত্যাগ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে এ নিয়ে নিজের কাজটাকে বিচারও করেছিলাম। এটা আমার স্বভাব। যে কাজই করি, করার পর ভেবে দেখি, এটা কেন করলাম। ধরা যাক, হঠাৎ কোনো বাল্যবন্ধুর চিঠির উত্তরে যদি কিছুটা উচ্ছ্বাস পায় বা কোনো বন্ধুকে হঠাৎ মনে পড়ে তাকে নিজে থেকেই পত্র লিখি—তবে হঠাৎ একসময় ভাবতে বসি কেন এটা করলাম? এর কতটা সত্য, কতটা লোক-দেখানো ব্যাপার? ওকে কি সুকৌশলে আমার বড়ত্বটা জানালাম না? কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বা পত্র লিখলে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিই। বেশির ভাগই মা। কারণ আমি ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করি। দু-চারটে ক্ষেত্রে বোন, এসব ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করি এটা স্বতঃস্ফূর্ত না মনের আলোর কালি ও অগ্নি-নিবারণের জন্য এটা একটা কাঁচের ফানুস লাগালাম।

রাত্রির পর রাত্রি নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে জন্মমৃত্যু সম্পর্কে ভেবেছি--আজও ভাবি, জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে গেলেই ঈশ্বর এসে পড়েন। ঈশ্বরের কথা ভাবতে গিয়ে মাতৃরূপের মধ্যে তাঁর স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি। যখন ছেদ পড়ে তখন আবার অকস্মাৎ প্রশ্ন করি—কেন এইভাবে উত্তরহীন 'কেনর' উত্তর খুঁজি? অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বরকে গোচরে আনবার চেষ্টা করি কেন? কোন্ অতৃপ্তির জন্য?

এমন কি কারুর কোনো ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে তারিফ করে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার কি লোভ হ'ল? ওকে কি ঈর্ষা করলাম?

কোনো সুন্দরী নারীর দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে সংকোচ হলেও প্রশ্ন করি, তাকালাম কেন? সংকোচ করলাম কেন? এবং মনকে চিরে চিরে দেখি।

যেখানে কোনো সংশয় হয়েছে সেখানেই আত্মগ্লানি হয়েছে এবং তিরস্কার করেছি নিজেকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

দু-চারজন সমসাময়িক লেখক বা বন্ধু এর সাক্ষী আছেন। কোনো কারণে যদি মনে হয়েছে আমার কোনো আচরণ বা উক্তি অন্যায় হয়েছে তবে তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পত্র লিখেছি।

আবার লিখেও মনে হয়েছে এর মধ্যেও সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করলাম না তো? যখন নামের আগে শ্রী ত্যাগ করি তখনও ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলাম। সেদিন মনে হয়েছিল এটা খানিকটা সত্যও বটে। সত্যও ছিল। কিন্তু নিরন্তর চর্চায় আজ প্রতিষ্ঠার সীমানা পার হয়ে আর এক জায়গায় পৌঁছেছি। সেটা হ'ল আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্র। আজ বলতে সংকোচও হচ্ছে না যে আত্মশুদ্ধি বা পরিশুদ্ধি বা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে পৌঁছে ঈশ্বর-প্রসাদ পাবার একটা বীজ আমার মধ্যে ছিল, হয়তো জন্মগতভাবেই। মনে রয়েছে এবং আমার স্মৃতিকথার মধ্যেও লিখেছি যে প্রথম বয়সে এটা উপ্ত হয়েছিল দেশপ্রেমের উত্তাপে। ফাঁসিকাঠ তখন বাংলাদেশে মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথ; ওই পথে পাও দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ে হয়ে

সব গোলমাল হয়ে গেল। আমার স্ত্রী বলেন, আমি অতি কঠোর প্রকৃতির লোক এবং অবাধ্য স্বামী। কিন্তু আমি জানি, আমি অত্যন্ত পত্নী-অনুরক্ত।

প্রথম বয়সে প্রতিষ্ঠাকামী এবং তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী-রূপে মর্যাদা-সম্পন্নতার আবরণে দাম্ভিক ছিলাম। ও দুটো প্রায় অগ্নিশিখার উত্তাপ এবং অগ্নিবর্ণের মতো একটার সঙ্গে আর-একটা জড়ানো। একটা থাকলেই আর-একটা থাকে। তখনকার চেহারা কল্পনা করে ভাবতে চেষ্টা করছি—তার মধ্যে কোনো জীবকে আবিষ্কার করা যায় কি না। হয়তো বাঘ-ভালুক বলা যেতে পারত কিন্তু ওই আত্মদানের কামনার জন্যে মেলাতে পারা যাচ্ছে না। কারণ ওরা আর সবই হয়তো পারে; বাচ্চা বয়সে বাঘকে শিখিয়ে সার্কাসে তাকে দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়; কিন্তু কোনোমতেই তার মধ্যে ভাল কিছুর জন্যে প্রাণদানের বাসনা উদ্রিক্ত করা যায় না। জন্তু বা animal সে কখনই নয়। জীবন আছে বলে জীব—একথা সত্য বলে মানতেই হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী এবং কাম (লিবিডো) ও অর্থ (মেটিরিয়েল ওয়েল্‌থ্‌)-নিয়ন্ত্রিত জীব, মানুষের এ সংজ্ঞা আমার কাছে এবং আমার মতো কোটি কোটি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ভুল—এটা মানুষের অপমান। মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে যা কোনো জীব-জন্তুর মধ্যে নেই। জীবজন্তু নড়ে, চড়ে, রাগে, কাঁদে, হাসে, ভয় পায়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম বোধ করে; এ শক্তিকে বলে চেতনা। সে সচেতন। কিন্তু মানুষ শুধু সচেতন নয়, তার চৈতন্য আছে। সে একজনকে কামার্ত দেখলে কামার্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করে বসে না, লজ্জিত হয়। নিজের ক্ষুধার খাদ্য অপরকে দিয়ে নিজের উদরপূর্তির তৃপ্তির চেয়ে বেশী তৃপ্তি অনুভব করে; একজনের দুঃখ-শোকে সেও দুঃখ-সুখের বেদনা অনুভব করে। তার চোখের জলের নির্গমনপথ একটি ধারায় নয়—অজস্র ধারায়। শুধু নিজের যন্ত্রণায় বা দুঃখে নয়, পরের যন্ত্রণা এবং দুঃখেও সে কাঁদে। পর তো সংসারে কোটি কোটি। সুতরাং চোখের জল তার অজস্র ধারায়

ঝরে। যে এই কান্না কাঁদে তাকে জীবজন্তু কি করে বলব? জীবজন্তুর জীবনে এ কান্না নেই। আমি আত্মসমীক্ষার আয়নায় দেখতেও পাই, এ কান্না জীবন কাঁদে না—জীবনের মধ্যে থেকে জাগ্রত আত্মা কাঁদে। আমি আত্মসমীক্ষার দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি এবং বিগতকালে স্মৃতির ক্যামেরায় তোলা এই দর্পণে দেখা যে ছবিগুলি জীবনের দেওয়ালে ঝুলছে তা দেখে মনে জাগছে একটি গাছের কথা। সেই মাটির তলায় উপ্ত বীজে সেই বিবর্ণ অঙ্কুর থেকে তার পুষ্পিত ও ফলবন্ত পরিণতি পর্যন্ত নানান অবস্থার ছবি দেখতে পাচ্ছি। আবার মাটির তলার পঙ্ক এবং পচনরস পানে যে মূলজাল লক্ষ মুখ হয়ে ক্রমবিস্তার লাভ করেছে তাও দেখতে পাচ্ছি। তবুও পরম এবং চরম সত্য উপরে, ওইটেই তার স্বরূপ। ওখান থেকেই বীজ এবং বীজ থেকেই সৃষ্টি যতকাল ততকাল তাঁর বংশানুক্রমিক অঙ্কুর বিস্তার। থাক, ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে বাস্তবে যা করি—অর্থাৎ ভাবনার যেটা রূপায়ণ তার কাঠকুটো যুগিয়ে সাদামাটা কথার ফুঁয়ে অগ্নিশিখার আলোয় পরিষ্কার করে দি। ছবির ক্ষেত্রে—ফ্লাশ-লাইটের কাজ হবে। ভোরবেলা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম এবং কল্পনার ছবি জেগে ওঠে। মুখ দিয়েও বেরিয়ে আসে। তার পরই তাগিদ আসে চায়ের। মুখ হাত ধুয়ে এক গ্লাস লেবু-চা নিয়ে বসি। পাশে থাকে সিগারেটের বাক্স আর দেশালাই। খবরের কাগজ পড়ি। ধরুন, আজকের কথাই বলি। ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫২র কথা। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বড়দিন উপলক্ষে বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমারা যুদ্ধ করছি, তা সত্ত্বেও আমরা যেন চীন দেশের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ না করি। এটা আমারও মনের কথা, প্রাণের কথা। এইখানেই আত্মসমীক্ষার আয়নায় আমার আত্মাকে দেখতে পাচ্ছি। ১৯৫৯ সনে মাদ্রাজে All India Writers Conference-এ সভাপতি হিসেবে অভিভাষণে চীনা আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, এই দৃঢ় ধারণাবশে বলেছিলাম—"We shall resist enmity with our life, but even in a moment of greatest danger, we

shall be nobodies' enemy." এই ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই লেবু-চায়ের পর দুধ-চায়ের জন্য হাঁক দিচ্ছি। সিগারেট দুটোর পর তৃতীয়টা হয়ে গেল। আমি যদি গাছ হই তবে এরই মধ্যে মাটির তলার মূলের ছবি শাখাবৃন্তে ফুলের ছবি দুই-ই চলছে একসঙ্গে। আবার এরই মধ্যে বাড়ির সামনে এসেছে ভিক্ষার্থী এবং পাড়ার দুটি খোকা। ভিক্ষার্থী শুধু ভিক্ষাই চাইছে না, দুপুরবেলা নিমন্ত্রণ চাইছে। যাবে সে। আমার জীবনের মধ্যে ওটা বাঁধা নিয়ম। ওরা তা জানে। একজন থেকে দু'জন, কোনো-কোনোদিন তিনজনও নিমন্ত্রণ নিয়ে যায়। আমার বাড়ীতে এক এক বেলায় আটত্রিশজন লোক খানেওলা। ওর সঙ্গে আর একজন দু'জন এমনকি তিনজনেও বিশেষ আসে-যায় না। ও না হলে মন খুঁত খুঁত করে আমার। কেউ যদি বলেন, এটা বুর্জোয়া মনের পরিচয়, বলুন। আমার খাইয়ে খুশী। এর পর ছেলে দুটির দাবি—গাছে অনেক বোগেনভেলিয়া ফুল ফুটেছে, দু' গোছ তাদের পেড়ে দিতে হবে। দিলাম।

এর পর লিখতে বসি। ভারতীয় মতে, মেঝেতে পাতা আসনে বসে, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখি আমি। পাশে ডানদিকে আমাদের কুকুর—নাম বেটী অর্থাৎ কন্যা—সে এসে বসে। বুড়ো হয়েছে বেটী। এবার বোধ হয় যাবে। যত যাবার সময় হচ্ছে তত যেন আমাকে আঁকড়ে ধরছে। আমি যতক্ষণ বসে থাকব ততক্ষণ বসে থাকবে, উঠলেই উঠবে। মধ্যে মধ্যে আমি উঠছি সেও উঠছে, আবার আসছি বসছি সেও বসছে। আজকাল প্রায়ই বমি করে ফেলছে, ঘরের মধ্যেই। করলে সেটা আমিই সাফ করব। বাইরের আয়নায় আমার চেহারা শ্রীহীন। মনঃসমীক্ষণের আয়নায় আমার এই বমি সাফ করার চেহারাটা কেমন লাগে অর্থাৎ হরিজনের মতো লাগে কি না ঠিক বলতে পারব না। পৃথিবীতে একটা কথা আছে, নিজেকে আয়নায় কেউ অসুন্দর দেখে না। আমি অবশ্য বাইরের আয়নায় নিজেকে শ্রীমন্ত দেখি না কিন্তু মনের আয়নায় আমাকে অসুন্দর দেখালেও ঠিক ধরতে পারছি না।

বলতে ভুলেছি। লেখার শুরু করি ভগবানের নাম লিখে। একখানি খাতা, একখানা ডায়েরীরই বইয়ে দিন দিন ইষ্টনাম লিখি। বছরে এক লক্ষ লেখার সংকল্প থাকে। এ বছরের আগে পর্যন্তও খুচরো কাগজে লিখতাম। খুচরো বলতে অবশ্য খোলা কাগজ বলছি। যেমন-তেমন কাগজে লিখতে আমার মন সরে না। যাই হোক, দামী হলেও খোলা কাগজ দিনের পর দিন জমানো সহজ নয়। এবার থেকে তাই খাতা করছি। ইষ্টনাম লেখা শেষ করে লিখতে বসি। নিত্য লেখা অভ্যাস। এ লেখনকর্মকে আমি ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি। যা হোক কিছু লিখি, সে দু-দশ পৃষ্ঠাই হোক আর দু-দশ ছত্রই হোক। এবং লিখবার শুরুতেই লেখার হরফ এবং লাইন যদি পরিষ্কার এবং সোজা না হয় তবে সে কাগজখানাই বাতিল করে দিই। কোনো-কোনোদিন তিন-চারখানা কাগজ বাতিল হয়। কোনোদিন বেশী। কমপক্ষে দু'খানা। আবার পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা কি দশ পৃষ্ঠা লিখেও বাতিল করে দিই। একখানা বই লিখতে বোধ হয় আর একখানা বইয়ের মতো লেখা বাতিল হয়ে যায়। শুধু এই-ই সব নয়—বন্ধুজনে বিস্ময় প্রকাশ করেন, আমি যেকথা বলতে যাচ্ছি তার জন্যে। গোটা বই লিখে কাগজে ছাপা হবাব পর বাতিল করে আবার নতুন করে লিখি। সংস্করণে সস্করণে মার্জনা তো নিয়ম। বন্ধুরা বলেন বড় অসন্তুষ্ট লেখক আমি। এক সময় ভেবেছি বাইরের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অসন্তোষটা মেজে-ঘষে অপরূপ করে তোলার এক বিচিত্র অভিপ্রায় এটা। ফ্রয়েডীয় মতে তাই হয়তো বটে, মার্ক্সীয় মতে বুর্জোয়া লক্ষণও হয়তো হতে পারে। কিন্তু আমি বেশ ভাল করে জানি আমার জীবনে একটি আত্মশুদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা আছে, মার্জনায় লেখাকে শুদ্ধ এবং নিখুঁত করাটাও সেই চেষ্টার পরোক্ষ প্রকাশ। বাইরের শ্রীহীনতা সম্পর্কে খেদ নেই বলব না—কিছুটা আছে, কিন্তু সেটা খুব একটা গুরুতর কিছু নয়। নইলে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেও নিত্য দাড়ি কামাইনি কেন? এখন কামাই সে এই বছর দুই হ'ল। সেও রাম বলে একজন সেবক এসে ধরে-বেঁধে আমাকে অভ্যেস করিয়েছে।

তবে তখনও এবং এখনও বাড়িতে আধময়লা কাপড়, আধময়লা জামা পরে থাকি। চোখের চশমাটা গোল বাধায়—নইলে অনেক অপরিচিত জন এসে আমাকে মাটিমাখা হাতে দেখে প্রশ্ন করে, বাবু বাড়ী আছেন? বলা ভাল, বাগানে আমার শখ আছে, সে সেই ছেলেবেলা থেকে, আট-দশ বছর থেকে গ্রামের বাড়ীতে বাগান ছিল, এখনও আছে, কলকাতাতেও আছে। লিখতে লিখতে ক্লান্তি এলেই উঠে গিয়ে মাটি খুঁড়ি। এ অভ্যাসের মধ্যেও টেনেবুনে রূপের অভাবের পরিপূরণের ইচ্ছে বা বুর্জোয়া মনের পরিচয় বের করা যায়; তা মেনেও নিতাম যদি অভ্যেটা আট-দশ বছর বয়স থেকেই না থাকত। তখনও কম্‌প্লেক্সটা গজাবার সময়ই হয়নি। এবং আমার মা বলেন, ছেলেবেলায় আমি কালো ছিলাম না, এবং শ্রী নাকি যথেষ্ট ছিল। আমার ছেলেরা কথাটা মানে না—ওরা শুনে হাসে। তবে আমার মনে আছে যৌবনের ছবি—তাতে সত্যিই শ্রীর এই অভাব ছিল না। সেকালের যে সব ফোটোগ্রাফ আছে তাকে রাজপুত্রের ছবি বলে চালানো না যাক তার বন্ধুবান্ধবদের কেউ বললে আপত্তি হ'ত না। এই শ্রীর অভাবটা ঘটল ১৯৩১ সনে—জেলখানায় রোগাক্রান্ত হয়ে। সে রোগ আজও ভাল হয়নি। শ্রীও ফেরেনি। এই আজই একজন মহিলা লেখিকা বললেন, আপনার ডিসেন্‌ট্রি আজও ভাল হয়নি? আমি বললাম, না, রোগটি আমার মধ্যে বশ সমৃদ্ধভাবেই ভাল আছেন। থাক। ওতে আমি সুখী। ও রোগে আমার মৃত্যু হবে না। তবে ও রোগটা ভাল হলে আমি বাঁচব না।

যাক। ফুলের গোড়া আজ খুঁড়ছিলাম। খেতে ডাকলে। মনটা অপ্রসন্ন হ'ল, মুখে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। খাবার প্রতি আমার ভালবাসা নেই। সে অসুখের জন্য নয়; ছেলেবেলা থেকেই। খেতে বসলেই মেজাজ খারাপ হয়।

খাই অত্যন্ত কম। চা খেতে ভালবাসি। আর সিগারেট। চা আগে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কাপ খেয়েছি, এখন আট-দশ কাপ; সিগারেট এখন তিরিশ থেকে চল্লিশে উঠেছে। বাগান খোঁড়া ছেড়ে উঠতে

হ'ল। হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। একটু ছানা আর একটা কলা। আগে টোস্ট ডিম ভাল লাগত, এখন ওসব ভাল লাগে না। খেয়ে হাত ধুয়ে আবার লিখতে বসলাম। একটি কবিতা লিখছি। ছেলেবেলায় কবিতা লিখতাম। তারপর কবিতা একেবারেই ছেড়েছিলাম। তবে গান লিখি মধ্যে মধ্যে। বিশেষ করে পল্লীগীতি ভাল হয়। অনেকে ভ্রম করেন এগুলিকে প্রাচীনগীতি বলে। "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে"—এর তারিফ সবাই করেছেন। "মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন্ কদমতলীতে; কোন্ মহাজন পারে বলিতে ?" এ গান বেরুনোর পর দু-একজন প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ প্রাচীন গীতিকারের রচনা এটি ? কিন্তু কবিতা কালে-কস্মিনে লিখলেও তাকে লেখা বলা যায় না। দেশের এই দুর্যোগে—সেই ছেলেবেলার দেশপ্রেমে জোয়ার ধরে বইতে চাচ্ছে। কবিতার ছন্দের দুই কিনারা না পেলে ঠিক আবেগের বেগ প্রকাশ পাবার সুযোগ পাচ্ছে না বলে কবিতা লিখছি। হাতে একটা সিগারেট ধরা আছে—পুড়ছে পাশ থেকে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। একটা গোটা সিগারেট ধরিয়ে রেখেছিলাম আসনের পাশে, সেটা পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে, বেঁকে যাওয়া একটা ছাইয়ের সিগারেটে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সিগারেটের শেষের ধোঁয়াটা পীড়াদায়ক। নিবুতে হ'ল। নিবুতে গিয়ে নজরে পড়ল অন্ততঃ দশটা পোড়া সিগারেট-প্রান্ত আর ছাইয়ে নোংরা হয়ে গেছে জায়গাটা। তা থাক। ও আমার অঙ্গভূষণ না হোক অঙ্গের সয়ে-যাওয়া গ্লানির মতো। তাকিয়ে থেকে আবার চোখ ফিরিয়ে লিখতে লাগলাম। এর মধ্যে ডাক এল। দেখে ঠেলে রাখলাম। চিঠি অনেক আসে। লোকে ভালবেসেই লেখে। অনেক ভাল কথা—মন্দ কথাও লেখে। ভালবাসার জন্যও মন্দ কথা লেখে। সেটা বেশী হয় গল্প-উপন্যাসের চিত্ররূপের জন্য। ফিল্ম-ডিরেক্টররা বিয়োগান্তকে মিলনান্ত করে দেয়। বইয়ের মুগ্ধ পাঠক ছবি দেখে এসে কঠিন কথা লিখে। সবই ফেলে দিই। মন্দ বলেই যে ফেলি তা নয়।

আমার জীবনে কোথায় একটা ইস্ক্রুপ ঢিলে আছে। সেটাকে আমি বলি বৈরাগ্য। নইলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিককালের তরুণতম লেখকের পত্রের অধিকাংশই হারিয়ে যেত না। শুধু চিঠি নয়, ঘড়ি, বোতাম, টাকা, ব্যাগ কতবার যে হারিয়েছি তার সঠিক হিসাব নেই।

পাশে টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে। কবিতাটা শেষ হ'ল। কাউকে শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছে। না শোনালে তৃপ্তি পাইনে। স্ত্রী দেশে রয়েছেন। ছেলেকে ডেকে শোনাই। এ সময়ে বাইরে কে এসেছে। দেখা করতে হবে। আগে মনে মনে বিরক্ত হতাম। এখন আর হইনে। হতে পারিনে। দেখা করে ফিরে এলাম। দাড়ি কামাবার জায়গা ঠিক করে দিয়েছে এর মধ্যে। কামাবার সরঞ্জাম আমার ভাল। ওতে শখ আছে। কমিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে একবার পায়চারি করব। কিন্তু চটিটা কোথায় গেল? মনে পড়ল বাগানে ফেলে এসেছি। নিয়ে এসে স্নান সেরে উপরে পূজোর ঘরে গেলাম। পূজোতে এক ঘণ্টা লাগে। লাগলও তাই। পূজো সেরে, রেশমী কাপড় ছেড়ে সুতী কাপড় পরে খেতে বসলাম। দিনে খাওয়া হবিষ্যান্ন। আতপের মুঠি-দুই ভাত, মুগ-কলাই সেদ্ধ, খানিকটা ঘি, দু-চারটে ভাজা এই। এর পর একটু ঘুম। ঘণ্টাখানেক। তারপর বিকেলে ইউনিভারসিটিতে দারভাঙ্গা হলে একটা মীটিং আছে। চীনা আক্রমণ নিয়ে বুদ্ধিজীবিদের মীটিং। মীটিংয়ে একসময় খুব শখ ছিল। সভাপতিত্বে লোভ ছিল। বক্তৃতা করবার একটা আগ্রহ ছিল। আজকাল ভাল লাগে না।

আমার থেকে অন্যে ভাল বলবে এই আশঙ্কায় ভাল লাগে না কি না মনকে যাচাই করছি। কিন্তু তা নয়। এখনও ভাল বলতে পারি আমি, বাদ-প্রতিবাদে তো খুব ভাল বলি, তবুও ভাল লাগে না। একসময় সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করতাম, গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে। বাকসংযমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হ'ত বা হয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে

বক্তৃতা করবার আগ্রহ কমেনি ; আগ্রহ এবং শক্তি দুই বেড়েছিল। এখন শক্তি কমেনি, হয়তো আজও বাড়ছে কিন্তু আগ্রহ কমছে।

টেলিফোন বাজছে, ওরাই ফোন করছে।

টেলিফোনটা আমার লেখার জায়গার পাশেই থাকে, ওইটে যত আবশ্যকীয় যন্ত্র তত পীড়াদায়ক। লিখছি, টেলিফোন এল।

হ্যালো!

আমি একটু তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

বলুন, আমি বলছি।

জানেন, আপনার লেখা এত ভাল লাগে—

বলা বাহুল্য, ওপারে যিনি আমার নাতনী শকুন্তলার বয়সী একটি মেয়ে। নয়তো·· হ্যালো! কাকে চাই? এটা কি তারাশঙ্করবাবুর বাড়ী? হ্যাঁ। তিনি কি আছেন?

না বলতে পারিনে। কারণ ব্রতপালনের মতই আমি সত্যি কথা বলি। কেবল একটি মিথ্যা কথাই বহুজনকে বলি। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, অর্ধমিথ্যা—আমার শরীর খারাপ, মীটিংয়ের কথাতে বলি। অর্ধমিথ্যা এই কারণে বলছি যে, শরীরে রোগ আমার আছেই; তাকে অনুভব চব্বিশ ঘণ্টাই করি, কাছে সারিডন থাকে। দিনে একটা দুটো খেতেই হয়। টেলিফোনের যন্ত্রণার কথা শেষ করি। একটা দিক বলছি। আর একটা দিক—কোনোদিন কোনো কারণে টেলিফোন না এলেও যন্ত্রণার সামিল একটা আশ্চর্য অস্বস্তি অনুভব করি।

যাক, মীটিংয়ে যাচ্ছি, এ সময়টা নাতি-নাতনীদের নিয়ে বসে বেশী আনন্দ পাই, চৌদ্দটি নাতি-নাতনী আমার। কিন্তু কি করব? যেতে হ'ল। মীটিং কেমন খারাপ লাগে, সবাই মুখোশ পরে বসে থাকে। যত হোমরাচোমরা তত মুখোশগুলো ভারি, আমারও হয়তো আছে। কিন্তু যাচাই করে বলছি আজ অন্ততঃ ছিল না। আজকাল থাকে না আমার। মুখোশ তো মুখোশ—এই তো সামনে বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো পড়ে আছে, ও দুটোই পরিনে আমি, কেবল কথা

ফসকে যাবে বলে মীটিংয়ে যাবার আগে পরতে হয়, তাও অনবরত দাঁতে দাঁতে ঘষে, এবং বাড়ী ফিরেই খুলে ফেলি, খাবার সময়েও পারিনে তো মুখোশ! না, মুখোশ থাকে না আমার। আজকাল মধ্যে মধ্যে ছোট নাতনী লালী এবং নাতি গোরাকে দেখিয়ে দাঁত পরি আর খুলি, বলি, কই, তোরা তোদের দাঁত খোল্ তো দেখি।

মুখোশ নেই, তবে স্বীকার করব, পোশাক আছে মীটিংয়ে স্যুটটুট নয়, জামাকাপড় পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পরি আমি বাইরে যাবার সময়, স্বীকার করে ভাবছি তবে কি ওখানেই এই ফ্রয়েডীয় এবং মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা সত্য?

না, বাইরে এবং ঘরে এখনও এক হতে পারেনি এ সত্য—তাতে কম্‌প্লেক্স বা বুর্জোয়াত্ব সত্য নয়। বাইরেকে এখনও সম্মান করতে হবে বইকি! এখনও যে গৃহী আমি—ঘরের পালা শেষ করে বাইরে বের যেদিন হতে পারব, সেদিন পোশাক হবে কৌপীন কি কন্থা সেদিনের জন্যই তৈরি হচ্ছি আমি। পারব কি না জানি না, তবে যে অহং বা ব্যক্তিত্বকে তৈরি করলাম, তাকে মাটির প্রতিমার মত বিসর্জন দিতে পারব যেদিন সেদিনই হবে আমার মানবজীবনের সিদ্ধি।

মনঃসমীক্ষার দর্পণে যা দেখছি, তার একটা ছবি যেন আমার সামনে রয়েছে। আমারই হাতের, গাছের শিকড় কেটে তৈরি একটা মূর্তি, একজন শ্রমিক একটা বোঝা ঘাড়ে করে উপরে চড়াই ভাঙছে। যেন ওটা আমিই চলেছি—জীবনের বোঝা নিয়ে ওই শিখরে গিয়ে নামিয়ে সকল কাজের পালা শেষ করতে।

রাত্রি অনেক হয়েছে—নিশীথ পূজার সময় হ'ল।

———